মীর্জা গালিব

অনুবাদ

শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া. নয়াদিল্লি

সূচীপত্র

প্রস্তাবনা

কাবুলের অধিপতি

বাবর যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন উত্তর ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল ইব্রাহীম লোদীর অধিকার ভুক্ত ছিল। ইব্রাহীম লোদীর কিছু সংখ্যক বিক্ষুব্ধ পারিষদ বাবরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন লোদী বংশের এই শেষ রাজাকে আক্রমণ করে তাঁর রাজত্ব ছিনিয়ে তাঁদের সাহায্য করতে। ভারতের সমৃদ্ধ ও উর্বরা ভূমির উপর বাবরের লুব্ধ দৃষ্টি এর আগেই পড়েছিল। পর্বতাকীর্ণ ও অসুবিধাজনক নিজের এই রাজধানী কাবুল থেকে ভারতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার একটা সুযোগের জন্য বাবর এই সময় অপেক্ষারত ছিলেন। কাজেই সম্ভাবনাজনক এই আমন্ত্রণটি পেয়েই তিনি তা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করলেন। এর পর মুষ্টিমেয় সৈন্যদল সঙ্গে নিয়ে তিনি সীমান্ত পার হয়ে ভারতে প্রবেশ করলেন। 1526 খ্রীস্টাব্দের 21শে মার্চ পানিপথ নামক স্থানে ইব্রাহীম লোদীর সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তাঁর যে যুদ্ধ হ'ল তাতেই তাঁর ভাগ্য নির্ণীত হয়ে গেল। ইব্রাহীম লোদীর সৈন্যবাহিনী এই যুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়ে গেল এবং তিনি স্বয়ং এই যুদ্ধে প্রাণ হারালেন। সেদিন পানিপথের যুদ্ধে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল।

পানিপথের যুদ্ধজয় ভাগ্য-নির্ণায়ক হলেও এটাকে ভারত-বিজয় বলা চলে না। এই ঘটনার পর বাবর প্রায় চার বছর মাত্র বেঁচে ছিলেন। ছোট ছোট রাজ্যের সেনানায়ক ও রাজাদের সঙ্গে সংঘর্ষেই এই চার বছরের অধিকাংশ সময় কেটে গিয়েছিল। 1530 খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ুঁ যখন সিংহাসনে বসলেন, তখন এই নব স্থাপিত সাম্রাজ্যের দৃঢ়তা বা নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয় নি। হুমায়ুঁকে নিরন্তর প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল, এর ফলে তাঁকে এ দেশ ছেড়ে ইরাণে পালিয়ে গিয়ে সেখানে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে শেরশাহ সূরী একটি নূতন রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা করেন; অবশ্য তাঁর উত্তরাধিকারিগণের দুর্বলতা ও অযোগ্যতার কারণে এই রাজবংশ দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারে নি। এরই মধ্যে হুমায়ুঁ নিজের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য ইরাণের রাজার কাছ থেকে সামরিক সাহায্য লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। 1555 খ্রীস্টাব্দে ইরাণীয় বাহিনী সঙ্গে নিয়ে হুমায়ুঁ ভারতে ফিরে আসেন। এই সময় শেরশাহ সূরীর শূন্য সিংহাসনে বসেছিলেন তাঁর পুত্র সলীম শাহ। 1545 থেকে ইনি রাজত্ব করছিলেন। সলীম শাহকে যুদ্ধে ভীষণ ভাবে পরাজিত করে হুমায়ুঁ তাঁর সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন। এবারের এই বিজয় স্থায়ী হয়েছিল। এর পরবর্তী তিনশত বৎসর কাল পর্যন্ত ভারতে মুঘল শাসন অব্যাহত ছিল।

হুমায়ুঁর পর তাঁর পুত্র আকবর 1556 খ্রীস্টাব্দে তাঁর

সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ইংলণ্ডের রানী প্রথম এলিজাবেথের সমসাময়িক ছিলেন। এঁরা দুজনেই শাসক হিসাবে কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন এবং স্থায়ী কীর্তি রেখে যেতে পেরেছিলেন। আকবরের অর্ধ-শতাব্দীব্যাপী রাজত্ব-কাল ভারতের ইতিহাসের অতি গৌরবময় কাল রূপে পরিগণিত হয়ে থাকে। এই সময়ে দেশে সর্ব ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি ঘটেছিল। দেশের অভ্যন্তরে শান্তি ও সমৃদ্ধি ও বিদেশে প্রতিষ্ঠা ও লোক-প্রিয়তা এই যুগটিকে বিশিষ্টতা মণ্ডিত করেছিল। আগ্রার রাজদরবার ইরাণ ও পশ্চিম এশিয়ার অন্যান্য দেশ থেকে সকল-প্রকার ভাগ্যান্বেষীদের নিকট মক্কার মত একটি বিশেষ আকর্ষণীয় স্থান হয়ে উঠেছিল। এই ভাগ্যান্বেষীদের মধ্যে ছিলেন— জ্ঞানী, পণ্ডিত, লেখক, সৈনিক, কূটনীতিবিশারদ ইত্যাদি। আকবরের যশোরাশি অল্পসময়ের মধ্যেই ইউরোপ মহাদেশ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। এইভাবে বহু নবাগত স্রোতের মত অবিচ্ছিন্নভাবে ভারতে আসায় ভারতীয় সমাজের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে নিত্য নব রক্তের সঞ্চার সম্ভব হয়েছিল। আর এই সংযোজনের ফলে সর্ববিষয়ে বিকাশের অগ্রগতি অব্যাহত হয়েছিল।

আকবরের পর সাম্রাজ্যের বৈষয়িক উন্নতি পরবর্তী তিন প্রজন্ম পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। তবে ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে অবক্ষয়ের লক্ষণগুলি বেশ স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছিল। এই স্পষ্ট অবক্ষয়ের বেশ কিছু আগে থেকেই সাম্রাজ্যের মধ্যে ভাঙন

ধরেছিল, বলতে গেলে আকবরের মৃত্যুর পর থেকেই তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে। খুব একটা বড় ধরনের সামরিক সাফল্য লাভের নজির জাহাঙ্গীর, শাজাহান বা ঔরঙ্গজেব— এঁরা কেউই দেখাতে পারেন নি। ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে মুঘল সাম্রাজ্য সামরিক দিক থেকে এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে সম্রাটকে তাঁর জীবনের শেষ কুড়ি বছর স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে থেকে যুদ্ধ চালাতে হয়েছিল। এই রণক্ষেত্র থেকে তিনি নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন নি। 1707 খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে আহম্মদনগরে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়। পরবর্তী একশো পঞ্চাশ বছর ধরে এই রাজবংশ ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের পথে এগিয়ে-ছিল। 1857 খ্রীস্টাব্দে শেষ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কে ইংরাজেরা সিংহাসনচ্যুত করে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করেন— এই হল মুঘল রাজবংশের চরম পরিণতি। ভারতে মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিলেন ইরাণের নৃপতি নাদির শাহ্‌। ইনি ভারত আক্রমণ করে মুঘল বাহিনীকে পরাজিত করেন। অতঃপর তিনি 1739 খ্রীস্টাব্দে রাজধানী অধিকার করেন ও লুণ্ঠন চালান। এই আঘাত সামলিয়ে উঠতে না উঠতেই আহম্মদ শাহ আব্দালী সসৈন্যে চড়াও হয়ে নাদির শাহের মতই লুণ্ঠন চালান। এই আক্রমণ ও লুণ্ঠন অনুষ্ঠিত হয় 1761 খ্রীস্টাব্দে। এই ঘটনার পর প্রায় আরও এক শতাব্দী কাল মুঘল সাম্রাজ্য টিঁকে ছিল, তবে রাজশক্তি হয়ে উঠেছিল খুবই দুর্বল। শেষ পর্যন্ত শুধু মাত্র দিল্লীর মধ্যেই

এদের রাজ্য সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যের দূরবর্তী প্রদেশগুলি একে একে স্থানীয় শাসকদের অধিকারভুক্ত হয়ে পড়ে। এই স্বাধীন শাসকদের এক সময়ে সম্রাট নিজেই সুবেদার অথবা সেনাপতিরূপে ওই-সব অঞ্চলে পাঠিয়েছিলেন।

পরিবার

বিদেশী কোন আগন্তুককে আকর্ষণীয় জীবিকা অথবা সম্মান-জনক কোন পদ দেওয়ার মত সামর্থ্য শেষ দিকে দিল্লীর মুঘল দরবারের আর ছিল না। তাদের আশ্রয় দান করাও সম্ভব ছিল না। ফলে এইরূপ ভাগ্যান্বেষীদের আগমন-স্রোত প্রায় নিরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, শেষ দিকে ক্বচিৎ কেউ আসতেন। মুঘল সাম্রাজ্যের এই পতনের কালে দেখা যেত যে রুজি-রোজগারের চেষ্টায় এমন দু-চার জন বিদেশী আসছে, যারা যে বেশী মাইনে দেবে এমন যে-কোন একজনের অধীনে চাকরী করতে বা লড়াই করতে সদাই প্রস্তুত। এমনি একজন ভাগ্যান্বেষী, সৈনিক ছিলেন তুর্ক সৈনিক কুক্কান বেগ খাঁ। ইনি সমরকন্দ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতে আসেন। এমন কিছু তথ্য পাওয়া যায় যার থেকে ধরে নেওয়া যায় যে এঁর বড় বড় মানুষের সঙ্গে জানাশুনা ছিল। ইনি সম্ভ্রান্ত পরিবারেই জন্ম-গ্রহণ করেন, এই পরিবার এক সময়ে বেশ সমৃদ্ধিশালীও ছিল। ইনি প্রথমে পাঞ্জাবের সুবেদার মোহমুলমুক-এর অধীনে চাকরী

নিয়েছিলেন। লাহোরে অল্প কিছুদিন থেকে ইনি দিল্লী চলে আসেন। দিল্লীতে এসে ইনি জুল্‌ফেকরুদ্দৌলা মির্জা নজ্‌ফের আশ্রয় নেন। এঁর সুপারিশে কুকান বেগ খাঁ সম্রাট্ দ্বিতীয় শাহ্ আলমের দরবারে একটি চাকুরী পেয়ে যান। সম্রাট্ কুকান বেগ খাঁকে 50 জন ঘোড়সওয়ারী সৈন্যের নায়কত্ব দান করেন; তাঁকে জয়ঢাক ও পতাকা বহনের মর্যাদাও দেওয়া হয়। নিজের এবং সৈন্যদলের ব্যয় নির্বাহের জন্য সম্রাট্ এঁকে বুলন্দসর্ জেলার পিহাসু-নামক উর্বর ভূভাগের জায়গীরও দান করেন। একজন প্রকৃত উচ্চাভিলাষী ব্যক্তির পক্ষে এমন একটা চাকরী বা জায়গীর খুব বেশী আকর্ষণীয় ছিল না, এই পদে থেকে ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনাও ছিল খুবই কম। এই-সব কারণে কুকান বেগ খান্ সম্রাটের চাকুরীতে ইস্তাফা দিয়ে ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় জয়পুরের মহারাজার সৈন্যদলে চাকুরী নিয়েছিলেন। কতদিন তিনি জয়পুরে ছিলেন তা ঠিক জানা যায় না। তবে কিছুদিন পর তিনি যে স্থায়ীভাবে আগ্রায় বাস করতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কুকান বেগের পরিবার বেশ বড় ছিল। তবে এই পরিবারের সকলের কথা জানা যায় না, শুধু এঁর দুই পুত্রের বিষয়ই জানা যায়। এই দুই পুত্রের নাম ছিল— নসরুল্লা বেগ খাঁ ও আবদুল্লা বেগ খাঁ। পিতার মতই এঁরা দুজন সৈনিক বৃত্তি বেছে নিয়ে-ছিলেন। নসরুল্লা বেগ খাঁ মারাঠা সৈন্যবাহিনীতে চাকুরী নিয়ে শেষ পর্যন্ত জেনারেল পেরঁর অধীনে আগ্রা কোর্টের 'গভর্নর' পদে

আসীন হতে পেরেছিলেন। ফরাসী দেশীয় এই জেনারেল পের' গোয়ালিয়রের মহারাজার অধীনে একজন পেশাদার যোদ্ধা ছিলেন। আবদুল্লা বেগ খাঁ তাঁর এই ভ্রাতার মত ভাগ্যবান ছিলেন না। ইনি প্রথমে লক্ষ্ণৌ আসেন। এই সময়ে আসফ-উদ্দৌল্লা (1775-1797) ছিলেন নবাব-উজীর। সম্ভবতঃ আবদুল্লা বেগ এখানে রুজি-রোজগারের কোন সুবিধা না পেয়ে অল্পদিনের মধ্যেই লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করে হায়দ্রাবাদে চলে আসেন। এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন নবাব নিজাম আলি খান্। আবদুল্লা নিজামের অধীনে একটা ছোটখাট চাকুরী পেয়ে বেশ ক'বছর দাক্ষিণাত্যেই থেকে যান। নিজামের সভাসদ্দের পারস্পরিক ঝগড়াঝাঁটির ফলে আবদুল্লা বেগের চাকুরী খতম হয়ে যায়। চাকুরী হারিয়ে আবদুল্লা আলোয়ারে এসে মহারাও বক্তাওর সিং (1791-1803)-এর অধীনে একটি চাকুরী গ্রহণ করেন। একটা আঞ্চলিক বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে কিছুদিন পর আবদুল্লা নিজেই দুর্ভাগ্যক্রমে নিহত হন। তাঁকে এই বিদ্রোহ দমন করতে পাঠানো হয়েছিল। এই-সমস্ত ঘটনাগুলি গালিব-লিখিত একটি চিঠিতে উল্লিখিত হয়েছে। গালিব লিখেছেন :

আমার পিতামহের মৃত্যুর কালে যে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় তার ফলে পিহাসু পরগণার জায়গীর হারাতে হয়েছিল। আমার পিতা আবদুল্লা বেগ লক্ষ্ণৌ গিয়ে নবাব আসফউদ্দৌল্লার দরবারে চাকরী গ্রহণ করেন। কিছুকাল পর তিনি হায়দ্রাবাদ চলে যান। এখানে তিনি নবাব নিজাম আলি খানের অধীনে

300/400 অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়করূপে নিযুক্ত হন। বহু বৎসর তিনি এখানে ছিলেন। পারিবারিক কলহের ফলে তাঁর এই চাকুরী খতম্ হয়ে যায়। চাকুরী-হারা অবস্থায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে তিনি আলোয়ারে চলে এসে রাও রাজা বক্তাওর সিং-এর অধীনে চাকুরী পান। এখানেই একটি খণ্ড বিপ্লবে তিনি নিহত হন।

গুলাম হুসেন নামে মুঘল বাহিনীর এক অবসরপ্রাপ্ত সেনাপতির পরিবারে আবদুল্লা বেগ খানের বিবাহ হয়েছিল। মৃত্যুকালে আবদুল্লা বেগের তিনটি সন্তান ছিল— একটি মেয়ে ও দুটি ছেলে। এই দুটি ছেলের মধ্যে যেটি বড় তিনিই আমাদের বিখ্যাত কবি গালিব। এঁর আসল নামটি অবশ্য ছিল আসাদুল্লা বেগ খান্। 1797 খ্রীস্টাব্দের 27শে ডিসেম্বর এঁর জন্ম হয়। এঁর ছোট ভাই ইউসুফ আলি খান্ এঁর থেকে বয়সে দু-বছরের ছোট ছিলেন; তিন ভাই-বোনের মধ্যে মেয়েটি ছিলেন সব থেকে বয়োজ্যেষ্ঠা। আবদুল্লা বেগ খানের মৃত্যুর পূর্ব থেকেই পরিবারটি আগ্রায় বাস করতেন, কারণ আবদুল্লা বেগ যে যাযাবর জীবন যাপন করতেন তাতে সমগ্র পরিবারটির তাঁর সঙ্গে একত্র বাস সম্ভব ছিল না। সেইজন্য গালিবের জননী আগ্রায় তাঁর পিত্রালয়েই বাস করতেন। গালিবের মাতামহ বেশ সচ্ছল অবস্থার লোক ছিলেন, তাঁর প্রচুর ভূ-সম্পত্তি ছিল, এগুলি এখনও বর্তমান আছে। 1802 খ্রীস্টাব্দে আবদুল্লা বেগ খানের যখন মৃত্যু হয় তখন গালিবের বয়স মাত্র চার বছর। এই সময় থেকে এই পরিবারটির

অভিভাবকত্বের দায়িত্ব নিয়েছিলেন আবদুল্লা বেগ খানের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা নসরুল্লা খান্।

এই সময়ে ব্রিটিশ রাজশক্তি অতি দ্রুত উত্তর-ভারতে প্রসারিত হচ্ছিল। ছোট বড় জায়গীর বা রাজত্ব একে একে গ্রাস করে ইংরেজরা তাদের অধিকার ও প্রভুত্ব দৃঢ়বদ্ধ করে নিচ্ছিল। ব্রিটিশসেনাধ্যক্ষ লর্ড লেক 1803 খ্রীস্টাব্দে যখন আগ্রা অভিযানে আসেন তখন নসরুল্লা বেগ আগ্রা দুর্গের সেনাধ্যক্ষ। নসরুল্লা বেগ খান্ নবাব আহাম্মদ বক্‌স খানের ভগ্নীকে বিবাহ করেন। শ্যালকের পরামর্শে নসরুল্লা বিনা প্রতিরোধে লর্ড লেকের নিকট আগ্রা দুর্গ সমর্পণ করেন। এই বিশেষ সেবা বা আনুগত্যে পুরস্কার স্বরূপ ব্রিটিশের পক্ষ থেকে তাঁকে চারশো অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়কের পদ দেওয়া হয়, তাঁর এবং সৈন্যবাহিনীর ভরণপোষণের জন্য মাসিক 1700 টাকা বেতন নির্ধারিত করা হয়। পরবর্তী কালে নসরুল্লা বেগ খান্ ইন্দোর রাজ্যভুক্ত ও ভরতপুর-সন্নিহিত সোঙ্ক ও সুসা নামে দুটি জেলা দখল করে নিয়েছিলেন। লর্ড লেক যখন এই দখলের কথা জানতে পারলেন তখন তিনি এই দুটি জেলার আজীবন স্বত্ব নসরুল্লাকে উপঢৌকন দিয়েছিলেন। পরলোক-গত ভ্রাতার পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব তাঁর উপর এসে পড়েছিল, এই দুটি জেলার স্বত্ব লাভ করায় তাঁর মনে হয়েছিল যে অপেক্ষাকৃত আরাম ও স্বচ্ছন্দে তিনি পরিবারটি প্রতিপালন করতে পারবেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই অবস্থা স্থায়ী হয় নি।

1806 খ্রীস্টাব্দে জঙ্গলে বেড়াতে গিয়ে নসরুল্লা খান্ হস্তিপৃষ্ঠ থেকে পড়ে যান এবং এই আঘাতের ফলে কয়েকদিন পরই তাঁর মৃত্যু হয়। গালিব ও তাঁর ভাই-এর শৈশব কাল তখনও উত্তীর্ণ হয় নি। জ্যেষ্ঠতাতের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বার তাঁরা অভিভাবকহীন হয়ে পড়লেন।

নবাব আহাম্মদ বক্স খান এই সময়ে ফিরোজপুরের ঝিরকা ও লোহারু নামে দুটি ছোট জায়গীরের শাসনভার পেয়েছিলেন। ঝিরকার জায়গীরটি তিনি পেয়েছিলেন ব্রিটিশের কাছ থেকে। লোহারুর জায়গীরটি তাঁকে দিয়েছিলেন আলোয়ারের বক্তাওয়ার সিং। নসরুল্লা বেগ ছিলেন তাঁর নিকট আত্মীয়। এইজন্য নসরুল্লা বেগের মৃত্যুর পর তাঁর অভিভাবকহীন ভ্রাতুষ্পুত্রদের ভার তিনি নিজেই গ্রহণ করেছিলেন। লর্ড লেককে অনুরোধ করে তিনি পরলোকগত নসরুল্লা খানের পরিবারের জন্য বার্ষিক দশ হাজার টাকা পেনসন মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছিলেন। এক মাস পরে অবশ্য তিনি একটা এইরূপ নির্দেশ পেয়েছিলেন যে দশ হাজার বার্ষিক ভাতার পরিবর্তে মাসে পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া হবে। এক মাস পরে আবার এমন ভাবে বাঁটোয়ারার আদেশ পাওয়া গেল যাতে এই পাঁচ হাজারের মধ্যে দু' হাজার টাকা পাবে কে এক খাজা হাজী— মোট টাকার সিংহ-ভাগ। বাকী টাকা পাবে পরিবারের বাকী ছয় জন। এর মধ্যে গালিবের ভাগ্যে জুটেছিল বার্ষিক সামান্য 750 টাকা।

গালিবের জননী তখনও তাঁর পিত্রালয়ে বাস করছিলেন।

এঁর পিতা কোন্ সময়ে যে মারা যান তা জানা নেই। ইসলামীয় শাস্ত্র অনুযায়ী কন্যাও পুত্রদের মত পিতার সম্পত্তির অধিকারিণী হন। এই প্রথাটি যে সর্বত্র মেনে চলা হয় তা নয়, তবে নিষ্ঠাবান মুসলিম পরিবারে এই প্রথা মেনে চলা হয়। সেইজন্য মনে হয় যে গালিব-জননী তাঁর পিতা গুলাম হোসেন খানের সম্পত্তির একটা অংশ পেয়েছিলেন। এই সম্পত্তি অবশ্যই বেশ মূল্যবান ছিল। কাজেই মা যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন গালিবকে অর্থকষ্ট বিশেষ পেতে হয় নি।

শিক্ষা ও প্রারম্ভিক জীবন

ইসলাম প্রবর্তনের সূচনা থেকেই কোরান মুসলিমদের জ্ঞানের ভাণ্ডাররূপে গৃহীত হয়ে এসেছে। বিদ্যার্থীদের জন্য পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করার সময় কোরান ও ধর্মশিক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখেই তা করা হত। ছাত্রদের এমন সব বিষয়ই পড়ানো হত যাতে তারা ভবিষ্যতে নিজের নিজের জীবনে ধর্মের মূল শিক্ষা অধিগত করে ইসলাম ধর্মের সত্য ও মহিমাকে প্রতিফলিত করতে পারে। প্রতিটি গ্রামে ও নগরে বলতে গেলে মসজিদগুলিই ছিল এমনি শিক্ষাকেন্দ্র। মসজিদে যে মৌলবী 'নমাজ' পড়ান, তিনিই অন্যসময়ে এই শিক্ষা দান করতেন। একটা নির্দিষ্ট সময়ে স্থানীয় শিশুরা মসজিদে এসে জুটত। মৌলবী সাহেব তখন তাদের কোরান ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ পড়িয়ে দিতেন। পরবর্তীকালে উচ্চ

শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা জাতীয় শিক্ষাকেন্দ্র প্রবর্তিত হয়; এখানে উচ্চতর ও বিশিষ্ট বিষয়গুলি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলিতে শিক্ষা প্রণালী প্রায় এই এক-প্রকারই ছিল।

মুসলমানগণ যখন ভারতে আসেন তখন তাঁরা এই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থাও নিয়ে আসেন। এদেশেও স্থানীয় মসজিদগুলিই হয়ে উঠেছিল শিক্ষা-কেন্দ্র। শিশুরা শিক্ষার জন্য মসজিদে যেত এবং বলতে গেলে মৌলবীই হতেন তাদের একমাত্র শিক্ষক। তাঁকে সব শিক্ষণীয় বিষয়গুলিই পড়াতে হত। এই বিদ্যালয়গুলি 'মক্তব' নামে পরিচিত ছিল। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি এখনও টিঁকে আছে— একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি। ছোট ছোট গ্রামে এখনও এই ধরনের কিছু কিছু বিদ্যালয় দেখা যায়।

পরবর্তীকালে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধি ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছ থেকেও শিক্ষা-বিস্তার বিষয়ে সহায়তা পাওয়া গিয়েছিল। ধরা যাক্, কোন এক ধনী ব্যক্তির বিদ্যালয়ে শিক্ষাযোগ্য বয়সের একটি পুত্র আছে। শহরের আর পাঁচটি মামুলী ঘরের ছেলের সঙ্গে তাঁর মত বিশিষ্ট ব্যক্তির পুত্র মসজিদে একসঙ্গে বসে পড়বে এটা তাঁর পক্ষে সম্মান-হানিকর। এই অবস্থাটা এড়াবার জন্যে তিনি হয়তো ব্যবস্থা করলেন যে একজন শিক্ষক শুধু তাঁরই বাড়ীতে এসে তাঁর ছেলেকে পড়িয়ে যাবে। এই ব্যবস্থা হওয়ার পর তাঁর বন্ধু-বান্ধব বা সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ছেলেরাও তাঁর বাড়ীতে

তাঁর ছেলের সঙ্গে পড়তে আসত। এইভাবে একটি ছোটখাট বিদ্যালয় স্থাপিত হয়ে যেত। সরকার বা কোন ধর্মীয় ট্রাস্ট-পরিচালিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা তখনকার দিনে ছিল খুবই অল্প। কখনও কখনও কোন উৎসাহী পণ্ডিত-ব্যক্তি নিজের বাড়ীতেই একটি বিদ্যালয় খুলে বসতেন। তিনি এবং তাঁর অন্যান্য শিক্ষিত বন্ধুরা নিজেরাই শিক্ষাদানের দায়িত্ব নিয়ে বিদ্যালয় চালাতেন। এঁদের উপর আস্থাশীল অভিভাবকেরা তখন নিজের নিজের ছেলেদের এই-সব বিদ্যালয়ে পাঠাতেন। এইভাবে শিক্ষা-বিস্তার লাভ করত।

গালিবের শিক্ষা-জীবন সম্বন্ধে অতি অল্প তথ্যই পাওয়া যায়। আমরা শুধু এইটুকু জানি যে ঐ সময়ে মুহম্মদ মুয়াজুম নামক একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত আগ্রা শহরে একটি বিদ্যালয় বা মাদ্রাসা চালাতেন। গালিব এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তখন ফার্সী ভাষা শুধু সরকারী কাজে ব্যবহৃত ভাষাই ছিল না, চিঠিপত্র ও সাহিত্যচর্চার মাধ্যমও ছিল এই ফার্সী ভাষা। স্বাভাবিক কারণেই পাঠ্য-পুস্তকের ভাষাও ছিল ফার্সী। বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকগুলি 'উর্দু' ভাষায় রচিত হবে সেভাবে উর্দু ভাষার প্রতিষ্ঠালাভ তখনও হতে পারে নি। কাজেই পঠদ্দশায় গালিব শুধু ফার্সী ভাষাই শিক্ষা করেছিলেন। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত ফার্সীই ছিল শিক্ষার মাধ্যম। গালিব ছাত্রাবস্থায় কোন কোন ক্লাসিক ফার্সী লেখকদের রচিত গদ্য ও কাব্যপুস্তকগুলি পড়েছিলেন— এটা ধরে নেওয়া হয়ে

থাকে। শিক্ষার প্রথম পর্যায়ে আরবী ভাষার প্রাথমিক জ্ঞান লাভের ব্যবস্থা ছিল। তবে গালিব ততটুকু স্তর পর্যন্ত পৌঁছে-ছিলেন বলে মনে হয় না। সম্ভবতঃ বারো বৎসর বয়স পর্যন্তই গালিব এই বিত্যালয় বা মাদ্রাসায় পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।

গালিব লিখেছেন যে এই সময়ে আব্দুস সমাদ নামে এক ফার্সী ভাষার পণ্ডিত আগ্রায় আসেন। আব্দুস সমাদ জরথুস্ট্র ধর্মাবলম্বী (পার্শী) পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও পড়াশুনা করে ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং স্বেচ্ছায় এই ধর্ম অবলম্বন করেন। তিনি ফার্সী এবং আরবী উভয় ভাষাতেই পারদর্শী ছিলেন। স্বাভাবিক কারণেই জরথুস্ট্রীয় ও ইসলাম এই উভয় ধর্ম-বিষয়েই তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। আমাদের তরুণ কবি (গালিব) এই সুপণ্ডিত-পরিব্রাজকের প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে তিনি তাঁকে তাঁর পরিবারভুক্ত হয়ে বছর দুই (1810-12) আগ্রায় বাস করতে অনুরোধ করেন। গালিব এই দুই বৎসর তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করে এত জ্ঞান অর্জন করেন যা পরবর্তী জীবনে তাঁর বিশেষ কাজে লেগেছিল। 1812-13 খ্রীস্টাব্দে গুরু-শিষ্য দুজনেই আগ্রা থেকে দিল্লীতে আসেন। গালিব আসেন দিল্লীতে স্থায়ীভাবে বাস করতে। আব্দুস সমাদ দিল্লীতে এসে তাঁর ছাত্র ও তরুণ বন্ধুর কাছে বিদায় নিয়ে চলে যান। বুদ্ধিমান ও অধ্যবসায়ী শিষ্যরূপে গালিব চিহ্নিত হয়েছিলেন বলেই ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাওয়ার পরও তার সঙ্গে পত্রালাপ চালাতেন বলে জানা যায়।

দিল্লী আগমন

কোন্ কারণে গালিব আগ্রা ত্যাগ করে দিল্লীতে বসবাসের সংকল্প নিয়েছিলেন তা আমাদের জানা নেই। শাহজাহানের সময় পর্যন্ত আগ্রাই ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের রাজধানী। শাহজাহান দিল্লীর লাল কেল্লা তৈরী করিয়ে 1646 খ্রীস্টাব্দে আগ্রা থেকে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার পরও আগ্রা মুঘল সাম্রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর থেকেই গিয়েছিল কিন্তু দিল্লীর সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার সামর্থ্য তার ছিল না। দেশের কেন্দ্রস্থলে দিল্লীর অবস্থিতি, সম্ভবতঃ এই কারণেই গালিব আগ্রা ছেড়ে দিল্লীতে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য চলে আসেন। এটা ছাড়া আরও একটা কারণ সম্ভবতঃ আছে। 1810 খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে তেরো বৎসর বয়সে গালিব ইলাহি বক্স খানের কন্যাকে বিবাহ করেন। এই ইলাহি বক্স খান্ ছিলেন ফিরোজপুরের ঝিরকা ও লোহারুর নবাব আহাম্মদ বক্স খানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এঁরা সব দিল্লীর অধিবাসী। সম্ভবতঃ এঁরাই গালিবকে দিল্লীতে এসে বসবাস করতে রাজী করিয়েছিলেন।

নবাব আহাম্মদ বক্স খান্ ছিলেন লোহারুর নবাব বংশের প্রতিষ্ঠাতা বা আদি-পুরুষ। এমন-কিছু তথ্য পাওয়া যায় যা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে নবাব আহাম্মদ বক্স খানের পিতা মির্জা আরিফজান ও তাঁর দু ভাই অষ্টাদশ শতকের

মধ্যভাগে মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে আসেন। মির্জা গালিবের পিতামহ কুক্কান বেগ খানও ঠিক সেই সময়ে ভারতে আসেন। নবাব আহাম্মদ বক্স খানের ভগ্নীর সঙ্গে গালিবের জেঠার বিবাহের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় যে এই দুই পরিবারের মধ্যে আগে থেকেই যে নিবিড় আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল, আর একটি বৈবাহিক সম্পর্কের দ্বারা সেই বন্ধনকে আরও দৃঢ় করা হয়েছিল।

প্রথম দিকে আহাম্মদ বক্স খান্ বেশ বড় ধরনের অশ্ব-ব্যবসায়ী ছিলেন। কিছুদিন পর তিনি গোয়ালিয়রের মহারাজার সংস্পর্শে এসে এই ব্যবসায় ছেড়ে দেন। যাই হোক, মহারাজার সঙ্গে তাঁর সংস্পর্শ দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। কিছু কাল পর তিনি আলোয়ারে চলে আসেন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি আলোয়ার-অধিপতির এতদূর আস্থা অর্জন করেন যে তিনি মারাঠাদের বিরুদ্ধে লর্ড লেককে সাহায্য করতে যে সৈন্যবাহিনী পাঠান তার অধিনায়ক পদে তিনি আহাম্মদ বক্স খানকেই নিযুক্ত করেছিলেন। বীরত্ব ও বিচক্ষণতার জন্যে লর্ড লেকের মনে তাঁর সম্বন্ধে এমন একটা উচ্চ ধারণা জন্মেছিল যে লর্ড লেক ভারতীয় রাজা-নবাব বা কোন রাজ্য সম্বন্ধে কোন কিছু নীতি গ্রহণ করার পূর্বে আহাম্মদ বক্স খানের পরামর্শ গ্রহণ করতেন এবং এই পরামর্শ অনুযায়ী ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কর্মপন্থা নির্ধারিত হত। 1803 খ্রীস্টাব্দে লর্ড লেক যখন বর্তমান উত্তর প্রদেশের পশ্চিমভাগ অধিকার করে নেন তখন তিনি ফিরোজপুর জিরকা, পালওয়াল,

হোদাল প্রভৃতি স্থানের জায়গীর আহাম্মদ বক্স খানকে উপ-ঢৌকন স্বরূপ দান করেন। যে দরবারে আহাম্মদ বক্স খানকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই জায়গীরগুলি দেওয়া হয় সেই দরবারে আলোয়ারের মহারাজাও উপস্থিত ছিলেন। আহাম্মদ বক্স খানের গুণ সম্বন্ধে ইংরাজের মত তিনিও অবহিত এটা দেখানোর জন্য তিনি আহাম্মদ বক্স খানকে বিশ্বস্ত সেবার জন্য লোহারু নামক স্থানের জায়গীরও দান করেছিলেন। এইভাবে আহাম্মদ বক্স খান্ হয়ে গেলেন ফিরোজপুর জিরকা ও লোহারুর প্রথম নবাব।

নিজের রাজধানী ফিরোজপুরে হলেও আহাম্মদ বক্স খান্ অধিকাংশ সময় দিল্লীতেই কাটাতেন। ইংরাজেরা উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলির শাসনকার্য দিল্লী থেকেই পরিচালন করতেন। নবাবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইলাহী বক্স খানও স্থায়ীভাবে দিল্লীতেই বাস করতেন। ইলাহী বক্স খান্ শুধু একজন প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন কবিই ছিলেন না, ধর্মীয় নেতৃমণ্ডলীর মধ্যেও তাঁর বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল। 'মঅরুফ' এই ছদ্মনামে উর্দু ভাষায় তিনি কবিতা রচনা করতেন।

উর্দু ভাষা

মুসলমান ও ভারতবাসীদের মধ্যে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি উর্দু ভাষা বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়তা করেছিল। একটি

ভাষাকে সুস্পষ্ট পরিণতি লাভের পূর্বে বিকাশের কয়েকটি স্তর অতিক্রম করতে হয়। এই প্রক্রিয়া সুদীর্ঘকাল ধরে উত্তর-ভারতে চলে আসতে আসতে এমন একটা অবস্থা হয় যে, একটি নূতন ভাষার আবির্ভাব আসন্ন হয়ে উঠেছিল। দৈবক্রমে এই সন্ধিক্ষণে মুসলমানদের আগমনের ব্যাপারটি ঘটল। এঁরা সঙ্গে আনলেন ফার্সী, যা মূলতঃ আর্য গোষ্ঠীরই একটি ভাষা। এই সম্পন্ন ভাষার সাহিত্যিক ঐতিহ্যও ছিল মহত্বপূর্ণ। সর্বোপরি এটি ছিল বিজয়ীগণের নিজস্ব ভাষা। খুব স্বাভাবিক কারণে এটিই রাজভাষা বা সরকারী ভাষা রূপে গৃহীত হয়েছিল। ধীরে ধীরে এই ভাষা দেশীয় শিক্ষিত-জনের মনেও প্রভাব বিস্তার করায় এঁরা নূতন শাসককুলের অনুগ্রহ বা চাকুরীর আশায় এই ভাষাটি শিক্ষা করতে লাগলেন। ভাষার ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধরে যে ওলটপালট চলছিল এখন ফার্সীর প্রভাবে সেটা একটা নূতন রূপ ধারণ করেছিল। কালক্রমে এই মিশ্রভাষা 'উর্দু' নামে পরিচিত হয়েছিল। যে অবস্থায় একটা নূতন ভাষার জন্ম হয়, সেই অবস্থাটি পরিণত রূপ পেয়েছিল। শুধু প্রয়োজন ছিল একটি স্ফুলিঙ্গের। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ভেদ করে ভারত অভিমুখে দলে দলে মুসলিমদের আগমন— এই দীপ জ্বালাতে সাহায্য করেছিল। এই নূতন ভাষাটি সর্বাংশে ছিল ভারতীয়— শব্দসম্ভার ও ব্যাকরণের আদর্শের দিক থেকে। এর ক্রিয়া-পদগুলির উৎসও ভারতীয় ভাষা। মুসলিমদের প্রভাব শুধু

এই ভাষার লিপির উপর। কিছু ফার্সী শব্দ, ইরাণীয় ধারণা ও বাগ্‌ধারা অবশ্য এই ভাষায় থেকে গিয়েছে।

প্রথম প্রথম এই ভাষা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ধর্মীয় আলোচনায় এবং ধর্মীয় প্রচারকার্যে মুসলমান ধর্ম-প্রচারকেরা ব্যবহার করতেন। উর্দু ভাষার প্রথম যুগের রচনাগুলি নীতি ও আচার-ব্যবহার বিষয়ক। যাঁরা এগুলি রচনা করেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত। এঁদের রচনায় ইরাণীয় ধ্যান-ধারণাই প্রতিফলিত হয়েছে। কালক্রমে এই ভাষা আরও স্পষ্ট রূপ পেয়েছিল। ফার্সী সাহিত্যের চিরায়ত সাহিত্য সম্পদ ধার করে নেওয়ার জন্য এর ক্ষেত্রও ব্যাপকতর হতে পেরেছিল। অবশ্য এই ভাষার মধ্যে কৃত্রিমতার কিছু দোষ থেকে গিয়েছিল। এর কারণ, ভারতীয় কবিদের মধ্যে যাঁরা উর্দু ভাষায় কবিতা রচনা করতেন তাঁরা যে ফার্সী বাগ্‌ধারা বা উপমা ব্যবহার করতেন তা ফার্সী সাহিত্য-পাঠের ফলেই তাঁদের আয়ত্ত হয়েছিল ; এঁরা কেউই নিজেরা ইরাণে যান নি। ইরাণীয় পরিবেশ জানা না থাকায় এঁদের রচনায় কৃত্রিমতার দোষ স্বাভাবিক কারণেই প্রবেশ করেছিল। এঁদের কবিতা বা শায়রী ছিল অবিমিশ্র কল্পনা ও কৃত্রিমতা-প্রসূত। মীর ও দর্দের মত কয়েকজন কবি ব্যতীত বেশীর ভাগ কবির রচনা উপরোক্ত ধরনের, তাতে না ছিল মৌলিকতা, না ছিল নূতন চিন্তার পরিচয়।

কবিরূপে আবির্ভাব

আগ্রায় বিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থাতেই গালিব 'শায়রী' বা কবিতা লেখা শুরু করেন। প্রথম প্রথম তিনি ফার্সীতেও কবিতা লিখতেন। তবে কিছুদিন পরই ফার্সী লেখা বন্ধ করে তিনি শুধু মাত্র উর্দুতেই লিখতে লাগলেন। এই সময়ে শিক্ষিত সমাজে উর্দুর ব্যবহার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠছিল। আমরা আগেই জেনেছি যে গালিবের শিক্ষা প্রধানতঃ ক্লাসিক ফার্সী সাহিত্য পাঠের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আব্দুস্ সামাদের সম্পর্কে এসে তিনি ফার্সী সাহিত্যের একনিষ্ঠ-ছাত্র ও প্রেমিক হয়ে ওঠেন। শৈশব কাল থেকেই তিনি শৌকত বুখারী, অসীর ও বেদিলের মত ফার্সী কবিদের প্রতি গভীর ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এই কবিবৃন্দ তাঁদের বিমূর্ত ও কল্পনাশ্রয়ী রচনার জন্য প্রসিদ্ধ। গালিব এঁদের অনুকরণ করে উর্দুতে কবিতা রচনা শুরু করেন। তখন পর্যন্ত উর্দু শুধু একটি নূতন ভাষাই ছিল না, ভাব প্রকাশের উপযুক্ত শব্দ-ভাণ্ডার বা পদ-বিন্যাস-পদ্ধতিরও অভাব ছিল। এই অবস্থায় গালিবের কাব্যচর্চার পথ বেশ সুগম ছিল না। তিনি ফার্সী কবিদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। এই কবিগণ— বিশেষ করে বেদিলের রচনার বিষয়বস্তু ও শৈলীর তাৎপর্য গ্রহণ বেশ কঠিন কাজ। স্বভাবতই গালিবের এই কালের কাব্যচর্চা বেশ সৌষ্ঠবযুক্ত হয় নি। এই সময়ে লেখা

গালিবের কবিতাগুলি ইতস্ততঃ দু-একটি শব্দ বাদে সবই ফার্সী শব্দে ভরা। অনেক সময় দেখা গেছে যে একটা তুচ্ছ ও অপ্রয়োজনীয় ভাবকে প্রকাশ করতে গালিব অতি জটিল শৈলীর আশ্রয় নিয়েছেন; ফলে রচনাটি দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে গালিবের এই-সব রচনাকে প্রতিকূল সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সমালোচকেরা এই রচনাগুলিকে একেবারে বাজে বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। গালিবের রচনাগুলির প্রতি এই দোষারোপ যে নেহাৎ বিদ্বেষ-প্রসূত ছিল তা নয়— এগুলির মধ্যে প্রশংসা করার মত কিছু ছিল না। গালিবের প্রাথমিক যে রচনাগুলি আমাদের কাল পর্যন্ত টিকে আছে সেগুলি সত্যই বুঝে ওঠা কঠিন। 'পর্বতের মূষিক প্রসব' বলে যে প্রবাদ বাক্য আছে এ কবিতাগুলি তার সার্থক দৃষ্টান্ত বলেই অনেক ক্ষেত্রে মনে হয়।

সৌভাগ্যক্রমে এই প্রতিকূলতা তরুণ কবির উৎসাহ-উদ্দীপনা ম্লান করে দিতে পারে নি। তিনি নির্ভীক চিত্তে হতাশা বিসর্জন দিয়ে ওই কঠিন শৈলীতেই 'শায়রী' করতে থাকলেন। কিছু লোক যেমন তাঁর বিরুদ্ধ সমালোচনায় নেমেছিলেন তেমনি কিছু সমর্থকও তাঁর জুটে গিয়েছিল। এঁরা গালিবের মৌলিকতা ও নূতন প্রয়োগ-চাতুর্যের তারিফ্ জানিয়েছিলেন। গালিবের এমনি একজন সমঝ্দার ছিলেন নবাব হুসামুদ্দৌলা। এই অতি সম্ভ্রান্ত পুরুষটি নিজেও ছিলেন কবি। একবার লক্ষ্ণৌ যাত্রা কালে ইনি গালিবের লেখা কয়েকটি 'গজল' সঙ্গে নিয়ে

যান। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এগুলি মহাকবি মীরকে দেখানো। মীর এই সময় খুব বৃদ্ধ হয়েছিলেন। লক্ষ্ণৌয়ের বাইরে যাওয়ার সামর্থ্য তাঁর ছিল না; বাড়ীতেই তিনি সব সময় বসে থাকতেন। এই সুপ্রসিদ্ধ কবি গালিবের গজলগুলি পাঠ করে ঈষৎ ব্যঙ্গ-পূর্বক মন্তব্য করেছিলেন যে কোন উপযুক্ত গুরু যদি এই তরুণ বালককে পথ দেখিয়ে দিতে পারত তবে এই ছেলেটির ভবিষ্যতে খুব বড় কবি হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল। পথ দেখিয়ে দেওয়ার লোক (উস্তাদ্) না পেলে অসার কথামালা গেঁথেই এর প্রতিভা শেষ হয়ে যাবে।

এই যে গুরুর কথা বলা হল— এর ভূমিকা পালন করতে পারে নিজেরই সাধারণ বুদ্ধি, অথবা অকপট এক বা একাধিক বন্ধু। কাব্য-স্রোত যখন ঠিক খাতে বইছে না তখন কবির সাধারণ বুদ্ধি তাকে সঠিক নির্দেশ দিতে পারে, আর পারে সৎবন্ধুর যথার্থ সমালোচনা। গালিব লিখতেন প্রচুর। মীরের মন্তব্য থেকে মনে হয় যে তাঁর অতি অল্প বয়সের রচনাগুলি তুচ্ছ করে দেওয়ার মত ছিল না; দোষযুক্ত হলেও রচনার বৈশিষ্ট্য এই-সব রচনায় দীপ্তিমান ছিল। আমরা জানি যে 1810 খ্রীস্টাব্দের 20শে সেপ্টেম্বর মীরের মৃত্যুকালে গালিবের বয়স 13 বৎসরও পূর্ণ হয় নি। আমরা এটাও জানি যে গালিব দশ কি এগারো বছর বয়সের সময় থেকেই কবিতা লেখা আরম্ভ করেন। মীরকে যখন তাঁর গজলগুলি দেখানো হয় তখন গালিবের কবিজীবন দু-তিন বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে।

সাধারণভাবে উর্দু সাহিত্যে ও বিশেষভাবে উর্দু কাব্যক্ষেত্রে মীরের স্থান সবচেয়ে উঁচু। গজল রচনার ক্ষেত্রে মীর যে অদ্বিতীয় এবং পথিকৃৎ – এই কথাটি সর্বজনস্বীকৃত। তাঁর পরে 'গজল' রচনায় যাঁরা খ্যাতিলাভ করেছেন তাঁরা সকলেই তাঁকে শ্রেষ্ঠ কবি বা 'শায়র' রূপে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। মীর যে তাঁর সমসাময়িক কবিদের রচনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না এই কথাটিও সুবিদিত ছিল। এ হেন মীরের কাছে কেউ একজন সাহস করে গালিবের গজল দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন এ ব্যাপারটিও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি এমন এক শ্রেণীর কবি ছিলেন, যিনি ক্বচিৎ কোন দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি বা কাব্যকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনতেন। নবাব হুসামুদ্দৌলা নিজে ছিলেন মীরের অনুরাগী, সুতরাং মীরের মেজাজ তাঁর মতো কারোই জানা ছিল না। গালিবের গজলগুলি মীরকে দেখাতে নিয়ে যাওয়া থেকে বোঝা যায় যে তিনি শুধুমাত্র গালিবের অনুরাগীই ছিলেন না, তাঁর এ বিশ্বাসও ছিল যে গালিবের রচনা মীরের প্রশংসা অর্জন করবে। মীর গালিবের রচনার যে সঠিক মূল্যায়ণ করেন তা তাঁর সূক্ষ্ম সাহিত্যবোধ ও সমালোচনাশক্তির পরিচায়ক।

উর্দু কাব্যে গুরু (উস্তাদ্) ও চেলা (সাকরেদ্) -পরম্পরাটি ইরাণ থেকে এসেছে। একজন তরুণ কবিতা লেখা আরম্ভ করে প্রায়ই উপদেশ গ্রহণের জন্য একজন প্রবীণ কবির দ্বারস্থ হত। যখনি সে কিছু লিখত তখনই সেটা নিয়ে যেত প্রবীণ কবির

কাছে। ইনি শুধু কবিতাটি সংশোধন করেই ক্ষান্ত হতেন না। ভাষার সূক্ষ্ম কারু-কর্ম ও কাব্যের প্রয়োগ-কৌশলও শিষ্যকে বা তরুণ কবিকে বুঝিয়ে দিতেন। এই ঐতিহ্য এত বদ্ধমূল ছিল যে কোন কবির পক্ষে এমনি একজন দিগ্‌দর্শকের সাহায্য না নেওয়ার ব্যাপারটি অসম্ভব ছিল। উস্তাদ্ যতদিন বেঁচে থাকতেন ততদিন তাঁর শিষ্যের কর্তব্য ছিল গুরুর কাছে নিজের রচনাগুলি দেখিয়ে নেওয়া। যাকে 'উস্তাদ্' বলে এই ধরনের কোন শিক্ষক বা গুরুর কাছে প্রথাগতভাবে গালিব 'শিক্ষানবিসী' (সাগ্রিদ) করেন নি। একেবারে প্রথম অবস্থায় গালিব কাউকে তাঁর রচনা দেখিয়ে বা সংশোধন করিয়ে নিতেন কিনা তা জানা যায় না। তবে এটা আমরা জানি যে উত্তর-জীবনে গালিব বলতেন যে কাব্যসাধনায় তাঁর সিদ্ধি ঈশ্বরের কৃপা-দত্ত। মীরের ভবিষ্যদ্‌বাণী আংশিকভাবে সফল হয়েছিল বলা যেতে পারে। গালিবের কোন প্রথা-গত উস্তাদ্ বা গুরু জোটে নি। তাঁর সহজ-বুদ্ধিই ছিল তাঁর নির্দেশদাতা। তা সত্ত্বেও গালিব খুব বড় কবি হতে পেরেছিলেন।

খুব সম্ভব দিল্লীতে আসার পর গালিব তাঁর স্ত্রীর পিতৃ-কুলের সঙ্গেই বাস করতেন। ফার্সীতে লেখা একটি চিঠি থেকে জানতে পারা যায় যে তিনি কিছুদিন পর নিজে একটি বাড়ী কিনে সেখানে চলে যান। যাই হোক্, আমাদের জানা নেই যে কতকাল পর্যন্ত তিনি তাঁর শ্বশুর ইলাহি বক্স খানের সঙ্গে বাস করেছিলেন। তবে এটা ঠিক যে শ্বশুরবাড়ীর আশ্রয় তাঁর পক্ষে

খুব সুবিধাজনক প্রমাণিত হয়েছিল।

ইউরোপে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের গৃহে 'সেলোং'এর মত তখনকার দিনে আমাদের দেশের ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের গৃহেও একটি করে 'বৈঠকখানা' জাতীয় কক্ষ থাকত। এইগুলি ছিল শিল্পী, কবি ও পণ্ডিতদের মিলনকেন্দ্র। যাঁদের বাড়ীতে এই ধরনের আসর বসত, তাঁদের একটা নৈতিক দায়িত্ব ছিল এই-সব কবি, শিল্পী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের রক্ষা করা এবং তাঁদের জন্য সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি করে দেওয়া। এই দায়িত্ব তাঁরা স্বেচ্ছায় বহন করতেন। বাল্যকালে গালিব দিল্লীতে চলে আসায় এবং একটি প্রভাবশালী ও সুপরিচিত পরিবারের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অতি অল্পকালের মধ্যেই গালিবকে দিল্লীর বিদগ্ধ-সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা দিয়েছিল। এই যোগাযোগ পরবর্তী কালেও তাঁর পক্ষে বিশেষ কাজে এসেছিল। এই সময় যাঁদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় স্থাপিত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন সুধী-পণ্ডিত, কবি, রাজনীতিজ্ঞ, রাজ-পুরুষ, ধর্মশাস্ত্রবিৎ ও সাধু-সন্ত শ্রেণীর ব্যক্তি। এঁরা পরবর্তী জীবনে সুখে-দুঃখে সর্বদা গালিবের পাশে এসে দাঁড়াতেন। এঁদের দ্বারা গালিবের প্রভূত উপকার সাধিত হয়েছিল।

পেনসনের ঝগড়া

গালিব এখন বয়সে তরুণ, তাঁর উপর পরিবার-প্রতিপালনের দায়িত্বও এসে পড়েছিল। যতদিন গালিব আগ্রায় ছিলেন, তাঁর

জননীই তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। দিল্লী আসার পরও হয়তো তাঁর মা গালিবকে সাহায্য করতেন। যখন দরকার পড়ত তখন নবাব আহাম্মদ বক্স খানও তাঁকে অকাতরে অর্থ সাহায্য করতেন। অবশ্য এই সাহায্য পাওয়া যেত যখন-তখন এবং অনিয়মিত ভাবে। গালিবের স্থায়ী আয় ছিল বার্ষিক মাত্র 750.00 টাকা। তাঁর পারিবারিক মোট পেনসন বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে তাঁর নিজের প্রাপ্য অংশ। জ্যেঠা নসরুল্লা খানের মৃত্যুর পর ইংরেজ সরকার এই পারিবারিক 'পেনসন' মঞ্জুর করেন। কিছুদিন যেতে না যেতেই এই পেনসন প্রাপ্তির ব্যাপারে একটা বাধা উপস্থিত হল।

নবাব আহাম্মদ বক্স খানের তিন পুত্র ছিল। এদের মধ্যে বড় ছেলের নাম সামসুদ্দীন আহাম্মদ খান্। সামসুদ্দীন আহাম্মদ খানের সঙ্গে বাকী পরিবারের একটা ঝগড়া হয়েছিল। এই ঝগড়ার জন্য সমগ্র পরিবারের উপরেই সামসুদ্দীনের মনে তীব্র ঘৃণা ও প্রতিশোধ-স্পৃহার সঞ্চার হয়েছিল। জ্যেষ্ঠ সন্তান, তাই তিনিই ছিলেন আহাম্মদ বক্স খানের স্বাভাবিকভাবে উত্তরাধিকারী। নবাবের ভয় হয়েছিল যে তাঁর মৃত্যুর পর এই বড় ছেলের হাতেই চলে যাবে যত প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা। এর সুযোগ নিয়ে সামসুদ্দীন তাঁর ছোট দুটি ছেলেকে কষ্ট দেবে। এমনি একটি পরিণতি এড়াবার জন্য আহাম্মদ বক্স খান্ ব্রিটিশ সরকার ও নিজের পরিবারকে জানিয়ে নিজে 1826 খ্রীস্টাব্দে 'নবাবী' ছেড়ে দিলেন। নূতন ব্যবস্থায় সামসুদ্দীনকে ফিরোজপুর

ঝিরকা ও লোহারুর শাসক বা নবাব করা হল এই শর্তে যে লোহারু জায়গীরের আয় তাঁর দুই ছোট ছেলে পাবে, অর্থাৎ সামসুদ্দীন লোহারুর থেকে যা পাবেন সব ছোট দুই ভাইকে ছেড়ে দেবেন। এই ব্যবস্থার প্রভাব গালিবের নিজস্ব পেনসন বা আয়ের উপরও পড়ল। 1806 খ্রীস্টাব্দের ব্যবস্থামত তাঁর এবং তাঁর পরিবারের পাঁচ হাজার টাকার পেনসন আসত ফিরোজপুর ঝিরকা ও লোহারু জায়গীর দুটির রাজস্ব থেকে। 1826 খ্রীস্টাব্দের ব্যবস্থামত সামসুদ্দীনই হলেন টাকা দেওয়ার মালিক। সামসুদ্দীন তাঁর ছোট দু ভাইকে একেবারে পছন্দ করতেন না, এরা ছিল তাঁর দু' চোখের বিষ। গালিব ছিলেন এই ছোট দু' ভাইয়ের বন্ধু ও তাদের হিতৈষী। কাজেই তিনিও হয়ে উঠলেন সামসুদ্দীনের বিদ্বেষ-ভাজন। গালিবের নিজের অংশের নিয়মিত পেনসন প্রাপ্তির ব্যাপারে সামসুদ্দীন নানা বাধার সৃষ্টি করতে লাগলেন এবং পরিশেষে এটা একেবারে বন্ধ করে দিলেন।

একটি প্রেম-প্রসঙ্গ

প্রায় এই সময়েই গালিবের হৃদয়-ঘটিত একটি ঘটনার বিষয় আমরা জানতে পারি। এই ব্যাপারটি গালিবের হৃদয়ে একটি স্থায়ী ছাপ ফেলে গিয়েছিল। এই সময়ে তাঁর বয়স ছিল কম, পঁচিশের বেশী নয়, তিনি ছিলেন সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবান, তাঁর আর্থিক অবস্থাও তখন মোটামুটি ভাল। যে সমাজে তিনি বাস করতেন

ও মেলামেশা করতেন সে সমাজে কোন একজনের প্রণয়িনী বা উপপত্নী থাকাটা আপত্তিজনক ছিল না, এমন-কি, তখনকার দিনে ভদ্রলোকদের মধ্যে কারো উপপত্নী ও প্রণয়িনী থাকাটা মর্যাদাসম্পন্ন মনে করা হত। তখনকার দিনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই যে পণ্ডিত, রাজনীতিবিদ্, ধর্মবেত্তা, উচ্চ-রাজপদাধিকারী ইত্যাদি সকল শ্রেণীর মানুষের গৃহেই নর্তকী বা উপপত্নীরা স্থায়ীভাবে পরিবারভুক্ত হয়েই বাস করত। ধ্বংসোন্মুখ সমাজে মানুষের মধ্যে নৈতিকতাবোধ প্রায়শঃই শিথিল হয়ে পড়ে। এই শৈথিল্যের কারণেই সমাজের মানুষেরা কুকাজে লিপ্ত থাকার সুবিধা ভোগ করে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে দিল্লীর কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা ধীরে ধীরে পতনোন্মুখ হয়ে উঠেছিল। শেষদিকের মুঘল বাদশাহেরা যে অধিকার ও সম্মান জনসাধারণের কাছ থেকে পেতেন— তাঁরা তার উপযুক্ত ছিলেন না। তাঁদের পূর্বপুরুষদের যশোগৌরব স্মরণ করেই লোকে তাঁদের সম্মান করত। ঔরঙ্গজেবের সময় পর্যন্ত যে-সব মুঘল সম্রাট রাজত্ব করে গিয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন অতি উচ্চপ্রতিভাসম্পন্ন, দক্ষ প্রশাসক, বিশেষভাবে বুদ্ধিমান। এঁদের আর-একটি গুণ ছিল— এঁরা ছিলেন কাজের মানুষ— কর্মবীর পুরুষ। যখন যেমন প্রয়োজন তেমনিভাবে পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার মতো যোগ্যতা তাঁদের সবারই ছিল। এর ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক সীমাই শুধু বাড়ে নি, সাম্রাজ্যের গাঁথুনিও হয়েছিল খুব মজবুত, যেমনি ছিল এর শক্তি তেমনি ছিল

এর সমৃদ্ধি। রাজকোষে অর্থের ঘাটতি হত না, সৈন্যবাহিনী ছিল সুশিক্ষিত ও সন্তুষ্ট। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল কেন্দ্রীয় সরকারকে অগ্রাহ্য করে 'স্বাধীন' হয়ে যায়। রাজধানীর 'দরবারী' ব্যক্তিগণ বাদশাহের কাছ থেকে মুনাফা বা ক্ষমতা লাভের জন্য একে অপরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে থাকে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে এমনি ঝগড়া-বিবাদের ফলে দেশের মধ্যে অরাজকতা দেখা দিয়েছিল। তখনকার দিনে সকলেরই হাতে প্রচুর সময় ছিল কিন্তু কি করে এই সময়ের সদ্‌ব্যবহার করা যায় সে বিষয়ে কারো কোন ধারণা ছিল না। রাজনীতির খেলায় যাঁরা মত্ত হতেন তাঁদের হাতেই সমস্ত ক্ষমতা পুঞ্জীভূত থাকত। কিছু সৎ লোকের প্রতিবাদ সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের জীবনে এই যুগে ধর্ম ও নৈতিকতার কোন স্থান ছিল না। এই অবস্থায় সবাই ভাবনা-চিন্তায় জলাঞ্জলি দিয়ে মদ্যপান, জুয়াখেলা অথবা নর্তকী-বিলাসে মত্ত হয়ে থাকতে চাইত।

আমাদের ঠিক জানা নেই গালিব যে রমণীর প্রেমাসক্ত হয়েছিলেন তিনি কোন্ শ্রেণীর ছিলেন। বহু বৎসর পরে তাঁর লেখা একটি চিঠিতে প্রায় স্পষ্ট ভাবেই এই ঘটনাটির উল্লেখ আছে। গালিব 'ডোমনী' এই নামে এঁর উল্লেখ করেছেন। 'ডোমনী' শব্দটির অর্থ একাধারে গায়িকা ও নর্তকী। আমাদের অনুমান যদি যথার্থ হয় তবে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে গালিবের এই প্রেমাস্পদ অল্প বয়সেই মারা যান। কারণ গালিবের লেখা প্রথম জীবনের শায়রীগুলির মধ্যে একটা

মরমিয়া (শোক-গীতি) পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এটি এই প্রেমাস্পদের মৃত্যু উপলক্ষ্যেই রচিত হয়েছিল। এই মরমিয়াটির তাৎপর্য উদ্ধৃত হল :—

1. হায়, আমার বেদনায় তুমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছ
এই ব্যাকুলতা কেন ? হায়, তুমি তো এর আগে কখনও
ব্যাকুল হও নি।

2. তুমি যদি দুঃখ বেদনা সইতে নাই পার,
তবে, হায় কেন তুমি আমার সমব্যথী হয়েছিলে।

3. তুমি কোন্ খেয়ালে কেন বলো আমায় বন্ধুরূপে গ্রহণ
করেছিলে,
হায়, আমায় প্রণয়পাশে বেঁধে, তুমি যে নিজেই
তোমার শত্রু হয়েছ।

4. তুমি সারা-জীবন আমার প্রণয়-বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে,
বলে কথা দিয়েছিলে,
কিন্তু হায়, তাতে লাভ কি, জীবন তো ক্ষণভঙ্গুর।

5. আমার কাছে চারিদিকের পরিবেশ বিষময় ঠেকে,
হায়, তোমার এটা মনঃপূত নয় যে!

6. তোমার রূপ-লাবণ্যের পুষ্প-দাম আজ কোথায় ?
হায়, তুমি যে তাকে ধুলায় মিলিয়ে দিয়েছ।

7. ভালবাসা লুকিয়ে রাখতে, কলঙ্ক থেকে বাঁচতে,
হায়, তোমার ধুলোর ঘোমটা পরার ব্যাপারটা বড়ই
বাড়াবাড়ি নয় কি!

8. ভালবাসার পবিত্র শপথ—ধুলায় মিলিয়ে গেল
হায়, ভালবাসার কথায় আর কে বিশ্বাস করতে চাইবে।

9. হায়, দারুণ আঘাত-হানার আগেই তরবারিধারীর
হাত নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল।

10. বর্ষা-মুখর অন্ধকার রাত্রি কেমন করে কাটবে ?
হায়, আমার দুটি চোখ নক্ষত্র মণ্ডলীর মতই জেগে
থাকতে অভ্যস্ত সারা রাত ধরে।

11. কান শোনে না প্রণয়-বাণী, চোখ দেখে না সৌন্দর্য
হায়, হৃদয় আমার কেমন করে এই হতাশা সইবে ?

12. গালিব, প্রণয়ের গাঢ়তা তন্ময়তা ছোঁয় নি।
আমার ভালবাসার বাসনা সব কিছুই অপূর্ণ রয়ে গেল।

মনে হয়, গালিবের এই প্রণয়িনী সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া ছিলেন। এই কবিতাগুচ্ছ থেকে মনে হয় যে গালিবের সঙ্গে তাঁর প্রণয়ের বিষয়টি তাঁর পরিবারের কাছে বা লোকচক্ষে নিন্দিত হয়ে উঠতে পারে এই ভয়ে মহিলাটি আত্মঘাতী হয়েছিলেন। যদি এই মহিলাটি সাধারণ এক বার-নারী হতেন তবে একটা কলঙ্ক বা অসম্মানের ভয়ে তাঁর পক্ষে আত্মহত্যা করে পরিস্থিতি এড়ানোর প্রশ্নই আসত না। তরুণ বয়সের এই প্রণয় গালিবের মনে একটি স্থায়ী দাগ রেখে গিয়েছিল। তখনকার দিনের সামাজিক পরিবেশে এটা সম্ভব যে তিনি এমনি ধরনের আরো কিছু প্রণয়-ঘটিত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলেন, তবে এ সম্বন্ধে কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় নি।

এই অব্যবস্থিত সামাজিক অবস্থায় গালিব তাঁর পারি-পার্শ্বিকের প্রভাব এড়াতে পারেন নি। তিনি মদ্য পান ও জুয়া খেলাতেও অভ্যস্ত হয়েছিলেন। আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না থাকলে এই অভ্যাসগুলি বজায় রাখা যায় না। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই আর্থিক সচ্ছলতা তাঁর ছিল না। তাঁর মা যতদিন আগ্রায় জীবিতা ছিলেন সম্ভবতঃ ততদিন পর্যন্ত তিনি গালিবকে টাকা-কড়ি জোগাতেন, এটা অবশ্যই স্বাভাবিক। আহাম্মদ বক্স খানের সঙ্গে গালিবের পারিবারিক সম্পর্ক ছিল; গালিবের সম্বন্ধে নীতিগতভাবেও তাঁর কিছু কর্তব্য ছিল। এইসব কারণে মোটামুটিভাবে আহাম্মদ বক্স খানও তাঁর প্রয়োজন মিটাতেন। আহাম্মদ বক্স খান্ যখন তাঁর নবাবী গদির স্বত্ব ত্যাগ করেন, তখন কিন্তু অবস্থাটা খারাপ হয়ে গেল। গালিবের আর্থিক অবস্থা খুব শীঘ্রই শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। তাঁর ধার-দেনার পরিমাণও ভারী হয়ে উঠেছিল। এই অবস্থায় মানুষের স্বভাব এই যে একটা অজুহাত খুঁজে বের করা।

পেনসনের মামলা

আগেই বলা হয়েছে যে 1806 খ্রীস্টাব্দে গালিবের জ্যেষ্ঠতাত নসরুল্লা বেগের মৃত্যুর পর লর্ড লেক যে প্রথম আদেশ জারী করেন তার মর্ম ছিল এই যে মৃতের পরিবার বার্ষিক 10,000 টাকা পেনসন পাবে। পরে নবাব আহাম্মদ বক্সের চেষ্টায় এই

আদেশটি সংশোধিত ভাবে কার্য্যকরী হয়। এই সংশোধিত আদেশ অনুসারে ব্যবস্থা হয় দশহাজারের অর্ধেক পাবে এই পরিবার এবং বাকী অর্ধেক পাবেন কে একজন খাজা হাজী নামে ব্যক্তি। গালিব দ্বিতীয় এই সংশোধিত আদেশের কথা জানতেন না। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে পুরো বার্ষিক দশ হাজার টাকা পেনসনই তাঁর পরিবারের প্রাপ্য। তাঁর নিজের আর্থিক দুরবস্থা যখন চরম অবস্থায় এসে পৌঁছেছে তখন তার সহসা যেন মনে পড়ে গিয়েছিল যে দীর্ঘ দিন ধরে তাঁর পরিবারের প্রতি গভীর অবিচার করা হয়েছে, বার্ষিক 10,000 টাকার পরিবর্তে তাঁরা পেয়ে এসেছেন মাত্র 5,000 টাকা। সব চেয়ে আপত্তির বিষয় এই যে, যে ব্যক্তিকে কোনমতেই নসরুল্লা বেগের পরিবারভুক্ত বলে গণ্য করা যায় না তাকেও পেনসনের অংশ দেওয়া হচ্ছে। শুধু পেনসন দেওয়াই নয়, এর সিংহভাগটুকুই এই ব্যক্তি ভোগ করে নিচ্ছে। এই অন্যায় বা ভুল সংশোধনের জন্য গালিব সর্বপ্রথম নবাব আহাম্মদ বক্স খানের শরণাপন্ন হন। নবাব তাঁকে এই বলে শান্ত করেন যে তিনি ন্যায়বিচার যাতে হয় তার সাধ্যমত চেষ্টা করবেন। নবাব এ বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট চেষ্টা না করায়, গালিব অধৈর্য হয়ে উঠলেন। তিনি সংকল্প করলেন যে কলকাতা গিয়ে তিনি সর্বোচ্চ সরকার অর্থাৎ ইংরাজের আদালতে নিজের দাবি পেশ করবেন। এই ভাতার ব্যবস্থা সর্বপ্রথম ইংরাজ সরকারের একজন প্রতিনিধিই করেছিলেন। তিনি লর্ড লেক।

কলকাতা যাত্রা

1828 খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতে গালিব কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বান্দা, এলাহাবাদ, বারাণসী, মুর্শিদাবাদ হয়ে কলকাতা পৌঁছালেন। এই যাত্রাপথ ছিল দীর্ঘ ও কঠিন। পরের এপ্রিলেই তিনি গভর্নর জেনারেলের নিকট তাঁর প্রথম আবেদন পত্র পেশ করলেন। দরখাস্তে তিনি নিম্নলিখিত অনুরোধ জানান :—

1. 1806 খ্রীস্টাব্দের মে মাসে লর্ড লেক স্বর্গত নসরুল্লা খানের পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্য 10,000 টাকা বার্ষিক সাহায্য-ভাতা মঞ্জুর করেন। এই দশহাজার টাকার পরিবর্তে এ পর্যন্ত মাত্র পাঁচহাজার টাকা দেওয়া হয়ে আসছে। অতএব পূর্বনির্ধারিত দশহাজার মুদ্রা পেনসনের ব্যবস্থা হোক।

2. এই সাহায্য-ভাতা বা পেনসন নসরুল্লা বেগ খানের পরিবারবর্গের ভরণপোষণের উদ্দেশ্যে মঞ্জুর করা হয়েছিল। কিন্তু যাঁর সঙ্গে নসরুল্লা বেগ খান্ অথবা তাঁর পরিবারবর্গের সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই এমন একজন বাইরের লোক (খাজা হাজী)-কে এই ভাতার একজন অংশীদার করে দেওয়া হয়েছে। এই ব্যক্তির মৃত্যুর পর এঁর দুই পুত্রকে পিতার প্রাপ্য অংশের ভাগীদার করা হয়েছে। এটা বন্ধ করা হোক।

3. দশ হাজার টাকা মঞ্জুরীকৃত হয়েছিল ; দেওয়া হচ্ছে মাত্র পাঁচ হাজার টাকা। যে টাকা দেওয়া হয় নি তার যোগফল

ঠিক করে সমস্ত টাকা বাকী-বকেয়া সমেত এই পরিবারকে দেওয়া হোক। এই টাকার মধ্যে যেন খাজা হাজীকে ভুলক্রমে প্রদত্ত বার্ষিক 2000 টাকারও হিসেব ধরা হয়।

4. ভবিষ্যতে এই টাকা যেন ব্রিটিশের কোষাগায় বা ট্রেজারী থেকে দেওয়া হয়, এই টাকা এ যাবৎ ফিরোজপুর ঝিরকা রাজ্য থেকে দেওয়া হয়েছে।

নবাব আহাম্মদ বক্স খান্ 1827 খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে মারা যান। গালিব এই সংবাদটি যাত্রাপথে মুর্শিদাবাদে শুনতে পান। কাজেই এই মামলার অপরপক্ষ দাঁড়ালেন নবাবের জ্যেষ্ঠ পুত্র সামসুদ্দীন আহাম্মদ খান্। এই ব্যক্তি পিতার জীবদ্দশা-তেই ফিরোজপুর ঝিরকার নবাবী গদিতে আসীন হয়েছিলেন। গালিবের দরখাস্তের জবাবে সামসুদ্দীন লর্ড লেকের দ্বিতীয় আদেশটি পেশ করেন। এতে আগেকার 10,000 টাকার পরিবর্তে পাঁচ হাজার টাকা ভাতা নির্ধারিত হয়েছিল। 10,000 টাকার ভাতা ও বক্রী টাকার দাবি যে যুক্তিযুক্ত এটা প্রমাণিত করার জন্য গালিব এই অভিযোগ উত্থাপন করলেন যে, দ্বিতীয় হুকুমনামাটি জাল, কিম্বা কোন সন্দেহজনক উপায়ে এটি খাড়া করা হয়েছিল। তাঁর আরো বক্তব্য ছিল এই যে এই দ্বিতীয় হুকুমনামাটির কোন নকল দিল্লী কিম্বা কলকাতার সরকারী মহাফেজখানায় রক্ষিত হয় নি। তাঁর দ্বিতীয় বক্তব্য এই ছিল যে হুকুমনামাটি ফার্সীতে লেখা। প্রথামত এর উল্টো পিঠে লর্ড লেক বা অন্ততঃপক্ষে তাঁর সেক্রেটারীর সই থাকার কথা।

সামসুদ্দীন আহাম্মদ খান্ যে দ্বিতীয় হুকুমনামাটি পেশ করেন তাতে এমন কোন সই ছিল না। গালিবের মোট বক্তব্য এই দাঁড়িয়েছিল যে দ্বিতীয় হুকুমনামাটি জাল এবং এটির নির্দেশ নির্ভরযোগ্য নয়। তিনি আরো বলেছিলেন যে এই দ্বিতীয় হুকুমনামাটি আগেকার যে হুকুমনামায় বার্ষিক দশ হাজার টাকা ভাতা মঞ্জুর করা হয়েছে তা বাতিল করে দিতে পারে না, কারণ এটি লর্ড লেকের দ্বারা স্বাক্ষরীকৃত এবং এটা গভর্নর জেনারেল দ্বারা অনুমোদিত। এর একটি 'কপি' কলকাতার আপিসে রেকর্ডভুক্ত হয়ে আছে।

গালিবের যুক্তিগুলি এতদূর তথ্য-সম্মত ও সুসংগত ছিল যে ভারত সরকারের মুখ্য সচিব জর্জ সুইনটন এই বিশ্বাসে উপনীত হয়েছিলেন যে নবাবের প্রদর্শিত হুকুমনামাটি জাল এবং গালিবের দাবিই মেনে নেওয়া উচিত। যখন আলোচ্য জায়গীর ও ভাতা ইত্যাদি প্রদত্ত হয়েছিল তখন সার জন ম্যাল্‌কম ছিলেন লর্ড লেকের সচিব। ইনি গালিবের এই মামলা চলার সময়ে বোম্বাই প্রদেশের ছোটলাটের পদে আসীন ছিলেন। এইজন্য এই দ্বিতীয় হুকুমনামাটি তাঁর কাছে পাঠিয়ে এ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য চাওয়া হয়েছিল। গালিবের যুক্তিগুলি সংগত ভাবে খণ্ডন না করে সার জন ম্যালকম্ মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন যে নবাব আহাম্মদ বক্স খান্ একজন অতিশয় সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন, তার উপর তিনি ছিলেন লর্ড লেকের বিশেষ আস্থা-ভাজন। এ হেন ব্যক্তি যে একটা হুকুমনামা 'জাল' করবেন এটা কল্পনাতীত।

এই অজুহাতে সার জন এই মত প্রকাশ করেন যে হুকুমনামাটি বিশ্বাসযোগ্য এবং সাক্ষ্য হিসাবেও গ্রহণযোগ্য। সার জনের এই অভিমত পাওয়ার পর সপারিষদ গভর্নর জেনারেল স্থিতাবস্থার কোন পরিবর্তনে অসম্মতি প্রকাশ করলেন। এক কথায় বলা যায় গালিব তাঁর মামলাটিতে হেরে গেলেন।

সপারিষদ গভর্নর জেনারেলের এই অভিমত পাওয়ার জন্য গালিব কলকাতায় আর কালক্ষেপ করেন নি। কলকাতা থেকে যাত্রা করে 1829 খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসের শেষ ভাগে তিনি দিল্লী ফিরে আসেন। যে উদ্দেশ্যে কলকাতায় যাওয়া তা সফল না হলেও একাধিক কারণে এই কলকাতা-বাসের অভিজ্ঞতা গালিবের জীবনে একটি দিক্‌চিহ্ন স্বরূপ দেখা দিয়েছিল।

কলকাতা— সাহিত্য-বিসম্বাদ

গালিবের কলকাতা আসার কিছু পরেই কলকাতা কলেজের সাহিত্যিক সমাজ একটি সাহিত্য-গোষ্ঠী ও মুশায়রার আয়োজন করেন। গালিব এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি স্বরচিত দুটি ফার্সী গজল পাঠ করেন। কলকাতার তদানীন্তন কবি-সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তিই ছিলেন হয় মুহম্মদ হসন কতীল-এর শিষ্য অথবা তাঁর অনুরক্ত ভক্ত। কতীলের ভাবধারা বা শৈলী অনুযায়ী গালিবের এই গজলের বিরোধী আলোচনা তাঁর গজল পাঠের পর উত্থাপিত হয়েছিল। ভারতীয়

ফার্সী-পণ্ডিতদের কারো প্রতি গালিব শ্রদ্ধা পোষণ করতেন না। তাঁর অভিমত এই ছিল যে গভীর অধ্যয়ন ও কঠোর পরিশ্রমে যে-কোন ভাষা আয়ত্ত করতে পারা অবশ্যই সম্ভব। কিন্তু কোন ভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগ ও মুহাবরা সম্বন্ধে আদর্শ কী হবে সে সম্বন্ধে মত দেবার অধিকারী তাঁরাই যাঁদের এটি মাতৃভাষা। যে দেশের ভাষা সে দেশের বাইরের কেউ এ ভাষার যতবড় পণ্ডিত রূপেই খ্যাত হন না কেন ব্যবহৃত ভাষা ভাল কি মন্দ হয়েছে সে বিষয়ে তাদের মত যে গ্রহণযোগ্য হতেই হবে, এমন হতে পারে না। কতীল ছিলেন ভারতবাসী। এইজন্য তাঁর কোন বিচার-ধারা অথবা রচনাকে প্রামাণিক রূপে গ্রহণ করে সেই নিরিখে তাঁর (অর্থাৎ গালিবের নিজের) রচনা ভাল কি মন্দ এ বিচারের অধিকার কারো নেই। কার্যতঃ কতীল সম্বন্ধে তিনি কটূক্তিই করেছিলেন। এই সাহিত্য-সভার শ্রোতৃবৃন্দ কতীলকে একজন খুব বড় কবি ও ফার্সী ভাষার একজন পণ্ডিত রূপে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। সুতরাং গালিবের এই মন্তব্যে সবাই খুব বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন, ফলে গালিবকে কঠোর নিন্দা ও সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। গালিবকে মৌখিকভাবে ও লিখিতভাবে এই-সব বিরুদ্ধ সমালোচনার জবাব দিতে হয়েছিল। এই বিরোধিতা কালক্রমে স্তিমিত হয়ে এসেছিল কিন্তু একেবারে মিলিয়ে যায় নি। এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি গালিবের সাহিত্যজীবনে স্থায়ীভাবে বিরূপ ছায়াপাত করেছিল। তবে এতে তাঁর মতের অবশ্য কোন পরিবর্তন ঘটে নি। ভারত-জাত ফার্সী পণ্ডিতদের প্রতি তাঁর

ঘৃণা ও উপেক্ষার মনোভাব তাঁর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধিই পেয়েছিল, হ্রাস পায় নি।

কলকাতার সাংস্কৃতিক প্রভাব

গালিবের কলকাতা-ভ্রমণের পরিণাম এই একটা হয়েছিল যে এই ভ্রমণে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিই পালটে গিয়েছিল। এই পরিবর্তন তাঁর মানসিকতা গড়ে তোলার পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। তখনকার দিনের কলকাতা ছিল ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল শহর। ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত হওয়ার ফলে, এখানে বহু আধুনিক ও নবীনতম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি প্রচলিত হয়ে পড়েছিল। পৃথিবীর নানা দিক-দেশ থেকে নানান পণ্যসম্ভারে বোঝাই জাহাজগুলি কলকাতা বন্দরে এসে ভিড়ত। সেখানে সর্বদাই একটা কর্মচাঞ্চল্য বিরাজ করত। কলকাতা-প্রবাসী ইংরাজেরা কলকাতার প্রাচ্যদেশ-সুলভ অনড় ও শ্লথগতি পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে অনেকাংশে বদলে দিতে সক্ষম হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে বহু উর্দু পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে কিছু ছিল মৌলিক রচনা, কিছু ইংরেজী বা অন্য কোন প্রাচ্য ভাষা গ্রন্থের অনুবাদ। এই উর্দু রচনাগুলি উর্দু গদ্যের একটি নূতন গতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। কলকাতায় বহু ইরাণ-দেশীয় ব্যবসায়ী বা পর্যটকের বাস ছিল। গালিব এঁদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে

আসার সুযোগ পেয়েছিলেন। এই সম্পর্ক থেকে তিনি আধুনিক ফার্সী ভাষার জ্ঞানও অর্জন করতে পেরেছিলেন। এই ধরনের মেলামেশা ও বাতাবরণের প্রভাবে গালিবের দৃষ্টিভঙ্গি শুধু সাহিত্যের ব্যাপারেই নয় অন্য ক্ষেত্রেও পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিও তাঁর পাল্‌টে গিয়েছিল।

দেখা যাচ্ছে যে, গালিব যে মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে দীর্ঘ ও কষ্টকর পথ ধরে কলকাতায় এসেছিলেন তা সফল হয় নি। তবে তাঁর যাত্রা একেবারে ব্যর্থ হয় নি। কলকাতা-ভ্রমণ তাঁর সাধারণ-জ্ঞান ও বুদ্ধি-বৃত্তিকে মার্জিত করেছিল— এতে তিনি লাভবানই হয়েছিলেন। ফার্সী ভাষার প্রভাবে, গালিবের যুগ পর্যন্ত উর্দু ভাষা ছিল একটু বেঢপ, ফার্সী শব্দ ও বাগ্‌ভঙ্গির প্রভাবে আড়ষ্ট। এটা অবশ্য স্বাভাবিকই ছিল, কারণ তখনকার দিনের উর্দু লেখকেরা সকলেই ছিলেন ফার্সী পড়ুয়া, এঁরা অবস্থার চাপে পড়ে উর্দু লিখতে বাধ্য হতেন, না লিখে উপায় ছিল না। তবে এঁরা এই নূতন ভাষার প্রতি বেশ শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন না, তাই এঁদের উর্দু রচনায় দরদের অভাব থেকে যেত। এঁদের বেশীর ভাগ রচনা ফার্সীতেই লেখা হত। এঁরা উর্দুতে যখন লিখতেন তখন এঁরা ফার্সীর প্রভাবটি কাটিয়ে উঠতে পারতেন না।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উদ্যোগই সর্বপ্রথম উর্দু গদ্যে একটি নূতন শৈলী এনে দিতে পেরেছিল। ইংলণ্ডের যে-সব

তরুণেরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাকুরী গ্রহণ করে এ দেশে কেরানী বা 'রাইটার' হয়ে আসত তাদের পাঠোপযোগী পুস্তকের জোগান দেওয়াই ছিল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-প্রকাশিত উর্দু গ্রন্থগুলির উদ্দেশ্য। গ্রন্থগুলি বিশেষভাবে এই উদ্দেশ্যেই রচিত হত। এই কর্মচারীদের পক্ষে রাজকার্য পরিচালনের জন্যই উর্দু শিখতে হ'ত কারণ এটাই ছিল দেশের অধিকাংশ মানুষের কথা-বার্তা ও ভাব-বিনিময়ের ভাষা। লর্ড ওয়েলেসলী এই কলেজটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইংলণ্ড থেকে সদ্য-আগত 'রাইটার'দের এই কলেজে উর্দু শেখানোর ব্যবস্থা ছিল। পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়নের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানের কবি ও লেখকদের নিযুক্ত করা হত। এঁরা ফার্সী বা আরবী ভাষার বই উর্দুতে অনুবাদ করতেন অথবা মৌলিকভাবে উর্দুতেই বই লিখতেন। এই বইগুলির ভাষা যাতে সরল ও কথ্যভাষার মতই হয় সেদিকে নজর দেওয়া হত, এর প্রয়োজনও ছিল। মনে হয় যে, গালিব ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে প্রকাশিত এমনি সরল ও সাবলীল ভাষায় রচিত কিছু উর্দু গদ্যের বই পড়েছিলেন। অনেকে মনে করেন যে গালিব ইংরাজী পত্র-লিখন-পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই ধরনের পদ্ধতি হল প্রচলিত উর্দু ও ফার্সী রীতির থেকে ভিন্ন। ইংরাজী পত্রে— সোজাসুজি বক্তব্য বিষয়ের অবতারণা করা হয়। প্রচলিত ফার্সী ও উর্দু পত্র-লিখন-পদ্ধতি হল বাগাড়ম্বরপূর্ণ প্রস্তাবনা যুক্ত। গালিব ইংরাজী পত্র-লিখন-পদ্ধতির অনুসরণ করতেন এই ধারণাটি ঠিক

নয়। কলকাতা যাত্রার বহু পূর্ব থেকেই পুরোমাত্রায় ফার্সী রচনায় নিরত গালিব চিঠিপত্র লেখার কাজে ফার্সী ধরনের দীর্ঘ প্রস্তাবনা ফাঁদার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতেন। শুধু তাই নয়, অপ্রয়োজনীয় বন্ধন থেকে ভাষাকে মুক্তি দেওয়াও তিনি সমর্থন করতেন। যাই হোক, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-প্রবর্তিত সিধা ও সরল উর্দু গদ্য শৈলীর সঙ্গে পরিচয় লাভ করে গালিব উপকৃতই হয়েছিলেন। লম্বা-চওড়া শব্দাবলীযুক্ত অনাবশ্যক বাগাড়ম্বর যা তিনি অপছন্দ করতেন, ফোর্ট উইলিয়ম-প্রবর্তিত উর্দু শৈলীও সেই দোষ থেকে মুক্ত ছিল। এই ব্যাপার থেকে তাঁর নিজস্ব মতটি আরো পরিপুষ্ট হতে পেরেছিল।

1829 খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ ভাগে গালিব দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

সামসুদ্দীন আহাম্মদ খানের জীবনান্তে

গালিবের দিল্লীতে অনুপস্থিতি কালে ঘটনাস্রোত দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছিল। আগেই বলা হয়েছে যে নবাব আহাম্মদ বক্স খান্ 1827 খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে মারা যান। এই ঘটনার পর নবাব সামসুদ্দীন আহাম্মদ খান্ ফিরোজপুর ঝিরকা ও লোহারু এই দুই জায়গীরের গদিতে বেশ পাকা ভাবে উঠে বসলেন। নিজের ছোট দুই ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর পুরানো ঝগড়া মিটে যাওয়া দূরে থাক্ তা আরো তীব্র হয়ে উঠেছিল। সামসুদ্দীন নিত্য

নূতন এমন সব নানা বাধার সৃষ্টি করতে থাকলেন যার ফলে এই দুই ভাইয়ের পক্ষে পৈত্রিক উত্তরাধিকার ভোগ অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। গালিব মামলা দায়ের করার ফলে ফিরোজপুরের 'খাজনা' থেকে তাঁর 'পেনসন' একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এসব ঝঞ্ঝাট সৃষ্টি করেই সামসুদ্দীন ক্ষান্ত থাকেন নি। ব্রিটিশ প্রতিনিধি মিঃ উইলিয়ম ফ্রেজারের সঙ্গেও নবাবের দারুণ মনোমালিন্য ঘটেছিল। এর পরিণাম খুবই অশুভ হয়েছিল। 1835 খ্রীস্টাব্দের 22শে মার্চ ফ্রেজার যখন একটা নৈশাহারের নিমন্ত্রণ সেরে কাশ্মীর গেটের বাইরে উচ্চভূমির উপর অবস্থিত নিজের বাসস্থানে ফিরছিলেন তখন তাঁকে গুলি করে নিহত করা হয়। এই খুনের অনুসন্ধানের ফলে করিম খাঁ নামে নবাবের এক কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করে তাকে এই খুনের জন্য অভিযুক্ত করা হয়। আর একটু তদন্তের পর অনেক নূতন তথ্য বেরিয়ে পড়ে। দেখা গেল, নবাব স্বয়ং এই হত্যা-ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট। এর ফলে নবাব এবং করিম খাঁ দুজনেরই বিচার আরম্ভ হয়। আসল হত্যাকারীকে 1835 খ্রীস্টাব্দের 26শে আগস্ট ফাঁসি দেওয়া হয়। এইসঙ্গে বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট সমস্ত ঘটনাটি কলকাতায় গভর্নর জেনারেলকে জানিয়ে এই সুপারিশ করেন যে এই হত্যার প্ররোচনা-দাতা নবাবেরও মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত। সপারিষদ গভর্নর জেনারেল দিল্লীর ম্যাজিস্ট্রেটের এই সুপারিশ অনুমোদন করায় এই বছরের 8ই অক্টোবর নবাবকেও ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হয়।

এই ঘটনাটিতে পরিস্থিতির বেশ পরিবর্তন এসেছিল। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টই আহাম্মদ বক্স খানকে ফিরোজপুর ঝিরকা জায়গীর বখ্‌শিশ দিয়েছিলেন। আহাম্মদ বক্স খানের উত্তরাধিকারী সামসুদ্দীনের ফাঁসির পর এই জায়গীর ইংরেজ সরকার স্বয়ং গ্রহণ করলেন। লোহারু জায়গীরটি আলোয়ারের মহারাজার দান— এটি অবশ্য নবাব-পরিবারের হাতেই থেকে গিয়েছিল। সামসুদ্দীনের অনুজ আমিনুদ্দীন আহাম্মদ খান্‌ এখন থেকে লোহারুর নবাবের গদিতে আসীন হলেন। ঠিক হয়েছিল যে তিনি জায়গীরের অর্ধেক লভ্যাংশ তাঁদের সর্বকনিষ্ঠ ভাই জিয়াউদ্দীন আহাম্মদ খানকে দেবেন— কারণ তিনিও ছিলেন এই সম্পত্তির অন্যতম অংশীদার। এখন থেকে গালিবের পেনসন দেবার ভার পড়েছিল দিল্লীর কালেক্টরীর উপর।

পেনসনের পরিমাণ বার্ষিক 10,000 টাকা নির্ধারিত হোক এই মর্মে গালিবের যে মামলা সপারিষদ গভর্নর জেনারেল নাকচ করে দিয়েছিলেন, গালিব তার বিরুদ্ধে আপিল করেছিলেন। অবশেষে 1842 খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডের স্বরাষ্ট্র দপ্তর এই আপিলটিও রদ করে দেন। গালিব এর পরেও তাঁর মামলা নূতন নূতন যুক্তি দিয়ে জেতার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তা সাফল্য লাভ করে নি। 1844 খ্রীস্টাব্দে গালিব তাঁর পরাজয় চূড়ান্তরূপে মেনে নিয়েছিলেন।

এই মামলার সূচনায় তাঁর একটি দাবি এই ছিল যে ভবিষ্যতে তাঁর পেনসন ফিরোজপুর ঝিরকা স্টেটের পরিবর্তে ব্রিটিশ

কোষাগার থেকে দেওয়া হবে। এই ব্যবস্থা অনেকটা ঘটনা-চক্রেই হয়ে গিয়েছিল। কারণ সামসুদ্দীনের মৃত্যুর পর নবাব বা ঝিরকা এস্টেট্—এই দুয়েরই অস্তিত্ব লোপ পেয়েছিল। তাঁর আর-একটি আবেদন এই ছিল যে গভর্নর জেনারেলের রাজসভা বা দরবারে তাঁর নিমন্ত্রণ হবে এবং তাঁকে 'খিলঅত' বা রাজ-পোষাক দ্বারা সম্মানিত করা হবে। এর প্রথম অনুরোধটি লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে গালিব যখন কলকাতায় ছিলেন তখনই স্বীকৃত হয়। 'দরবারী পোষাক' পাওয়ার অনুরোধটি লর্ড এলেন বরোর (1842-44) শাসনকালে মঞ্জুর করা হয়। এই সময়ে তাঁর পেনসনের মামলাটি যবনিকা-পাতের অপেক্ষায় ছিল।

গালিবের পেনসনের মামলাটি 15 বছর ধরে চলেছিল। গালিবের স্বল্প আয়ের অনেকটাই এই মামলা শুষে নিয়েছিল। এই মামলার খরচ চালানোর জন্য তাঁকে চোটা-সুদে বহু টাকা ধার করতে হয়েছিল। এই দেনা শোধ করতে গালিবকে পরবর্তী কালে বহু কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল।

মুঘল দরবারের সঙ্গে সম্পর্ক

আর্থিক দুরবস্থা সত্ত্বেও সাহিত্য-জগতে গালিব এই সময়ে বেশ উচ্চস্থানের অধিকারী হতে পেরেছিলেন। মুঘল দরবারে তাঁর প্রবেশ লাভ কিভাবে সম্ভব হয়েছিল সে বিষয়ে কোন প্রত্যক্ষ তথ্য আমাদের জানা নেই। গালিব যখন আগ্রা থেকে দিল্লীতে বাস করতে আসেন তখন লাল কেল্লার রাজ সিংহাসনে

অধিষ্ঠিত ছিলেন দ্বিতীয় আকবর শা। দিল্লী আসার পর খুব সম্ভব গালিব নবাব আহাম্মদ বক্স খানের পরিবারের সঙ্গে বাস করতেন। এটা নিশ্চিত যে এই নবাব শুধু দিল্লী-দরবারের সঙ্গে পরিচিতই ছিলেন না, দরবারে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তিও বেশ ছিল। এটা বেশ ধরে নেওয়া যায় যে নবাব আহাম্মদ বক্সই গালিবকে বাদশাহী দরবারের সঙ্গে পরিচিত করে দেন। প্রথম দিকে, গালিব বাদশার অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করেছিলেন। গালিবের ফার্সী দিওয়ানে দ্বিতীয় আকবর শাহের প্রশংসামূলক একটি 'কসীদা' দেখতে পাওয়া যায়। এই 'কসীদা'র শেষ অংশে বাদশার উত্তরাধিকারী যুবরাজ সলীমেরও উল্লেখ আছে। বাদশার অনুগ্রহ লাভের এই প্রয়াস সম্ভবতঃ ব্যর্থ হয়েছিল। দ্বিতীয় আকবর শা কিছু কবিতা রচনা করলেও শিল্প-সাহিত্য প্রেমিক ছিলেন না। গালিব এইজন্যই তাঁকে প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। আকবর শাহ্ 1837 খ্রীস্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্। এই নূতন বাদশাহ উর্দু ভাষায় শুধু পারদর্শীই ছিলেন না, একজন বিশিষ্ট কবি হিসাবে উর্দু সাহিত্যের ইতিহাসে ইনি একটি স্থায়ী আসনও দাবি করতে পারেন। তিনি 'জাফর' এই ছদ্ম-নামে কাব্য-রচনা করতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, গালিব এঁর দরবারেও ঢুকতে পারেন নি। বাদশাহী গদিলাভের কোন আশা নেই জেনে দ্বিতীয় বাহাদুর শা প্রথম জীবনেই সময় কাটানোর উপায় হিসাবে কবিতা লেখা শুরু করেন। কাব্যসাধনার শুরুতে

প্রসিদ্ধ উর্দু শায়র নসীর ছিলেন এঁর 'ওস্তাদ' ও পথ-প্রদর্শক। মহারাজা চণ্ডূলালের আহ্বানে যখন নসীর দাক্ষিণাত্যের হায়দ্রাবাদ চলে যান তখন 'জাফর' কাজিম আলি বেকার নামে একজন কবির পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তবে এঁদের দুজনের সহযোগিতা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। 1808 খ্রীস্টাব্দে মন্টস্টুয়ার্ট এলফিনস্টোনের সৈন্যবাহিনীতে অনুবাদকের চাকরী নিয়ে বেকরার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে চলে যান। মন্টস্টুয়ার্ট এলফিন-স্টোন ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক কাবুলের আমীরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও সন্ধিস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটি বিশেষ পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। বেকরার চলে যাওয়ার পর জাফর মহম্মদ ইব্রাহিম জৌক নামে এক তরুণ কবির সহযোগিতা গ্রহণ করেছিলেন, ইনি তখনকার দিনে খুব দ্রুত সাহিত্যজগতে খ্যাতি-মান্ হয়েছিলেন।

দেখা যাচ্ছে যে, দিল্লীর দরবারে কবি রূপে প্রতিষ্ঠা বা প্রবেশলাভের সম্ভাবনা গালিবের দিল্লী আগমনের আগে থেকেই রুদ্ধ হয়েছিল। পরবর্তী কালে বাদশাহের অনুগ্রহ লাভের চেষ্টার পথে শুধু জৌক বা তাঁর দলের বিরোধিতাই তাঁর পক্ষে একমাত্র বাধা ছিল না। দ্বিতীয় আকবর শাহ্ ও তাঁর পুত্র সেলিমের প্রশস্তিসূচক যে 'কসীদা' গালিব ইতিপূর্বে লিখে-ছিলেন সেটিও হয়ে দাঁড়িয়েছিল একটি মস্ত বাধা। দ্বিতীয় আকবর শাহ্ তাঁর পুত্র সেলিম উভয়েই দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের সিংহাসন প্রাপ্তির সক্রিয় বিরোধিতা করেছিলেন।

গালিব স্বীয় যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ ছিলেন। জৌক ও তাঁর দলভুক্ত শায়রদের হাতে নিজের পরাজয় গালিবকে সম্ভবতঃ বেশ পীড়িত করেছিল। গালিবের জীবন প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে অবিশ্রান্ত সংঘর্ষে কেটেছিল। অতি অল্প বয়সে, যখন তিনি শিশু তখন গালিবের বাবা মারা যান, তারপর মারা যান জ্যেঠা। দীর্ঘকাল তাঁর জীবনে নিরাপত্তা ছিল না, বেঁচে থাকার জন্য অপরের অনুগ্রহের উপর তাঁকে নির্ভর করে থাকতে হ'ত। যখন তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছেন তখন দেখলেন তাঁর পরিবারের ন্যায্য প্রাপ্য অন্যে ঠকিয়ে ভোগ করেছে। এর প্রতিকারের জন্য তিনি আইনের আশ্রয় নিলেন, দীর্ঘদিন ধরে তাঁর মামলা চলেছিল। বহু অর্থব্যয় ও সময় নষ্ট যখন হয়ে গিয়েছে তখন মামলায় তাঁর হার হল। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে এই-সব অকরুণ অভিজ্ঞতা গালিবের মনে সেই সমাজ সম্বন্ধে একটা বিদ্রোহী মনোভাব এনে দিয়েছিল যে সমাজ এমনি অন্যায়ের সমর্থক।

এমনি প্রতিকূল বৈষয়িক অবস্থাতেও কোন মানুষ তার বুদ্ধি অথবা নৈতিক গুণাবলীর যথোচিত স্বীকৃতি পেলে তার কিছুটা ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়, সে কিছুটা আত্ম-প্রসাদের স্বাদ অনুভব করতে পারে। দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের দরবার নগণ্য এবং বিশেষ গুরুত্বহীন হওয়া সত্ত্বেও এইটাই ছিল তৎকালে একমাত্র জায়গা যেখান থেকে স্বীকৃতি পাওয়া সম্ভব ছিল। ঠিক সময়মত এই ঠিকানায় পৌঁছাতে না পারায় গালিব এই স্বীকৃতি থেকেও

বঞ্চিত হয়েছিলেন। এটা আশ্চর্য হবার মত ঘটনা নয়, যে এই কারণগুলির জন্য সমসাময়িক সাহিত্য-জগৎ সম্বন্ধে গালিবের মনে একটা বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। এই মনোভাবের ফলে গালিবের লাভও হয়েছিল আবার ক্ষতিও হয়েছিল। লাভ হল এই যে তিনি আর কারো সাহায্যের প্রত্যাশা না করে নিজের চেষ্টায় উপরে ওঠার চেষ্টা করেছিলেন। ক্ষতি হয়েছিল এই যে তিনি পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে চলতে পারেন নি।

উর্দু দীওয়ান

শাহী দরবারে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিলাভে গালিব ব্যর্থ হয়েছিলেন এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তা সত্ত্বেও বহু লোকে তাঁর শক্তি-মত্তায় আস্থাবান হয়েছিলেন। এঁরা তাঁকে খুব উঁচুদরের কবি বা লেখক রূপে মেনে নিয়েছিলেন। ধীর এবং নিশ্চিত পদ-ক্ষেপে গালিব নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের দ্বারা এক দল সুধী-পণ্ডিত ও কাব্য-রসিক মহলের সমর্থন লাভে তিনি কৃতকার্য হয়েছিলেন। একজন বন্ধুর পরামর্শে গালিব তাঁর উর্দু দীওয়ানগুলি সংশোধনের কাজে হাত দেন। এই সংশোধনকালে তিনি অর্থ-দুষ্ট ও সুপ্রযুক্ত নয় এমন কতকগুলি পদ্য ছেঁটে ফেলেছিলেন। 1841 খ্রীস্টাব্দে সর্বপ্রথম তাঁর উর্দু 'দীওয়ান' প্রকাশিত হয়েছিল। এই ছোট্ট পুস্তকটিতে 1100 'শায়ের' সন্নিবিষ্ট হয়েছিল।

আর্থিক কৃচ্ছ্রতা

একজন বড় কবি হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া আর সচ্ছলতার সঙ্গে আরামে দিন যাপন করা একই ব্যাপার নয়। গালিবের ব্যয় ছিল প্রায় সব সময়েই তাঁর আয়ের অনুপাতে বেশী। যতদিন মা বেঁচেছিলেন ততদিন গালিব তাঁর কাছ থেকে অর্থ-সাহায্য পেতেন। গালিবের মা ঠিক কোন্ সময়ে মারা যান সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে কোন সংবাদ জানা যায় না। তবে কিছু সংযোগাত্মক ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় এই দুঃখদায়ক মৃত্যুটি ঘটেছিল 1840 খ্রীস্টাব্দে। স্বাভাবিক কারণে মায়ের মৃত্যুর পর গালিবের এই আয়ের সূত্রটি ছিন্ন হয়েছিল। নবাব আহাম্মদ বক্স খানের দেহান্ত হয় 1827 খ্রীস্টাব্দে। তাঁর কাছ থেকে যা-কিছু সাহায্য পাওয়া যেত সেটাও এর পর বন্ধ হয়ে যায়। পেনসনের জন্য দীর্ঘস্থায়ী মকদ্দমায় তাঁর আর্থিক অবস্থার শুধু অবনতিই ঘটেনি, ঋণের অঙ্কও স্ফীত করে তুলেছিল। কাজেই গালিব এবং তাঁর বন্ধুদের পক্ষে তাঁর জন্য কিছু বাড়তি আয়ের পথ খোঁজা অতি আবশ্যক হয়ে উঠেছিল। এই বাড়তি আয়ের সাহায্যেই গালিবের দুর্দশা হ্রাস সম্ভবপর ছিল।

দিল্লী কলেজের ঘটনা

1840 খ্রীস্টাব্দে এই বাড়তি আয়ের একটা সুযোগ এসেছিল কিন্তু গালিব এই সুযোগ লাভ করতে পারেন নি। জেমস্ থমসন ছিলেন দিল্লী কলেজের একজন 'ভিজিটর' বা

পরিদর্শক। ইনি এই সময়ে কলেজ পরিদর্শনে এসে মন্তব্য করেন যে কলেজে ফার্সী শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা অসন্তোষজনক। তিনি এই পরামর্শ দেন যে ফার্সী শিক্ষাদানের ব্যবস্থার উন্নতি প্রয়োজন। তাঁকে কোন-এক ব্যক্তি জানিয়েছিলেন যে দিল্লীতে তিন জন এমন ব্যক্তি আছেন যাঁরা ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত। এই তিনজন হলেন গালিব, প্রসিদ্ধ উর্দু কবি মোমিন ও সুপরিচিত ফার্সী-পণ্ডিত ইমাম বক্স সহবাই— এই তিনজনের মধ্যে কোন-একজনকে উত্তম ফার্সী শিক্ষা দানের দায়িত্ব ন্যস্ত করা যেতে পারে। থাঁমসন ভারত-গভর্নমেণ্টের সেক্রেটারী রূপে গালিবকে আগে থেকেই জানতেন। সরকারী দরবারে গালিবের নিমন্ত্রণ হত কারণ তিনি আগে থেকেই 'কুর্সী-নসীন' অর্থাৎ দরবারে আসন-লাভ-যোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। এই কারণে গালিবের সঙ্গে তাঁর মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাৎও ঘটত। কাজেই থাঁমসন সর্বপ্রথম গালিবকেই আহ্বান জানান। থাঁমসনের আমন্ত্রণ পেয়ে গালিব প্রথামত পাল্কীতে চড়ে তাঁর বাড়ী যান। সেখানে পৌঁছে, তিনি বাড়ীর গেটে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন এই আশায় যে কেউ তাঁকে অভ্যর্থনা করে বাড়ীর ভেতরে নিয়ে যাবে। গভর্নর জেনারেলের দরবারে আমন্ত্রণ পান এমন ব্যক্তিদের এইভাবে অভ্যর্থনা করে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে যাওয়াই প্রথাসিদ্ধ। এটা ধরে নেওয়া যায় যে এর আগে গালিব যখনই থাঁমসনের সঙ্গে দেখা করার জন্য গিয়েছেন তখন তাঁকে এইভাবে অভ্যর্থনা

করে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এবার কিন্তু তা হ'ল না। গালিব বাড়ীর গেটের সামনে অপেক্ষা করতে লাগলেন কিন্তু কেউ তাঁকে অভ্যর্থনা-সহকারে ভেতরে নিয়ে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে এল না। কিছুক্ষণ পর থমসন নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জানতে চাইলেন গালিব কেন পাল্কী থেকে নেমে বাড়ীর মধ্যে আসছেন না। কারণটা কি? গালিব যখন তাঁর অসুবিধায় কথাটা জানালেন তখন থাঁমসন তাঁকে বললেন যে দরবারে আমন্ত্রিত ব্যক্তিরূপে তাঁকে যে সম্মান দেখানো হয় সেটা আনুষ্ঠানিক রূপে দরবারকালেই তাঁর প্রাপ্য। এখন তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন দিল্লী কলেজে একটা চাকুরী প্রাপ্তির উদ্দেশ্য নিয়ে। দরবারী ব্যক্তির প্রাপ্য সম্মান দরবার উপলক্ষ্যেই শুধু দেওয়া হয়ে থাকে। এই জবাবে গালিবের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার হ'ল। গালিব বললেন যে তিনি থাঁমসন সাহেবের কাছে দিল্লী কলেজের চাকুরীর জন্য এসেছিলেন এই আশায় যে এই চাকুরী দেশের লোকের এবং ব্রিটিশ সরকারের কাছে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করবে। এই চাকুরী নেওয়ার অর্থ যদি এই হয় যে, যে সম্মান তিনি পাচ্ছেন তা আর পাবেন না, তাহলে এই চাকুরী গ্রহণের চেয়ে বর্জনই তাঁর পক্ষে বাঞ্ছনীয়। এই কথাগুলি বলে গালিব তাঁর পাল্কীতে উঠে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। এই ঘটনাটি থেকে গালিবের মানসিক চরিত্র কী ধরনের ছিল তা স্পষ্টই বোঝা যায়। 1806 খ্রীস্টাব্দে যখন তাঁর জ্যেঠামশায়ের মৃত্যু হয় তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ন বছর। এই সময় থেকে

তিনি ব্রিটিশ সরকারের পেনসনভোগী ছিলেন। যখনই তিনি সরকারী দরবারে আমন্ত্রিত হয়ে যোগ দিয়েছেন তখনই তিনি দরবারের মুখ্য ব্যক্তির প্রশস্তিমূলক 'কসীদা' রচনাও আবৃত্তি করে এসেছেন। ফার্সীভাষার 'ওস্তাদ' এবং অদ্বিতীয় পণ্ডিত হিসাবে গালিবের মনে বেশ অভিমান ছিল। তাঁর নিজের আর্থিক অবস্থা মোটেই সুবিধাজনক ছিল না। এই অবস্থায় সাধারণ ভাবে যে কেউ একজন আশা করতে পারত যে গালিব এই সুযোগ হাতছাড়া করবেন না, কলেজের চাকুরীটি গ্রহণ করবেন। এতে শুধু তাঁর ব্রিটিশ পৃষ্ঠপোষকেরা খুশি হবেন তা নয়, তাঁরা তাঁকে ফার্সী ভাষায় একজন পণ্ডিত রূপেও প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন। সর্বোপরি ব্রিটিশের সহায়তায় তাঁর অর্থকৃচ্ছ্রতারও অবসান হবে। এতগুলি সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও গালিব ঔদ্ধত্য সহকারে এই চাকুরী প্রত্যাখ্যান করে এসেছিলেন ভবিষ্যতের ভাবনা এতটুকু চিন্তা না করে। এর কারণটা তুচ্ছই। কি-না থাঁমসনের বাড়ী যখন তিনি যান তখন তিনি তাঁকে অভ্যর্থনা সহকারে বাড়ীর ভেতরে নিয়ে যেতে এগিয়ে আসেন নি। এর থেকে বোঝা যায় যে গালিব কতখানি আত্মাভিমানী ছিলেন আর তাঁর আত্মমর্যাদাজ্ঞানই বা কত বেশী ছিল। সর্বাবস্থায় গালিব নিজের গর্ববোধ ও আত্মমর্যাদা রক্ষা করে চলতেন।

জুয়া খেলার জন্য জেল বাস

আত্মাভিমান ও অহংকার গালিবের থাকলেও তাতে তাঁর অর্থ-কষ্ট দূর হয় নি। এই সমস্যাটি তাঁর থেকেই গিয়েছিল।

অল্প বয়স থেকেই গালিব দাবা ও 'চৌসর' অল্প বাজি ধরে খেলতে অভ্যস্ত ছিলেন। মনে হয় এই অর্থ-সংকটের সময়ে একটু বেশী করেই তিনি এই জুয়া খেলায় নিজেকে লিপ্ত করেছিলেন। তাঁর এই খেলার সঙ্গী ছিলেন শহরের কিছু ধনী ব্যবসায়ী ব্যক্তি, এঁরা নিয়মিত ভাবে গালিবের বাড়ীতে এসে জুয়া খেলার জন্য মিলিত হতেন। এটা বেশ বোঝা যায়, যে এই জুয়া খেলায় গালিব জিতে কিছু অর্থ রোজগার করতেন। পুলিশ কর্তৃপক্ষের বেশ জানা ছিল যে জুয়া খেলার প্রকোপ শহরে বেড়েই চলেছে। সমাজ-দেহের ক্ষতের মতই এটা অনিষ্ট-কর ভেবে এঁরা এটা দূর করার চেষ্টায় ছিলেন। প্রায় প্রত্যেক দিনই একটা না একটা জুয়ার আডডায় হানা দিয়ে পুলিশ জুয়াড়ীদের ধরে ফেলত, তারপর তাদের সাজা দেওয়া হত। শহরের কোতোয়াল ছিলেন গালিবের ব্যক্তিগত এক বন্ধু, সাহিত্যেও এঁর অনুরাগ ছিল : গালিবকে ইনি বাঁচিয়ে দিতেন, পুলিশ তাঁর উপর হামলা করত না। এই ভদ্রলোক একসময় বদলী হয়ে গেলে তাঁর জায়গায় কোতোয়ালের পদে এলেন ফয়জুল হাসান খান নামে এক নূতন ব্যক্তি। সাহিত্যের প্রতি এঁর কোন আসক্তি ছিল না, সুতরাং গালিব তাঁর কাছে ছিলেন আর-পাঁচজনের মতই একজন। তা ছাড়া ইনি ছিলেন অত্যন্ত কর্তব্য-পরায়ণ, নিজের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব যে-কোন উপায়ে পালন করাই ছিল এঁর স্বভাব। শহর থেকে জুয়া খেলা একেবারে তুলে দিতে তিনি বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে একদিন তিনি সদলে গালিবের

বাড়ীতে হানা দিয়েছিলেন। কতকগুলি পাল্কীর মধ্যে সেপাইদের বসিয়ে চারিধারে পর্দা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। পাল্কীগুলি গালিবের বাড়ীর সামনে এসে থেমেছিল যেন কতকগুলি পর্দানশীন রমণী গালিবের বাড়ীর মেয়েদের কাছে বেড়াতে এসেছে। গালিব ও বন্ধুরা তখন জুয়াখেলায় মত্ত। পুলিশের সেপাইরা এইভাবে গালিবের বাড়ীতে ঢুকে তাদের হাতেনাতে ধরে ফেলে —সকলকে গ্রেপ্তার করেছিল। জুয়াড়ীরা অবশ্যই গ্রেপ্তার হওয়ার আগে বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল, তবে কোন ফল হয় নি। জুয়াড়ীদের মধ্যে যারা ছিল ধনী ব্যবসায়ী তারা ঘুষ অথবা ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে ছাড়া পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু গালিব ছাড়া পান নি, কারণ তাঁরই বাড়ী ছিল জুয়ার আডডা। আডডা-ধারী হিসাবে তাঁর গ্রেপ্তার বহাল থেকেছিল। যথাকালে ম্যাজি-স্ট্রেটের এজলাসে তাঁর বিচার হয়েছিল, আইন ভঙ্গ করে বাড়ীতে জুয়ার আডডা চালানোর অভিযোগে। তাঁর বন্ধুরা, এমন-কি স্বয়ং বাদশা তাঁকে বাঁচাবার চেষ্টা করেন কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নি। শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রতি ছ' মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও নগদ দুশো টাকা জরিমানার আদেশ দেওয়া হয়। দণ্ডাদেশটি এইরকম ছিল যে বাড়তি 50 টাকা জরিমানা দিলে সশ্রম কারাদণ্ডের বদলে ছ'মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ হবে, আর দুশো টাকা জরিমানা না দিলে ছ'মাসের বদলে একবছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। গালিবকে অবশ্য ছ'মাস কারাদণ্ড শেষ পর্যন্ত ভোগ করতে হয় নি, তিনমাস কাল দণ্ডভোগের পর দিল্লীর

সিভিল সার্জন ডঃ রসের সুপারিশে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

এই কারাদণ্ড গালিবের ব্যক্তিগত অভিমানে দারুণভাবে আঘাত হেনেছিল। জরিমানার টাকা দেওয়া হয়েছিল এইজন্য তাঁকে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হয় নি— এটা ছিল বিনা-শ্রমের কারাবাস। গালিবের সামাজিক ও সাহিত্যিক মর্যাদা সম্বন্ধে অবশ্য কারা-কর্তৃপক্ষ অবহিত ছিলেন, এইজন্য তাঁর প্রতি বেশ সদয় ব্যবহার দেখানো হয়েছিল। তাঁর প্রয়োজনীয় সব-কিছুই বাড়ী থেকে প্রেরিত হত, বন্ধুবান্ধবেরা ইচ্ছামত তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন— এ-বিষয়ে কোন বিধি-নিষেধ ছিল না। এই কারাবাসের কারণ ছিল একটি নৈতিক অপরাধ, জনসাধারণের চোখে তাঁর মর্যাদাহানির পক্ষে এটা ছিল যথেষ্ট, সুতরাং এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি গালিবের পক্ষে যৎপরোনাস্তি মনঃকষ্টের কারণ হয়েছিল। বৃহত্তর সমাজ এই ধরনের ব্যাপার ক্ষমার চোখে দেখে না। কী অপরাধে কারাদণ্ড হয়েছিল সেটা ভাল ভেবে বিচার না করেই সমাজ সাজা-পাওয়া অপরাধীকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে থাকে— এটাই হল রীতি। এর ফলে বহুদিন ধরে গালিবকে সমাজের এই ঘৃণা বা নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল। এটা গালিবের পক্ষে একসময় এত দুঃসহ হয়ে উঠেছিল যে তিনি দিল্লী ছেড়ে অন্য কোন স্থানে বাস করার কথা ভাবতে আরম্ভ করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন নতুন জায়গায় গিয়ে তাঁর অতীত এই অধ্যায়ের জন্য তাঁকে লোকের ঘৃণা বা বিদ্রূপ সহ্য করতে হবে না।

এই ঘটনায় গালিবের সম্মান-হানি হলেও এতে সাহিত্যের দিক থেকে অবশ্য বেশ কিছু লাভ হয়েছিল। কারাবাস কালে গালিব ফার্সীতে দীর্ঘ একটি কবিতা রচনা করেছিলেন, এতে তাঁর মানসিক চিন্তা ও অনুভূতি প্রতিফলিত হয়েছিল। এই কবিতার মধ্যে এই দুর্ঘটনায় তাঁর অন্তরের ক্রন্দন ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। যে অশুভ নিয়তি ও যে হৃদয়হীন সমাজ তাঁর মহত্ত্বের কথা গ্রাহ্য না করে শহরের চোর-বদমায়েশদের সঙ্গে একত্রবাসের যন্ত্রণার মধ্যে তাঁকে নিক্ষেপ করেছে তাদের প্রতি তিনি এই কবিতায় অভিশাপ দিয়েছিলেন। তাঁর এই বিপদের দিনে যে-সব বন্ধুরা তাঁর সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছিলেন তাদের তিনি এই কবিতায় বিশেষভাবে প্রশংসা করেন। এই বন্ধুদের মধ্যে সর্বাধিক বিশিষ্ট ছিলেন নবাব মুস্তাফা খান শাইক্তা। এই উচ্চবংশসম্ভূত ব্যক্তি গালিবের একজন অন্তরঙ্গ সুহৃৎ ছিলেন। শাইক্তা ছিলেন উর্দু ও ফার্সী ভাষার একজন কবি। ফার্সী কাব্য চর্চায় ইনি গালিবের পরামর্শ নিতেন। শাইক্তা ফার্সী ভাষায় পাণ্ডিত্যের জন্য গালিবকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। গালিবের বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বত্তারও ইনি পরম অনুরাগী ছিলেন। গালিবের গ্রেপ্তারের সংবাদ পাওয়া মাত্র ইনি গালিবকে মুক্ত করার জন্য নিজের প্রভাব প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে সফল হন নি। গালিবকে শেষ পর্যন্ত অভিযুক্ত ও দণ্ডিত করা হয়েছিল। শাইক্তা মামলা লড়বার জন্য গালিবকে অর্থ সাহায্যও করেন। গালিব যতদিন জেলে ছিলেন, একদিন

পর পর নিয়মিত ভাবে তিনি জেলে গিয়ে গালিবের সঙ্গে শুধু দেখাই করে আসতেন না, গালিবের কারাবাসের যন্ত্রণা লাঘবের জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব ততক্ষণ জেলে গালিবকে সঙ্গদান করতেন। উল্লিখিত কবিতায় গালিব তাঁর প্রতি এই বন্ধুর অবিচল প্রীতি ও আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশের জন্য গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

দরবারী ইতিহাসকার

কারামুক্তির পর গালিব কিছুকাল মৌলানা নাসিরুদ্দীন ওরফে মিঞা কালে সাহেবের বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে বাস করেন। ইনি ছিলেন বাদশাহ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের ধার্মিক ও আধ্যাত্মিক গুরু। গালিবের আর্থিক দুরবস্থার কথা তাঁর কোন বন্ধুরই অবিদিত ছিল না। এই সংকট উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য গালিবের কিছু নিশ্চিত আয়ের ব্যবস্থা খুবই জরুরী হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের মন্ত্রী ও চিকিৎসক আহ্ শানুল্লা খাঁ খুবই সাহিত্যানুরাগী ছিলেন, ইনি গালিবেরও ছিলেন একজন অন্তরঙ্গ সুহৃদ। ইনি এবং মৌলানা নাসিরুদ্দীন দুজনে মিলে স্থির করেন যে বাদশার নিকট এঁরা গালিবের কথা জানিয়ে তাঁর জন্য একটা ব্যবস্থা করবেন। এঁদের সুপারিশে 1850 খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসের প্রথমে বাদশা গালিবকে তৈমুর রাজবংশের ইতিহাস ফার্সী ভাষায় রচনার ভার দিয়ে তাঁর জন্য বার্ষিক ছয়শো টাকা পারিশ্রমিক মঞ্জুর করেন। এ ছাড়াও তাঁকে সম্মানসূচক

দরবারী পোষাক ও নজ্‌মুদ্দৌল্লা, দবীর-উল্‌-মুলুক নিজাম জঙ্গ্‌ খেতাবও দেওয়া হয়েছিল। এইভাবে গালিব স্থায়ী বেতনে মুঘল দরবারের একজন কর্মচারী হয়ে পড়লেন, তাঁর একটা নির্দিস্ট দায়িত্বও থাকল। এইসঙ্গে আহ্‌শানুল্লা খাঁকে এমন ঐতিহাসিক তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহ করে গালিবকে দিতে আদেশ দেওয়া হয়েছিল যেগুলির উপর ভিত্তি করে গালিব ফার্সীতে তাঁর ইতিহাস রচনা করতে পারেন। ইতিহাস রচনার এই কাজটি 1857 খ্রীস্টাব্দে 'সিপাহী বিদ্রোহ' নামে পরিচিত রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটার সময় পর্যন্ত চলেছিল। গালিবের ইচ্ছা ছিল যে এই ইতিহাস তিনি দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ করবেন। এর প্রথম খণ্ডে থাকবে তৈমুর থেকে হুমায়ুঁ পর্যন্ত, এবং দ্বিতীয় খণ্ডে থাকবে আকবর থেকে দ্বিতীয় বাহাদুর শার রাজত্বকালের বিবরণ। আহ্‌শানুল্লা খাঁর উপর এই দায়িত্ব ছিল যে ইনি বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহ করে সেগুলি ফার্সীতে অনুবাদের জন্য গালিবকে জুগিয়ে যাবেন। কিন্তু ইনি এই কাজ নিয়মিত ভাবে করে যেতে পারেন নি কারণ এঁর হাতে আরো অনেক কাজ ছিল। এর ফলে প্রস্তাবিত ইতিহাসের প্রথমখণ্ডের কাজ বেশ কয়েক বছর ধীরে ধীরে চলার পর কোনরকমে সম্পন্ন হয়েছিল। মনে হয়, দ্বিতীয় খণ্ড রচনার উপাদান আদৌ গালিবের হাতে এসে পৌঁছায়নি। এই কাজের অগ্রগতিতে কারো কোন ঔৎসুক্য নেই দেখে, গালিবও নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি আর উপকরণ সংগ্রহের জন্য আহ্‌শানুল্লা

খাঁকে তাগাদা দিতেন না। এর ফলে প্রস্তাবিত দ্বিতীয় খণ্ডটি লেখা হয়ে ওঠে নি। এই ইতিহাসের প্রথম খণ্ডটি লালকেল্লার শাহী ছাপাখানা থেকে 1854 খ্রীস্টাব্দে 'মিহরেনীম রুজ্' নামে প্রকাশিত হয়।

এর পর গালিবের জীবনের কিছু কাল মোটামুটি সুখ ও সমৃদ্ধির মধ্যেই অতিবাহিত হয়েছিল। বাদশাহের সাহিত্য-সংক্রান্ত ব্যাপারের পরামর্শদাতা মুহম্মদ ইব্রাহিম জৌক 1854 খ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন করেন। বাদশাহ্ এর পর থেকে গালিবকেই তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। বাদশাহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী মির্জা ফখরুদ্দীনও সাহিত্য-ব্যাপারে গালিবের শরণাপন্ন হতেন। মির্জা ফখরুদ্দীন এই সেবার জন্য গালিবকে বার্ষিক 500 টাকা পারিশ্রমিকের ব্যবস্থাও করেন। এ ছাড়াও অব্ধের শেষ শাসক ওয়াজিদআলি শা কিছু বার্ষিক বৃত্তি দিয়ে গালিবের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। স্পষ্টই বোঝা যায় একই সঙ্গে এতগুলি বার্ষিক ভাতার দৌলতে এই সময় গালিব স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে অপেক্ষাকৃত আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেই দিন কাটাতে পেরেছিলেন।

বিপ্লব

দুর্ভাগ্যবশতঃ এই স্বাচ্ছন্দ্যের দিনগুলি দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। 1857 খ্রীস্টাব্দের মে মাসে ভারতীয় ইতিহাসের সেই ঘটনাটি ঘটেছিল, ব্রিটিশের ভাষায় যাকে বলা হয় 'সিপাহী বিদ্রোহ'।

ভারতের মানুষ এই ঘটনাটি 'প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ' নামে অভিহিত করে থাকেন। এই ঘটনায় ভারতের রঙ্গমঞ্চ থেকে তৈমুর রাজবংশের নাম অপসৃত হয়ে যায় এবং ভারত-ভূমি বিদেশী শক্তির পদানত হয়। গালিব এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সংকট এড়াতে পারে নি। এই বিপ্লবের মূল কারণ হ'ল ইংরাজের রাজনৈতিক দমন-নীতি ও অত্যাচার। এই কাণ্ড চলেছিল দীর্ঘদিন ধরে যখন থেকে মূলতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য বৃত্তি ছেড়ে ইংরেজেরা দেশ-শাসন শুরু করেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের লোকের সঙ্গে ইংরাজেরা বণিক্-রূপে এদেশে এসেছিল। এই উদ্দেশ্যে একটি রাজকীয় সনদের বলে ইংলণ্ডে 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি' নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়েছিল। প্রথমে দিল্লী ও পরে আগ্রায় যতদিন কেন্দ্রীয় মুঘল শাসন শক্তিশালী ও সক্রিয় ছিল ততদিন পর্যন্ত এই কোম্পানি অধ্যবসায়ের সঙ্গে বাণিজ্য বৃত্তিতে নিযুক্ত ছিল। 1707 খ্রীস্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরই দিল্লীর সরকারের প্রভাব দেশের দূরপ্রান্তস্থিত স্থানগুলির উপর শিথিল হয়ে পড়ায় সমগ্র দেশে অস্থিরতা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। এই অস্থির রাজ-নৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের দুটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনার সন্ধান পেয়ে এই দেশে নিজেদের শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধির চেষ্টা করেছিল। এই উদ্দেশ্যে এদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে এরা সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ শুরু করে। এরা নিজেদের কুঠী-শহরগুলি সুরক্ষিত

ক'রে নিয়ে, বেতনভুক সৈন্যবাহিনী রাখতে আরম্ভ করেছিল। উচ্চাভিলাষী স্থানীয় শাসকদের ক্ষমতার লড়াইয়ে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের দুটি বণিক্ সংস্থা নিজেদের পছন্দমত শাসকদের পক্ষ নিয়ে লড়াই করতে নামত। নিজেদের মনোনীত ব্যক্তির জয়লাভ হলে— এ'দের একপক্ষের নিজেদেরও শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধি হত। শেষ পর্যন্ত বোঝা গিয়েছিল যে এই লড়াইয়ের শেষ পরিণাম হবে ইংল্যাণ্ড অন্যথা ফ্রান্সের এদেশে প্রভাব ও শক্তি বৃদ্ধি।

দেশে বহুদিন ধরে শান্তি ও সমৃদ্ধির স্রোত প্রবাহিত থাকায় দেশের শাসন ও সামাজিক ব্যবস্থার বেশ অবনতি ঘটেছিল। অঙ্গরাজ্যগুলি তাসের প্রাসাদের মত ভেঙে পড়ছে, তার জায়গায় রাতারাতি নূতন নূতন রাজ্য গজিয়ে উঠছে— এই অবস্থাটা স্বভাবতই যে-কোন ভাগ্যান্বেষীর পক্ষে অনুকূল। অনেক বছর ধরে ব্রিটিশ ও ফ্রান্স এ'দেশে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আসছিল। এই দ্বন্দ্বে ব্রিটিশের ভাগ্যেই জয়লাভ ঘটেছিল, ভারতের বিস্তৃত ভূখণ্ডে এদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফরাসীরা ধীরে ধীরে তাদের অধিকার হারিয়ে শেষ পর্যন্ত হঠে যেতে বাধ্য হয়, এদের শত্রু ব্রিটিশই শেষ পর্যন্ত টিকে যায়। নিজের শক্তিতেই হোক অথবা বশম্বদদের সাহায্যেই হোক ব্রিটিশ শক্তি ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এখন তারা অধ্যবসায় সহকারে সমগ্র দেশ তাদের কুক্ষিগত করার চেষ্টা চালিয়ে ছিল। এর ফলে যে-সব ভারতীয় শাসক বা রাজাকে তারা অধিকারচ্যুত করেছিল তাঁরা হয়ে

উঠেছিলেন খুবই বিক্ষুব্ধ। এঁরা এই নূতন প্রভুদের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। একটা সুসম্বদ্ধ প্রতিরোধের সুযোগ না থাকায় এই বিদ্বেষের আগুন শুধু ধিকি ধিকি ভাবে জ্বলতে থাকত, বাইরে থেকে এটা প্রকাশ পেত না। একটা উপযুক্ত ক্ষণে শুধু ছিল বিস্ফোরণের অপেক্ষা। এই উপযুক্ত ক্ষণটি কিন্তু এসে পড়েছিল। উপলক্ষ্যটা ছিল এই: দৈবক্রমে ব্রিটিশের সামরিক কর্তৃপক্ষ সৈন্যবাহিনীর ব্যবহারের জন্য একটি নূতন ধরনের বন্দুকের কার্টিজ বা 'গুলি' প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। গুলি ছোঁড়ার আগে এই কার্টিজের নিম্নাংশ দাঁত দিয়ে কেটে নিতে হত। এমনি একটা গুজব রটে গেল যে হিন্দু ও মুসলমান সৈনিকদের ধর্ম নষ্ট করার জন্যই এটি প্রবর্তন করা হচ্ছে, এই কার্টিজ গোরু ও শূকরের চর্বি দিয়ে তৈরি।

ব্রিটিশের ভারত-আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের নীতি ছিল হিন্দু ও মুসলমান ভারতীয়দের মধ্যে খ্রীস্ট-ধর্ম প্রচার। ব্রিটিশের এই চেষ্টার পরিচয় ইতিপূর্বেই পাওয়া গিয়েছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনদের মেয়াদ 1833 খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডের গভর্নমেন্ট যখন বাড়িয়ে দেন তার একটি যুক্তি এই ছিল যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দ্বারা ভারতে খ্রীস্টধর্ম প্রচারের সহায়তা হবে। ভারতের ব্রিটিশ সরকার দেশের নানাস্থানে যে-সব স্কুল-কলেজ স্থাপন করেন খ্রীস্টধর্মের বিষয়গুলি যেখানে আবশ্যিক পাঠ্য ছিল। দিল্লী শহরেই পুরাতন দিল্লী কলেজের কতকগুলি ছাত্র প্রকাশ্যেই খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন, এঁদের মধ্যে রামচন্দ্র ও

ডাঃ চমনলালের নাম উল্লেখযোগ্য। জনসাধারণ আগে থেকেই ইংরাজ মিশনরীদের উদ্দেশ্য ও কাজকর্ম সন্দেহের চোখে দেখত। এই ঘটনার পর দেশীয়দের মধ্যে কারো মনে এ-বিষয়ে আর কোন সন্দেহ ছিল না যে পাশ্চাত্যদেশীয় শাসকদের আসল উদ্দেশ্য হ'ল তাদের তরুণ সমাজকে বিপথগামী করে তাদের স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত করা। এই সন্দেহ বাতিকের বাতাবরণে কার্টিজ সংক্রান্ত রটনাটি যেন একটি উত্তেজক ভেষজের রূপ নিয়ে এটিকে বাড়িয়ে তুলেছিল। স্বভাবতই রটনাটি সত্য বলেই গৃহীত হয়েছিল। এই রটনা সৈন্যবাহিনীর মনে দাবানলের মত রোষ ও অসন্তোষ ছড়িয়ে দিয়েছিল। প্রথম বিস্ফোরণ ঘটেছিল সৈন্যবাহিনীর কুচকাওয়াজের সময় 1857 খ্রীস্টাব্দের 10ই মে মীরাটে। এই সময় স্থানীয় পদাতিক বাহিনী ব্রিটিশ সেনানায়কের আদেশ পালনে অস্বীকৃত হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। এই বাহিনী 'অফিসর'দের হত্যাও করেছিল। কিছু সৈন্য এর আগে অবাধ্যতার জন্য যে কারাগারে আবদ্ধ ছিল, তার দরজা ভেঙে তাদের মুক্ত করে দেওয়া হয়। এই দিনই সন্ধ্যাকালে কিছু-সংখ্যক সৈন্য দিল্লীর দিকে রওনা হয়ে যায়। পরদিন 11ই মে প্রাতঃকালে এরা দিল্লী পৌঁচেছিল। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর নায়কত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করে নিজেকে ভারত সম্রাট রূপে ঘোষণা করার জন্য এই সিপাহীরা বাহাদুর শাহকে অনুরোধ জানিয়েছিল। বাহাদুর শাহের বয়স তখন 82 বৎসর। ইনি সিপাহীদের এই অনুরোধ রক্ষা করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু পরিস্থিতি

এমন একটা অবস্থায় পৌঁচেছিল যে তাঁকে শেষ পর্যন্ত এই অনুরোধ রক্ষা করতে হয়েছিল। ইতিমধ্যে এই বিদ্রোহ অন্যান্য শহরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। বিদ্রোহের যাঁরা নায়ক ছিলেন তাঁরা ক্রমে ক্রমে এসে দিল্লীতে সমবেত হয়ে একটা অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা করলেন— এর শীর্ষে নামে মাত্র রাখা হল বাহাদুর শাহ্ কে। দিল্লীস্থিত সব ব্রিটিশ সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তি হয় নিহত হয়েছিল নতুবা তাদের প্রাণভয়ে শহর ছেড়ে পালিয়ে যেখানে সেখানে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। পাঁচ মাসের অধিককাল দিল্লী শহরটি ভারতীয় ফৌজের অধিকারভুক্ত ছিল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই বিপদে দিশেহারা হয়ে পড়ে নি। ভাগ্যের প্রসাদে এবং দৃঢ়তার সাহায্যে ব্রিটিশ নানাস্থানে এই বিদ্রোহ দমন করে ফেলেছিল। শেষ পর্যন্ত তারা দিল্লীর যুদ্ধেও জয়লাভ করেছিল। 1857 খ্রীস্টাব্দের 19শে সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ দিল্লী পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিল।

এই ঘটনার পর দীর্ঘকাল ধরে চলেছিল প্রতিশোধমূলক দমন-নীতির পালা। হাজার হাজার নাগরিককে নামমাত্র বিচারের পর ফাঁসি দেওয়া হয়। এদের বিষয়-সম্পত্তি ধন-দৌলতও বাজেয়াপ্ত করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ফাঁসির বিনিময়ে অভিযুক্তদের কাছ থেকে অসম্ভব রকম ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়েছিল। বহু সংখ্যক ব্যক্তি শহর ছেড়ে পালিয়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। এই-সব অপরিচিত স্থানে

পলাতকেরা দীর্ঘকাল ধরে কঠোর দারিদ্র্য ও কষ্টের সঙ্গে আত্ম-গোপন করে থাকতে বাধ্য হয়েছিল। অবস্থার উন্নতি হওয়ার পর এরা নিজের নিজের বাড়ীতে ফিরতে পেরেছিল।

এই বিপ্লবের কালে গালিব দিল্লীতেই ছিলেন, শহর ছেড়ে তিনি কোথাও যান নি। আসল কথা এই ছিল যে তাঁর যাবার মত অন্যত্র কোথাও আশ্রয়ও ছিল না। এই সময়টি তাঁর খুব কষ্টেই কেটেছিল। অনেকদিন ধরে তাঁর আয়ের সূত্র দাঁড়িয়েছিল মাত্র দুটি। একটি ছিল ব্রিটিশের খাজানা থেকে বার্ষিক 750 টাকা, দ্বিতীয়টি ছিল মুঘল রাজবংশের ইতিহাস-লেখকরূপে বাহাদুর শাহের কাছ থেকে বাষিক পাওনা 600 টাকা। বিদ্রোহীরা দিল্লীতে পৌঁছানো মাত্র শহরে ব্রিটিশ শক্তি বা শাসন ভেঙে পড়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের কোন ঘাঁটি নেই কাজেই গালিবেরও পেনসন প্রাপ্তি সম্ভব হয় নি। বাহাদুর শার নিজস্ব ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কোন দামই এসময়ে ছিল না, তিনি হয়ে পড়েছিলেন সম্পূর্ণভাবে অন্যদের হাতের খেলার পুতুল, তা ছাড়া তাঁরও ছিল অর্থাভাব, গালিব বা অন্য কারো পাওনা মেটানোর সামর্থ্য তাঁর এখন ছিল না। দুটি মাত্র আয়ের পথ, তাও যখন বন্ধ তখন স্বাভাবিক কারণেই খুব কষ্টের মধ্যেই গালিবকে এই সময়ে দিনাতিপাত করতে হয়েছিল।

এই বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত সাফল্য লাভ করে নি কারণ এর পেছনে পর্যাপ্ত আয়োজন বা পরিকল্পনা ছিল না। এই বিদ্রোহের যাঁরা নায়ক ছিলেন তাঁদের সামনে কোন নিশ্চিত বা সুচিন্তিত

কার্যক্রম ছিল না। এক-একটি শহরে ছিল এক-একটি স্থানীয় নেতা, এদের পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ বা সহযোগিতা ছিল না। অপর দিকে, ব্রিটিশের ছিল একটি সুগঠিত ও সুসম্বদ্ধ সেনাবাহিনী এবং একটি নির্দিষ্ট মূল উদ্দেশ্য। এমন-কি, ভারতের জনসাধারণও ইংরাজ শক্তির উচ্ছেদের ব্যাপারে একতা-বদ্ধ হতে পারে নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে সমগ্র পাঞ্জাব প্রদেশ পরিপূর্ণভাবে ছিল এই সংগ্রামে ব্রিটিশের সমর্থক। দিল্লীতে ও পরে লক্ষ্ণৌয়ে যে ব্রিটিশ বাহিনী বিদ্রোহীদের পর্যুদস্ত করেছিল তার সৈন্যেরা ছিল বিভিন্ন শিখ-রাজ্যের প্রজা, অর্থাৎ শিখ সৈন্যদের সাহায্যে সিপাহী বিদ্রোহ দমন করা হয়েছিল। নেপালের রাজাও ব্রিটিশের সাহায্যের জন্য সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। ভারতীয় বিদ্রোহী সৈন্যেরা অধিকাংশই ছিল যুদ্ধবিদ্যায় অপটু তাদের মধ্যে সজ্ঘ-বদ্ধতারও অভাব ছিল। কাজেই বিদ্রোহীদের এক-একটা শক্ত ঘাঁটি ব্রিটিশের প্রতি-আক্রমণের ধাক্কা সামলাতে পারে নি। ফলে বিদ্রোহের বছরটি শেষ হওয়ার পর দেখা গেল যে বিদ্রোহের ফলে ব্রিটিশশক্তি দুর্বল হয়ে যাওয়া দূরের কথা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

দিল্লী ব্রিটিশের অধিকারে ফিরে আসার পর দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছিল। গালিব ভেবেছিলেন যে তাঁরও পূর্বের অবস্থা ফিরে আসবে এবং তাঁর পারিবারিক পেনসনের টাকা

আগের মতই ব্রিটিশের কোষাগার থেকে পাওয়া যাবে। কিন্তু হায়, গালিবের এই আশায় ছাই পড়েছিল।

গালিব বেশ দূরদর্শী ছিলেন, তাঁর সাংসারিক বুদ্ধিও প্রখর ছিল। দিল্লীতে গোলমাল যখন সুরু হল, তখন কেউ-ই বুঝতে পারে নি হাওয়া বইবে কোন্ দিকে। গালিব ব্রিটিশ-বিরোধী কাজকর্ম থেকে নিজেকে যথাসম্ভব নির্লিপ্ত রেখেছিলেন। লাল-কেল্লা বা বাহাদুর শাহের দরবার ছিল ব্রিটিশ-বিরোধী কাজ-কর্মের কেন্দ্র। গালিবের পক্ষে এই দরবারের সংস্রব সম্পূর্ণ রূপে এড়িয়ে চলা অবশ্য সম্ভব হয় নি। 1854 খ্রীস্টাব্দে বাদশাহের সাহিত্য-বিষয়ক পরামর্শদাতা মোহাম্মদ ইব্রাহিম জৌকের মৃত্যু হয়েছিল। এর পর গালিব তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। তিনি আগে থেকেই দিল্লী দরবারের সরকারী ইতিহাস-লেখক ছিলেন, তার উপর তিনি এখন বাদশাহের সাহিত্য-বিষয়ক পরামর্শদাতা হওয়ায় প্রায় নিয়মিতভাবেই তাঁকে বাদশাহের কাছে যাওয়া-আসা করতে হত। এই সময়ে দিল্লীতে এমন কোন ইংরাজ রাজকর্মচারী ছিলেন না যাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে ইংরাজের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হতে পারত। এই অবস্থায় গালিব ভেবেছিলেন শাহী দরবারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেও প্রকাশ্যে কোন পক্ষে যোগ না দেওয়াটাই হবে বুদ্ধিমত্তার কাজ। এই সতর্কতা সত্ত্বেও ভাগ্য তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয় নি। তাঁর বিপদ ঘটেছিল।

'সিক্কা' অভিযোগ

ভারতীয় সৈন্য কর্তৃক দিল্লী অধিকৃত হওয়ার পরও ইংরাজেরা দিল্লী শহরে ও লাল কেল্লার ভেতরে কী ঘটছে তা জানার জন্য একটি বেশ সক্রিয় গুপ্তচর-চক্রের ব্যবস্থা রেখেছিল। এই গুপ্তচর-চক্র বিশ্বাস্য অবিশ্বাস্য সব রকম সংবাদ সংগ্রহ করে তা ব্রিটিশ বাহিনীর সেনাধ্যক্ষকে পাঠিয়ে দিত। এই সেনাধ্যক্ষের আস্তানা ছিল কাশ্মীরী জোটের বাইরে উচ্চ ভূমির উপর। একদিন এক গুপ্তচর মারফৎ এখানে সংবাদ এল যে বাহাদুর শাহ্-আমন্ত্রিত একটি দরবারে গালিবও উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি একটি 'সিক্কা' রচনা করে বাদশাহ্কে উপহার দেন। বাহাদুর শাহ্ যে নূতন মুদ্রা প্রবর্তন করতে চলেছেন তার উপর উৎকীর্ণ হওয়ার জন্যই এই সিক্কাটি রচিত হয়েছে। আসলে ঘটনাটি ছিল বিকৃত। যে 'সিক্কা'টি গালিব-রচিত বলে রটনা হয়েছিল সেটি গালিব লেখেন নি। ঐটি একজন অল্প-খ্যাত কবির রচনা, উল্লিখিত শাহী দরবারে বাদশাহের সামনে পঠিত হওয়ার আগেই একটি কাগজে এটি প্রকাশিত হয়। বিকৃত বা অসত্য হলেও এই খবরটি ইংরাজের দপ্তরে নথিভুক্ত থেকে গিয়েছিল। দিল্লী ইংরাজ-কর্তৃক পুনরধিকৃত হওয়ার পর গালিব যখন দিল্লীর ইংরাজ চীফ্ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে যান তখন তাঁকে এই অভিযোগের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বিদ্রোহ চলা কালে গালিব ব্রিটিশ-বিরোধী কোন কাজে সক্রিয়

ভাবে জড়িত ছিলেন না, এইজন্য দিল্লী পুনরধিকৃত হওয়ার পর গালিবের জীবন বা সম্পত্তির নিরাপত্তা বজায় ছিল। 'সিক্কা'র ব্যাপারটাকেও ইংরাজেরা একটা কবি-সুলভ দুর্বলতা বলেই গ্রহণ করেছিলেন। বিদ্রোহ দমনের কালে শুধু মাত্র সন্দেহ বলে বহু লোককেই ইংরাজেরা হত্যা বা কারারুদ্ধ করেছিল। এক্ষেত্রে গালিবের প্রতি ইংরাজেরা যে বিশেষ দয়া দেখিয়েছিলেন এটা খুবই সত্য। গালিবের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এসেছিল তার একমাত্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া এই হয়েছিল যে অতঃপর তাঁর ইংরাজদের কাছ থেকে প্রাপ্য পারিবারিক 'পেনসন' বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর-একটা ক্ষতি এই ছিল যে অতঃপর গভর্নর জেনারেল বা লেঃ গভর্নরের দরবারে তাঁর নিমন্ত্রণও বন্ধ হয়ে যায়। গালিব ভেবেছিলেন যে ইংরাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পূর্বের অবস্থা সর্বতোভাবেই ফিরে আসবে। পেনসন ও দরবারে নিমন্ত্রণ বন্ধ হয়ে যাওয়া ছিল তাঁর প্রত্যাশার অতীত, তাই এই ঘটনায় তিনি খুবই হতাশাপন্ন হয়ে পড়েন। তাঁর পূর্বাবস্থা ফিরে আসা দূরের কথা, বর্তমান অবস্থারও বেশ অবনতি ঘটেছিল। কিছু সংখ্যক বন্ধু ও গুণমুগ্ধ ব্যক্তি এই সময় তাঁর সাহায্যার্থে এগিয়ে না এলে তাঁর পক্ষে এই অবস্থাটা আরও দুঃসহ হয়ে উঠত। সৌভাগ্যক্রমে, রামপুরের নবাব ইউসুফ আলি খান তাঁকে এই দুরবস্থার কবল থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

রামপুরের সঙ্গে সম্পর্ক

1855 খ্রীস্টাব্দে রামপুরের নবাব মোহাম্মদ সঈদখানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইউসুফ আলি খান রামপুর নবারে 'গদি' পান। এই তরুণ যুবক সাহিত্য বিষয়ে বেশ পারদর্শী ছিলেন। অল্পবয়সে এঁর পিতা এঁকে শিক্ষালাভের জন্য দিল্লী পাঠিয়ে দেন। ছাত্রাবস্থায় যাঁদের কাছে ইনি ফার্সী শেখেন তাঁদের মধ্যে গালিব অন্যতম। নবাবপুত্রের রামপুরে ফেরার পর অবশ্য এই যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। 1855 খ্রীস্টাব্দে ইনি যখন নবাব হন তখন গালিব এই ছিন্ন সংযোগ পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে একটি কবিতা লিখে পাঠান। গালিবের এই চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নি, কারণ নবাব এতে কোন সাড়া দেন নি। গালিব এর পর এ-বিষয়ে নিজে থেকে আর কোন চেষ্টা করেন নি। 1857 খ্রীস্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহ ঘটার আগে থেকেই গালিবের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু রামপুরে থাকতেন। এঁর নাম ছিল মৌলবী ফজল হক। তরুণ নবাবের উপর তাঁর গভীর প্রভাব ছিল। ফজল হকের পরামর্শে গালিব একটি 'কসীদা' রচনা করে নবাবকে পাঠিয়ে দেন। ফজল হক আশা করেছিলেন যে এর দ্বারা গালিব ও তরুণ নবাবের মধ্যে ছিন্ন সংযোগ পুনঃ-স্থাপিত হবে, আর এর ফলে গালিবের পক্ষে নবাবের কাছ থেকে একটা স্থায়ী পেনসন অন্ততঃপক্ষে এককালীন মোটা রকমের সাহায্য পাওয়া সম্ভব হবে।

সৌভাগ্যক্রমে গালিবের এবার কপাল খুলেছিল। নবাব ইউসুফ আলী কসীদাটি পেয়ে শুধু খুশিই হন নি, উনি স্থির করলেন যে তিনি কাব্য রচনার ব্যাপারে গালিবের 'সাগ্রেদ' বা শিষ্যত্ব গ্রহণ করবেন। গালিব ও নবাবের মধ্যে এই নতুন সম্পর্ক গড়ে ওঠার কয়েক মাস পরই দেশের রাজনৈতিক আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল। এই দুর্যোগের মধ্যেও গালিব ও নবাবের মধ্যে নিয়মিত পত্রব্যবহার চলেছিল। এর আগে নবাবের কাছ থেকে মাঝে মাঝে গালিব কিছু কিছু আর্থিক সাহায্যও পেয়েছিলেন তবে বেতন হিসাবে নিয়মিত কোন টাকা তিনি পান নি, এটা নির্ধারিত হয় নি। দিল্লীতে ইংরাজের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গালিব যখন দেখলেন ইংরাজদের সঙ্গে তাঁর পূর্বের সম্পর্ক আর ফিরল না— পারিবারিক পেনসনও বন্ধ হয়ে গেল তখন তিনি নবাবকে অনুরোধ করলেন তাঁর জন্য একটি স্থায়ী বৃত্তির ব্যবস্থা করতে। নিত্য আর্থিক দুশ্চিন্তা থেকে তাঁর এই বৃত্তি তাঁকে মুক্তি দিতে পারে এ কথাও নবাবকে জানানো হয়েছিল। নবাব তাঁর এই আবেদন পেয়ে আদেশ দিয়েছিলেন যে অতঃপর তাঁকে রামপুর কোষাগার থেকে মাসিক এক শত টাকা বৃত্তি দেওয়া হবে।

দস্তম্বু

সিপাহী-বিদ্রোহের উত্তাল তরঙ্গময় দিনগুলি গালিবকে ঘরের মধ্যে বসে কাটাতে হয়েছিল। কর্মহীন এই দিনগুলি কাটানোর

জন্যই সম্ভবতঃ গালিব তাঁর চার পাশে দিল্লী শহরে যে-সব ঘটনা ঘটে চলেছে সেগুলি টিপ্পনী বা নোটের আকারে লিখে রাখার অভ্যাস গড়ে তুলেছিলেন। এগুলো যে ঠিক নিয়মিত দিনলিপির আকারে লিখিত হয়েছিল তা নয়, সংঘটিত বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলি এমনভাবে এতে লিপিবদ্ধ করে রাখা হত যেন ভবিষ্যতে এগুলি এই বিশেষ যুগের বিস্তৃত বিবরণ লেখার কাজে প্রয়োজনমত ব্যবহার করা যায়। ব্রিটিশশক্তি কর্তৃক দিল্লী বিজয়ের পর গালিব এই টিপ্পনীগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে ফার্সী ভাষায় 'দস্তম্বু' নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। গালিবের দাবি ছিল এই যে ব্যক্তি ও স্থান-নামের ক্ষেত্রে ছাড়া এই পুস্তকে তিনি কোন আরবী ভাষার শব্দ ব্যবহার করেন নি। তবে গালিবের এই দাবি সর্বাংশে যথার্থ ছিল না। গালিবের যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও এই রচনায় কিছু আরবী শব্দের অনুপ্রবেশ রুদ্ধ করা যায় নি। গালিব আরবী শব্দের ব্যবহার রোধ করতে গিয়ে বহু প্রচলিত ও পরিচিত আরবী শব্দের পরিবর্তে ফার্সী ভাষার এমন-কিছু শব্দ ব্যবহার করেন যা তৎকালে অপ্রচলিত ছিল। এই কারণে 'দস্তম্বু' পুস্তকটি মোটেই সুখপাঠ্য হয় নি, এতে দুর্বোধ্যতাও থেকে গিয়েছিল।

সমসাময়িক কালের ইতিবৃত্তমূলক পুস্তক হিসাবেও এটি নির্ভরযোগ্য হয় নি। আমরা এর আগে দেখেছি যে সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে গালিব বাহাদুর শাহের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছিলেন, কতকটা বাধ্য হয়ে তাঁকে এই সময়ে এমন সব

লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়েছে, যারা ছিল ব্রিটিশ-বিরোধী।

ব্রিটিশ-বিরোধী এমন কোন কাজে তিনি লিপ্ত হন নি, যাতে তাঁকে ব্রিটিশ-বিরোধী বলে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও গালিবের মনে শঙ্কা থেকে গিয়েছিল। তিনি বুঝেছিলেন যে তিনি ব্রিটিশ-বিরোধী কাজে লিপ্ত না থাকলেও ব্রিটিশেরা তাঁকে সুনজরে দেখবে না। অপর পক্ষে, বাদশাহের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্যের ব্যাপারটিকে সহজেই ব্রিটিশ-বিরোধিতা বলে ধরে নেওয়া হবে। কাজেই, 'দস্তম্বু' সংকলন কালে তিনি লক্ষ্য রেখেছিলেন যেন ভারতীয় সিপাহীদের দোষ-ত্রুটিগুলি কোন-মতেই ছোট করে না দেখা হয় আর ব্রিটিশের অত্যাচার-নিপীড়নের ঘটনাগুলি যেন প্রাধান্য না পায়। আগে থেকেই তিনি ভেবে রেখেছিলেন যে এই বই ছাপিয়ে এটি তিনি তাঁর পৃষ্ঠপোষক ও অনুরাগী ইংরাজ রাজকর্মচারীদের উপহার দেবেন। এদের অভিরুচির দিকে লক্ষ্য রেখে গালিব কিছু ঘটনার উল্লেখ এড়িয়ে যান, আবার কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকেও পূর্ণমাত্রায় রঙ চড়িয়ে উল্লেখ করেন। একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধি যে রচনার লক্ষ্য, তা কখনও ইতিহাস নামের যোগ্য নয়, তা থেকেও ইতিহাসের উপাদান কোনমতেই আহরণযোগ্য নয়।

গালিব চেয়েছিলেন এই বইটি ব্রিটিশের কাছে তাঁকে নূতন-ভাবে গ্রহণ-যোগ্য করে তুলবে। তিনি এই বইয়ের মাধ্যমে ইংরাজদের বোঝাতে চেয়েছিলেন যে ইংরাজের দুঃসময়েও তিনি

তাঁদের বন্ধুর কাজ করেছিলেন। বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর গালিব এর কপি ভারতে অবস্থিত বহু বিশিষ্ট ইংরাজ রাজ-কর্মচারীদের উপহার স্বরূপ পাঠান। ইংলণ্ডের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছেও এই বই উপহার স্বরূপ প্রেরিত হয়েছিল। তবুও এই বই কোন ইংরাজের মনে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। গালিব যে উদ্দেশ্যে বইটি রচনা করেন ও ইংরাজদের উপহার দেন তা ব্যর্থ হয়েছিল। এই বইয়ে ব্যর্থতার অন্যতম কারণ ছিল এর ভাষা, এটি বেশ সুবোধ্য মোটেই ছিল না। ইংরাজদের সঙ্গে একটা হৃদ্য-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য গালিবের এই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা সুতরাং সাফল্য লাভ করতে পারে নি। ইতিমধ্যে, গালিবের বহু বন্ধু চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন যাতে ইংরেজ কতৃপক্ষ তাঁকে ক্ষমার চক্ষে দেখতে পারেন। এঁদের সাফল্য লাভের সম্ভাবনা খুবই অল্প ছিল। গালিব যে ইংরাজের বিরুদ্ধে কোন কাজ করেন নি এটা ইংরাজকে দিয়ে স্বীকার করানো খুবই কঠিন ছিল। কিন্তু এটা শুধু সম্ভব হয়েছিল রামপুরের নবাবের হস্তক্ষেপে। শেষ পর্যন্ত 1860 খ্রীস্টাব্দের মে মাসে ইংরাজ সরকার তাঁদের পূর্বতন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে গালিবের পারিবারিক পেনসন পুনরায় বহাল করেন। তিন বৎসর পর 1863 খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে, গালিবকে আবার দরবারে যোগদানের অধিকার দেওয়া হয়। এইভাবে 1857 খ্রীস্টাব্দের মে মাসের পূর্বে গালিব যে-সব সুযোগ-সুবিধা ইংরাজ-সরকারের কাছ থেকে পেতেন সেগুলি পুনঃপ্রবর্তিত হয়।

কাতি'বুরহন

গালিব মূলতঃ ছিলেন কবি ও লেখক। আর্থিক দুরবস্থা ও সাংসারিক অশান্তি সত্ত্বেও দীর্ঘকাল সাহিত্যচর্চা থেকে বিরত থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। সিপাহী-বিদ্রোহ চলার কালে তাঁকে মাঝে মাঝে লাল কেল্লায় যেতে হলেও অধিকাংশ সময়েই তিনি একা একাই বাড়িতে বসে থাকতেন। আজীবন গালিব ছিলেন একজন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান পাঠক। গালিবের স্মৃতিশক্তিও ছিল অসাধারণ। সিপাহী-বিদ্রোহের দিনগুলিতেও বইই ছিল তাঁর প্রধান সঙ্গী। এই বইগুলির মধ্যে একটি ছিল 'বুরহন-এ-কাতি', এটি ফার্সী ভাষায় একটি বিখ্যাত শব্দ-কোষ। অবসর সময়ে গালিব এই বইটি উল্টেপাল্টে পড়তে অভ্যস্ত ছিলেন। এই বিখ্যাত অভিধানটির সংকলক ছিলেন মুহম্মদ হুসেন তব্রীজী নামে এক ব্যক্তি। কলকাতা থেকে এর একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। এই বইটি উল্টেপাল্টে দেখতে দেখতে গালিবের চোখে এর বহু দোষত্রুটি ধরা পড়েছিল। গালিব তাঁর কাছে এই অভিধানের যে 'কপি'টি ছিল তার মার্জিনে এই দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য লিখে রাখতেন। দেখতে দেখতে এই মন্তব্যগুলি সংখ্যায় বেশ স্ফীত হয়ে পড়েছিল। দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার পর গালিব তাঁর এই মন্তব্য বা 'নোট'গুলি আলাদাভাবে নকল করিয়ে নিয়েছিলেন। বন্ধু এবং ছাত্রেরা এর থেকে উপকৃত হবে, তাদের এগুলি কাজে লাগবে গালিবের মনে এই ধারণা জন্মেছিল। প্রথম প্রথম এগুলি পুস্তকাকারে

প্রকাশ করার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। শেষকালে, তাঁর কোন কোন বন্ধু তাঁকে এই বইটি ছাপাবার পরামর্শ দেন। এঁদের যুক্তি ছিল যে এই বইটি প্রকাশিত হলে সাধারণ পাঠকের বেশ কাজে লাগবে এবং ফার্সী-পণ্ডিত হিসেবে গালিবের খ্যাতিও প্রতিষ্ঠিত হবে। গালিব ভারতীয় ফার্সী-লেখকদের কঠোর সমালোচক ছিলেন, তাঁর মত ছিল এই যে ফার্সী ভাষার বিষয়ে এঁদের রচনা বা জ্ঞান মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। 'বুরহান-এ-কাতি' গ্রন্থের সংকলনকর্তা ভারতেই জন্মেছিলেন ও এদেশেই তাঁর শিক্ষা-লাভ হয়েছিল, তবে এঁর পূর্বপুরুষেরা ইরাণ-বাসী ছিলেন। ভারতীয়েরা ফার্সী ভাষায় সুদক্ষ নয়— গালিবের এই মতটি প্রতিষ্ঠিত করার জন্যও তাঁর বইটি ছাপানো প্রয়োজন, গালিবের বন্ধুরা তাঁকে এইভাবে ব্যাপারটা বুঝিয়েছিলেন। গালিবের এই বইটি 'কাতি'বুরহন'— এই নামে 1862 খ্রীস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এই বইটি প্রকাশিত হওয়ায় যেন ভীমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়ার অবস্থা দেখা দিয়েছিল। মানুষ কোন পরিবর্তন সহজে মেনে নিতে চায় না। আমাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যাঁরা কেবল পূর্বপুরুষদের জীবনধারাই অনুসরণ করে চলেন, কারণ তাঁরা কোন পরিবর্তন বা কোন কিছু নূতনকে ভয় পান। সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা তখনই দাঁড়ায় যখন আমরা কোন একটি প্রথা বা বিষয় অন্যায় ও নিরর্থক জেনেও প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই সেটি আঁকড়ে ধরে থাকি শুদ্ধমাত্র এই কারণে যে আমাদের পুর্বপুরুষদের কাল থেকে এটা চলে আসছে। আমরা

এই কুপ্রথা বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এটা দূর করার কোন চেষ্টা করি না, জনমতের বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস আমাদের থাকে না। এই যে অন্যায় বা অসত্যের সঙ্গে আপস করে চলার মনোভাব, সেটি আমাদের জীবনের নানাক্ষেত্রেই দেখা যায়, শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার জগতেও আমাদের এই রক্ষণশীলতা সুপ্রকট। 'বুরহন-এ-কাতি' দীর্ঘকাল ধরে ফার্সী ভাষার একটি প্রামাণ্য গ্রন্থের মর্যাদা পেয়ে আসছিল। পণ্ডিত ব্যক্তিগণ এই গ্রন্থটি নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্যরূপে অনুমোদন করতেন। এমনি একটি পুস্তকের বিরূপ সমালোচনা ঔদ্ধত্য এমন-কি অধর্ম রূপে বিবেচিত হয়েছিল এবং গালিবের বিরুদ্ধে এই দুই অভিযোগই এসেছিল। বইটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন ঝড় বইতে শুরু হয়েছিল। গালিবের মতের কড়া সমালোচনা-সূচক একের পর এক পুস্তক অথবা পুস্তিকা প্রকাশিত হতে থেকেছিল। গালিব ও তাঁর বন্ধুরা এই সব সমালোচনা নিঃশব্দে বরদাস্ত করেন নি। তাঁরা সাধ্যমত এই সব আক্রমণের সমুচিত উত্তর দিতে চেষ্টা করেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গালিবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মন্দীভূত হলেও একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায় নি। ঘটনা এমনি দাঁড়িয়েছিল যে মানহানিকর রচনা প্রকাশের জন্য গালিবকে ক্ষতিপূরণ আদায় করার উদ্দেশ্যে আদালতের শরণও নিতে হয়েছিল। এই অভিযোগ করা হয়েছিল আমিনুদ্দীন নামে একজন 'খিস্তি' লেখকের বিরুদ্ধে। গালিব অবশ্য এই ক্ষতিপূরণের মামলায় জিততে পারেন নি। কয়েকজন নামকরা

পণ্ডিত ব্যক্তি ওই লেখককে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে আপত্তিজনক শব্দগুলির উল্টোপাল্টা ব্যাখ্যা করে এটা বোঝাবার জন্য চেষ্টা করেন যে অপমানটা এত গভীর নয় যে গালিবের মানহানি হতে পারে। শেষ পর্যন্ত গালিব ক্ষতিপূরণের দাবি আদালত থেকে তুলে নিয়ে একটা আপস-মীমাংসা করে নিতে বাধ্য হন।

সভা-কবি

1860 খ্রীস্টাব্দে পেনসন পুনঃপ্রবর্তিত হওয়ার পর, 1863 খ্রীস্টাব্দে গালিব দরবারে যোগ দেওয়ার অধিকার পুনরায় লাভ করেন। এই সময় থেকে সরকারের কাছ থেকে আরও সম্মান লাভের জন্য তিনি যত্নবান হন। কর্তৃপক্ষের নিকট গালিব এই উদ্দেশ্যে একটি আবেদনও পাঠান। এই আবেদনের প্রার্থিত বিষয় ছিল যে মহারানী ভিক্টোরিয়ার সভায় তাঁকে 'রাজ-কবি' নিযুক্ত করা হোক এবং তাঁর লেখা 'দস্তম্বু' সরকারী ব্যয়ে প্রকাশিত হোক। এই দুটি অনুরোধই প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল, তবে এটা ছিল প্রত্যাশিত। সরকারী কর্তৃপক্ষের এই প্রত্যাখ্যান ব্যাপারের পিছনে গালিবের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিদের প্রচেষ্টা বেশ কাজ করেছিল। ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ গালিবের আবেদনের উত্তরে যে জবাব দিয়েছিলেন তা ছিল বেশ আশাপ্রদ এবং আবেদনের অনুকূলে। তাঁরা জানিয়েছিলেন যে গালিবকে রানী ভিক্টোরিয়ার দরবারের 'রাজ-কবি' নিযুক্ত করা সম্ভব নয়, তবে

গভর্নর জেনারেল যদি তাঁকে তাঁর দরবারের কবি রূপে নিযুক্ত করেন— তাতে ইংলণ্ডীয় কর্তৃপক্ষের কোন আপত্তি থাকবে না। এর পর সপারিষদ গভর্নর জেনারেল সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে গালিবের আচরণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। এই অনুসন্ধান-কালে, বাহাদুর শাহের জন্য গালিবের সিক্কা রচনা সম্বন্ধে ব্রিটিশ গুপ্তচরের যে 'রিপোর্ট' ছিল, সেটি প্রকাশ পেয়ে যায়।

এর থেকে কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে প্রকৃতপক্ষে গালিব ব্রিটিশ-বিরোধী না হলেও তিনি বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন।

কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তের পর গভর্নর জেনারেল কর্তৃক তাঁর রাজ-কবি পদে নিযুক্ত হওয়ার সকল সম্ভাবনাই নির্মূল হয়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও কতৃপক্ষ উপরোক্ত দুটি প্রার্থনাই পাঞ্জাবের লেঃ গভর্নরকে জানিয়ে আদেশ দিয়েছিলেন যে লেঃ গভর্নর প্রাদেশিক স্তরে এই দুটি বিষয়েই যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

সাহিত্যিক লোকপ্রিয়তা

গালিবের আর্থিক অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় তাঁকে জীবিকা-নির্বাহের জন্য অবিরত কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়েছিল —তা সত্ত্বেও সাহিত্য-জগতে তাঁর প্রতিষ্ঠা দিন দিন বেড়েই চলেছিল। 1857 খ্রীস্টাব্দে রাজনৈতিক বিপ্লব শুরু হওয়ার পূর্বেই তাঁর উর্দু ও ফার্সী কবিতার সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছিল।

তাঁর উর্দু 'দীওয়ান' দুবার প্রকাশিত হয়, 1841 ও 1847 খ্রীস্টাব্দে। ফার্সী 'দীওয়ান' প্রকাশিত হয় একবার 1845 খ্রীস্টাব্দে। জনসাধারণের মধ্যে তাঁর কাব্য-সংগ্রহের চাহিদা বেড়েছিল, কারণ পুরাতন সংস্করণের পুস্তকগুলি নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ায় এগুলি আর পাওয়া যাচ্ছিল না। বিশেষ করে উর্দু দীওয়ানের চাহিদাটাই ছিল বেশী। উর্দু দীওয়ানের একটা 'কপি' কোনরকমে সংগ্রহ করে গালিব এটি ঘষে মেজে আবার ছাপার জন্য প্রেসে পাঠান। তাঁর নিজের কাছেও এই উর্দু দীওয়ানের কোন 'কপি' ছিল না। যাই হোক, এই নূতন সংস্করণটি 1861 খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। তবে এই সংস্করণটি সুমুদ্রিত হয় নি। এর অঙ্গ-সজ্জা বা 'টাইপ'এর বিষয়ে কোন যত্ন নেওয়া হয় নি। সবচেয়ে দুঃখের কথা যে এতে ছাপার ভুলও ছিল বেশী। গালিব স্বয়ং একটি 'কপি' যত্ন-সহকারে সংশোধন করে এটি ছাপার জন্য কানপুরের বিখ্যাত নিজামী প্রেসে পাঠিয়েছিলেন। এখান থেকে বইটি পরের বছর অর্থাৎ 1862 খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই বছরই (1862) লক্ষ্ণৌ-এর প্রসিদ্ধ প্রকাশক মুন্সী নওল কিশোর দিল্লীতে এসে গালিবের ফার্সী দীওয়ানের একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশের জন্য তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। গালিব কখনও নিজের রচনাগুলি গুছিয়ে সংগ্রহ করে রাখতেন না। গালিবের রচনাগুলি তাঁর দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু নবাব জিয়াউদ্দীন অহমদ খাঁ ও নজীর হুসৈন মির্জার কাছে সুরক্ষিত থাকত। এঁর মধ্যে

প্রথমোক্ত জন রাখতেন ফার্সী রচনাগুলি আর দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তি রাখতেন উর্দু রচনাগুলি। গালিব মুন্সী নওল কিশোরের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়ে তাঁকে নবাব জিয়াউদ্দীন অহমদ খাঁর কাছ থেকে এগুলি সংগ্রহ করার জন্য পাঠিয়ে দেন। মুন্সী ফার্সী দীওয়ানের পাণ্ডুলিপি নিয়ে লক্ষ্ণৌ প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু নানা কারণে এটির মুদ্রণকার্যে বেশ বিলম্ব ঘটেছিল। 1863 খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি অর্থাৎ প্রায় এক বছর পরে এটি প্রকাশিত হয়েছিল।

গালিবের ফার্সী ও উর্দু 'শায়রী'গুলির একাধিক সংস্করণ থেকেই বোঝা যায় যে তাঁর খ্যাতি ক্রমশঃই পাঠকসমাজে বেড়ে চলেছিল। মাত্র তিন বৎসরের মধ্যে চারবার তাঁর রচনার পুনর্মুদ্রণ থেকে বোঝা যায় যে পাঠকসমাজে তাঁর লোকপ্রিয়তা ছিল ক্রম-বর্ধমান, পাঠকেরা তাঁর রচনা পাঠ করার জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে প্রতীক্ষা করা শুরু করেছিল।

রামপুর-যাত্রা

রামপুরের নবাব ইউসুফ আলি খাঁ 1857 খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিক থেকে কাব্য-রচনার ব্যাপারে গালিবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন (শাগির্দ)। গুরুর আর্থিক অবস্থা বেশ খারাপ জেনে নবাব গালিবকে রামপুরে এসে বাস করার অনুরোধ জানান। এই সময়ে গালিবের মনে এই আশা খুবই দৃঢ় ছিল যে শীঘ্রই অবস্থার পরিবর্তন আসন্ন এবং তাঁর সরকারী অনুগ্রহলাভও সুনিশ্চিত।

এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই তিনি নবাবকে লিখে পাঠান যে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়া মাত্রই তিনি সানন্দে রামপুরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসবেন। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের আশু উন্নতি হবে এই ধারণাটি অবশ্য মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ তাঁর আবেদন-নিবেদনে কর্ণপাত করেন নি। ইতিমধ্যে রামপুর-নবাবের প্রদত্ত বৃত্তি ব্যতীত গালিবের আয়ের সব কটি উৎস রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই অবস্থায় পড়ে গালিব স্থির করলেন যে রামপুর-নবাবের স্থায়ী আমন্ত্রণ গ্রহণই হবে তাঁর পক্ষে বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। দিল্লীর জীবনযাত্রাও তখন নিরাপদ ছিল না। দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের সঙ্গে যাঁরা সম্পর্ক রেখেছিলেন অথবা তাঁর চাকুরিতে যাঁরা নিযুক্ত হয়েছিলেন এমন সব ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে তাঁদের অভিযুক্ত করা হচ্ছিল। যাঁরা গ্রেপ্তার বা অভিযোগ এড়াতে পেরেছিলেন তাঁদেরও নানাভাবে উত্ত্যক্ত করা হত। বিপদের আশঙ্কায় এঁদের সর্বক্ষণ কাটাতে হত। গালিবের বিরুদ্ধে বাহাদুর শার জন্য একটি সিক্কা রচনার অভিযোগ থাকায় তিনিও সন্দেহ-ভাজন ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিলেন। এইজন্য তিনি মনে মনে স্থির করেন যে কিছুকাল দিল্লী থেকে দূরে থাকাই তাঁর পক্ষে ভাল। রামপুর-যাত্রার সংকল্প গ্রহণ করার পিছনে হয়তো আর-একটি কারণ এই ছিল যে তিনি নবাবের কাছ থেকে যখন মাসিক বৃত্তি পান তখন নবাবের আমন্ত্রণ রক্ষা করা তাঁর কর্তব্য। তবে এর আরও

একটি কারণ এই হতে পারে যে নবাবের মাধ্যমে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে তাঁর একটা সন্তোষজনক মীমাংসা হয়ে যেতে পারে। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় রামপুরের নবাব ব্রিটিশের পক্ষ ত্যাগ তো করেনই নি, উল্টো তাদের দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকারকে তিনি নগদ টাকা এমন-কি সৈন্যবাহিনী দিয়েও সাহায্য করেছিলেন। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এইজন্য নবাবের প্রতি কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হয়ে রামপুররাজ্যসংলগ্ন উত্তর প্রদেশের কয়েকটি জেলার জায়গীরও তাঁকে উপঢৌকন দিয়েছিলেন। গালিব এ-সব ব্যাপারই জানতেন। নিজের তদানীন্তন দুঃস্থ অবস্থায় তিনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর উদ্ধারের এক-মাত্র পথ হল ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের উন্নতির জন্য নবাবের সাহায্য গ্রহণ। এই-সব সাত-পাঁচ ভেবে 1860 খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে গালিব রামপুর যাত্রা করেন।

গালিবের কোন জীবিত সন্তান ছিল না। বিভিন্ন সময়ে তাঁর সবসুদ্ধ সাতটি সন্তান জন্মেছিল কিন্তু অতি শৈশবেই তাদের মৃত্যু হয়েছিল, আঠারো মাসের বেশী কোন শিশুই বাঁচে নি। প্রথমে তিনি তাঁর স্ত্রীর এক আত্মীয় জৈনুল আবেদীনকে পোষ্যপুত্র স্বরূপ পালন করেন। জৈনুল একজন উচ্চ শ্রেণীর কবি বা শায়ের ছিলেন। ইনি 'আরিফ' এই নামে কাব্য রচনা করতেন। 1852 খ্রীস্টাব্দে এই যুবকের মৃত্যু হয় যক্ষ্মা রোগে। ইনি মৃত্যুকালে দুটি ছেলে রেখে যান। গালিবের স্ত্রী এর মধ্যে বড় ছেলেটিকে নিজের কাছে এনে রাখেন, এর নাম ছিল বাকির

আলি খাঁ। ছোট ছেলে হুসেন আলির বয়স তখন মাত্র দু'বছর, এই ছেলেটি গালিবের মালীর কাছেই থেকে গিয়েছিল। কিছু দিন পর এই মালীও মারা যান। তখন ছোট ছেলেটিকেও গালিবের কাছে এসে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। গালিবের স্ত্রী এই দুটি ছেলেকেই মানুষ করেন। গালিব দম্পতির কাছে এই দুটি ছেলেই ছিল নিজেদের নাতির মত। গালিবের রামপুর-যাত্রার সময় এই ছেলে দুটিও তাঁর সঙ্গী হয়েছিল। গালিব দু'মাসের বেশী সময় রামপুরে বাস করেছিলেন। দিল্লী ফিরে যাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না, রামপুরের জীবন-যাত্রা বেশ স্বাচ্ছন্দ্য-পূর্ণ ছিল, কাজেই গালিব এখানেই দীর্ঘদিন বাসের ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁকে দু'মাসের পরই দিল্লী ফিরতে হয়েছিল, তার কারণ তাঁর সঙ্গী শিশু দুটি অপরিচিত পরিবেশে কষ্ট পাচ্ছিল, ঘরে ফেরার জন্য তারা অধীর হয়ে পড়েছিল।

সম্মান-পুনঃপ্রাপ্তি

গালিবের রামপুরে অবস্থান কালেই নবাব গালিবের হয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট যে সুপারিশ করেন তার ফলে 1860-এর মে মাসে তাঁর নাকচ হয়ে যাওয়া পূর্বের 'পেনসন' আবার দেওয়ার হুকুম জারি হয়।

এটা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে গালিব বার্ষিক 750 টাকা মাত্র পেনসন পুনঃপ্রাপ্তির জন্য কেন এত ব্যাকুলতা দেখিয়ে-ছিলেন। এর জবাবে বলা যেতে পারে যে এটাই ছিল তাঁর

একমাত্র স্থায়ী এবং নিশ্চিত আয়। অন্য কোন আয় ছিল আকাশ-বৃষ্টির ন্যায় একান্তরূপে ভাগ্যের হাতে। কোন একদিন ভাগ্য খুলে যাবে এই আশার উপর ভরসা করে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। জীবন-নির্বাহে একটা কার্যক্রমের প্রয়োজন, একটা নিশ্চিত আয়ের সূত্র না থাকলে এই পরিকল্পনা সম্ভব হয় না। গালিবের ক্ষেত্রে, দীর্ঘকাল ধরে— এই পেনসনটিই ছিল একটি নিশ্চিত আয়— এমন-কি এটি তাঁর বন্ধুমহলে একটি মর্যাদা ও গর্বের বিষয় রূপে পরিগণিত ছিল। এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে এটি বাতিল হয়ে যাওয়ার ঘটনাটিকে উপলক্ষ্য করে গালিব-বিদ্বেষীরা খুশি হয়ে এই নিয়ে হাসাহাসি গল্প-গুজবও করত। এই পেনসন সূত্রে গালিব অনেকটা অবাধে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মহলে যাতায়াত করতে পারতেন। সরকারী দরবারে প্রধান ব্যক্তির দক্ষিণ পার্শ্বের দশম স্থানটি গালিবের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এই প্রধান ব্যক্তি কখনও বা থাকতেন গভর্নর জেনারেল কখনও বা প্রাদেশিক লেঃ গভর্নর। সামান্য পেনসনের তুলনায় দরবারে তাঁর নির্দিষ্ট আসনের মর্যাদা ছিল অনেকগুণ বেশি — এটা গালিবের সমসাময়িক কালের বহু ব্যক্তির পক্ষে ঈর্ষা-যোগ্য ব্যাপার ছিল। কাজেই, সহজেই বুঝতে পারা যায় কেন পেনসন অথবা দরবারী সম্মানের জন্য গালিব এতদূর ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন।

ভারতীয় ফৌজ 1857 খ্রীস্টাব্দের 11 মে মীরাট থেকে দিল্লী এসে পৌঁচেছিল। এর আগেই তিনি এপ্রিল মাসের পেনসনটি পেয়ে গিয়েছিলেন। এখন 1860 খ্রীস্টাব্দের মে মাসে বার্ষিক

750 টাকা করে বকেয়া তিন বৎসরের পেনসন অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে 2250 টাকা তাঁর প্রাপ্য হয়েছিল, এর মধ্যে 400 টাকা 1859-এর মে মাসে তাঁকে অগ্রিম দেওয়া হয়েছিল। প্রাপ্ত এই টাকা থেকে 150 টাকা তাঁকে কোর্টের ছোট ছোট কর্মচারীদের বখ্‌শিশ দিতে হয়েছিল। যে ব্যক্তি এতকাল ধরে তাঁর খরচ চালিয়ে এসেছে তার কাছে গালিবের দেনার পরিমাণ ছিল 1500 টাকা। তাছাড়াও নানা লোকে তাঁর প্রয়োজনের সময় নানা জিনিস ধারে জুগিয়েছিল, এদের পাওনার পরিমাণ ছিল 1100 টাকা। কাজেই, বকেয়া পেনসনের টাকা থেকে তাঁর সব দেনা শোধ করা সম্ভব হয় নি। যাই হোক, পেনসন পুনঃপ্রাপ্তির ব্যাপার থেকে গালিবের মনে নূতন আশা ও উৎসাহ সঞ্চারিত হয়েছিল। তিনি এখন মনে করলেন— এখনও তাঁর খাড়া হয়ে দাঁড়ানোর আশা আছে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে হার্দ্যসম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার যে আশা তাঁর মন থেকে বিলীন হয়ে গিয়েছিল সেটি আবার তাঁর মনে জেগে উঠেছিল। এর পর তিনি আবার নূতন করে চেষ্টা চালাতে লাগলেন যাতে তিনি দরবারে আমন্ত্রণ ও দরবারী 'পোষাক' পাওয়ার অধিকারী হতে পারেন। আগেই বলা হয়েছে যে— দরবারে আমন্ত্রণের অধিকার তিনি প্রথম পান 1823 খ্রীস্টাব্দে। তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে তাঁকে এই মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। এই সময়ে সর্বোচ্চ সরকারের নিকট পেনসনের আরজি পেশ করতে তিনি কলকাতা গিয়েছিলেন। দরবারী খেলাতের অধিকার তিনি এর পরবর্তী

কালে পান। এই খেলাত ছিল পুরো মাপের সাতটি বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র, একটি মূল্যবান মণি-খচিত 'শিরপেচ' ও একটি মোতির মালা বা হার। দরবারে উপস্থিত থাকার সময় রাজ-প্রতিনিধিকে কোন উপঢৌকন (নজর) তাঁকে দিতে হত না। এর পরিবর্তে রাজ-প্রতিনিধির প্রশস্তিমূলক একটি 'গজল' শুধু তাঁকে পড়তে হত।

পূর্বাবস্থা ফিরে এলেও গালিবের আর্থিক অসচ্ছলতা থেকেই গিয়েছিল। এর থেকে অব্যাহতি পাওয়ার কোন পথই তাঁর ছিল না। এরই মধ্যে তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষক নবাব ইউসুফ আলি খান 1865 খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে কর্কট রোগাক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করলেন।

কল্‌ব আলি খান

নবাব ইউসুফ আলি খানের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র নবাব কল্‌ব আলি খান তাঁর উত্তরাধিকারী হন। নূতন নবাব ও তাঁর শোকগ্রস্ত পরিবারকে সমবেদনা জ্ঞাপনের জন্য গালিবকে রামপুর যেতে হয়েছিল। সম্ভবতঃ সমবেদনা জ্ঞাপন ছাড়াও এই দ্বিতীয়-বার রামপুর-যাত্রার আরও একটি কারণ ছিল। 1859 খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাস থেকে গালিব রামপুর দরবার থেকে নিয়মিত মাসিক 100 টাকা বৃত্তি পেয়ে আসছিলেন।

গালিবের মনে আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল যে এটা বহাল থাকবে কি না। নবাব ইউসুফ আলি খান ছিলেন তাঁর শিষ্য। উর্দু

কাব্য রচনায় তিনি গালিবের উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তাঁকে যে মাসিক সাহায্য দেওয়া হত এটা যেন ছিল একটা কাজ করার পারিশ্রমিকের মত। গালিব বা নূতন নবাবের মধ্যে এমন কোন আদানপ্রদানের সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। নূতন নবাব তাঁর 'সাগ্‌রেদ' নন, সুতরাং বৃত্তি বন্ধ করে দেওয়ার পক্ষে তাঁর একটা যুক্তি থাকতে পারে। বৃত্তি বন্ধ হয়ে গেলে গালিবের খুবই কষ্ট হওয়ার কথা। এই সব কারণে গালিবের পক্ষে নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। এই সাক্ষাতের ফলে বৃত্তি বন্ধের সম্ভাবনা হয়তো রোধ করা যাবে। এই-সব ভেবে গালিব নূতন নবাবের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে রামপুরে এসেছিলেন। নূতন নবাব তাঁকে আশ্বস্ত করে জানিয়েছিলেন যে তাঁর বৃত্তি অব্যাহত থাকবে। এই আশ্বাস নিশ্চয়ই গালিবের উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়েছিল।

তাঁর রামপুরে বাসকালেই তিনি পাঞ্জাব গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে এই মর্মে একটি চিঠি পেলেন যে তাঁর 'দস্তম্বু'র একটি 'কপি' যেন মুখ্য-সচিবের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। গালিব ইতিপূর্বেই ভারত-গভর্নমেণ্টকে অনুরোধ করেন যেন তাঁর লিখিত সিপাহী-বিদ্রোহের বিবরণীটি তাঁরা প্রচারের ব্যবস্থা করেন। রামপুরে থেকে তিনি এই বইয়ের যে কপিটি সংগ্রহ করতে পারেন সেটির অবস্থা গভর্নমেণ্টের কাছে প্রেরণের উপযোগীই ছিল না। গালিব আশা করেছিলেন যে গভর্নমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত বা প্রচারিত হলে এই বই থেকে তাঁর বিশেষ বৈষয়িক লাভ হবে

এবং সামাজিক মর্যাদাও বেড়ে যাবে। এই কারণে তিনি একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে একটি 'কপি' সংশোধিত করে সেটি ছাপানোর জন্য বেরেলীতে কয়েকজন বন্ধুর কাছে পাঠিয়ে দেন। এই দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হওয়ার পর এর একটি কপি তিনি পাঞ্জাব গভর্নমেন্টের নিকট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পাঞ্জাব সরকার এই বইটির সম্বন্ধে এক বিশেষজ্ঞের মতামত চেয়ে পাঠান। এই বিশেষজ্ঞ সম্ভবতঃ এই পুস্তকের বিষয়বস্তুই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি, এর লিখন শৈলীও তাঁর মনোমত হয় নি। ইনি একটি প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশ করে লিখেছিলেন যে এর ভাষা পুরানো ফার্সী, এর বেশীর ভাগ আরবী শব্দই এখন অপ্রচলিত কাজেই তা দুর্বোধ্য।

তাঁর নিজস্ব অন্তিম রিপোর্টে গভর্নর জেনারেল জানিয়েছিলেন যে গালিবকে তাঁর নিজের দরবারের সভা-কবি নিযুক্ত করা সম্ভব নয় তবে পাঞ্জাবের গভর্নর ইচ্ছা করলে সহানুভূতির সঙ্গে গালিবকে তাঁর সভা-কবি নিযুক্ত করার প্রস্তাব বিবেচনা করতে পারেন। তিনি ইচ্ছে করলে তাঁকে বিশেষ 'খেলাত' দিতে পারেন, তাঁর নিজস্ব দরবারে তাঁর জন্য উচ্চতর সম্মানযুক্ত আসনেরও ব্যবস্থা করতে পারেন। এটা নিশ্চিতভাবে জানানো হয়েছিল যে সরকারী অর্থে 'দস্তম্বু' প্রকাশ বা প্রচারের কোন প্রয়োজন আছে বলে সরকার মনে করেন না। এইভাবে গালিবের আর-একটি আশায় ছাই পড়েছিল।

এইবার গালিব রামপুরে ছিলেন প্রায় দশ-সপ্তাহ কাল।

1865 খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষে তিনি দিল্লী যাত্রা করেন। পথে তিনি একটি বেশ বড় দুর্ঘটনায় পতিত হন। তখন অতি বর্ষণের ফলে নদীগুলি বন্যাক্রান্ত হয়েছিল। মোরাদাবাদ পৌঁছাতে তাঁর রামগঙ্গা নদী পার হবার দরকার ছিল। এক সারি নৌকারূপ সেতুর উপর দিয়ে ছিল এই নদী-পারাপারের ব্যবস্থা। তিনি একটি পাল্কীতে চড়ে যাচ্ছিলেন, মালপত্র ও ভৃত্যেরা আসছিল গোরুর গাড়ীতে। সেতু পার হতে না হতেই একটা প্রবল জলস্রোত এসে সেতুটি বিপর্যস্ত করে দেওয়াতে গালিব তাঁর সহযাত্রীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। কোন রকমে তিনি পরবর্তী গন্তব্য স্থান— মোরাদাবাদ পৌঁচেছিলেন। বর্ষা সত্ত্বেও তখন ছিল শীতকাল। রাত্রে শীতের প্রকোপ তীব্র হয়ে উঠত। আরও মুশকিলের কথা এই হয়েছিল যে তাঁর সঙ্গে উপযুক্ত শীত-বস্ত্র বা বিছানা কিছুই ছিল না। গালিবের শরীর আগে থেকেই খারাপ যাচ্ছিল, এই অবস্থায় তাঁর শরীর আরও খারাপ হয়ে গেল, তিনি গুরুতররূপেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। পরের দিন সকালে শহরে খবর রটে গেল যে মির্জা গালিব শহরের একটি 'সরাই'এ আশ্রয় নিয়েছেন। খবর পেয়ে তাঁর পরিচিত একজন সাব-জজ সরাই-এ এসে তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। তিনি গালিবের পক্ষে অত্যাবশ্যক চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করেছিলেন আর তাঁর জন্যে যা যা করা দরকার সবই করেছিলেন। পাঁচ দিন পর তাঁর শরীর একটু সুস্থ হয়। পথশ্রম সহ্য করার মত অবস্থায় এসে গালিব আবার দিল্লীর পথে অগ্রসর

হন। 1866 খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে গালিব দিল্লী ফিরে আসেন।

এই দুর্ঘটনা গালিবের স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে দিয়েছিল। তাঁর রামপুর-ভ্রমণ থেকেও আর্থিক কোন সুরাহা মেলে নি। রামপুর যাত্রার অনেক আগে থেকেই তাঁর শরীর ভেঙে এসেছিল, পথকষ্ট সহ্য করার শক্তি তাঁর ছিল না। অবস্থার চাপে পড়েই তাঁকে এই দুর্গম পথযাত্রার ঝুঁকি নিতে হয়েছিল। পাওনাদারদের কাছে তাঁর প্রচুর দেনা জমে গিয়েছিল, এদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার একমাত্র পথ ছিল রামপুর দরবারের বদান্যতা। নবাব কল্‌ব আলি খান্ নিজে ছিলেন সুশিক্ষিত পুরুষ। জ্ঞানী-গুণী ও কবিদেরও তিনি সাহায্য করতেন। গালিব সুদীর্ঘকাল ধরে রামপুর দরবারের সভা-কবি ছিলেন। কল্‌ব আলি খানের পিতা পরলোকগত নবাবের সঙ্গেও গালিবের সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ ছিল।

এ ছাড়াও আর-একটা কথা এই ছিল যে প্রাচ্য দেশের প্রথানুযায়ী রাজ্যের 'গদি' প্রাপ্তি বা রাজ্যাভিষেকের সময় যিনি 'গদি' পান বা সিংহাসনে আরোহণ করেন তিনি এই উপলক্ষ্যে রাজ-পরিবার বা রাজ-দরবার সংশ্লিষ্ট সকলকেই প্রচুর অর্থ দান করে থাকেন। গালিব নিশ্চিতই ভেবেছিলেন যে রামপুর নবাবের সিংহাসনারোহণ উপলক্ষ্যে রামপুরে উপস্থিত থাকলে তিনি নূতন নবাবের কাছে থেকে বেশ মোটা রকমের টাকা উপ-ঢৌকন পেয়ে যাবেন। এই টাকা থেকে তাঁর সব দেনা শোধ না হলেও অধিকাংশ দেনা শোধ হয়ে যাবে, অর্থাভাব অনেকটা দূর

হবে। বস্তুতঃ, শিল্প-সাহিত্যের উৎসাহদাতা বা উদারহৃদয় হওয়া সত্ত্বেও অর্থের বিষয়ে নূতন নবাব খুব সতর্ক থাকতেন। নবাব বহু লেখক ও কবি পরিবৃত হয়ে থাকতেন, কিন্তু তিনি বেশ দৃষ্টি রাখতেন যে এঁদের মধ্যে যাঁদের দরবার থেকে সাহায্য করা হত তাঁরা যেন বিনিময়ে কোন-না-কোন একটা সরকারী কাজের দায়িত্ব নিয়ে তা যেন যথাযথ ভাবে সম্পন্ন করেন। অর্থাৎ শুধু কবিতা লেখার জন্য বা ছবি আঁকার জন্য কাউকে বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দেওয়া হত না, কিছু কাজও প্রাপকদের করতে হত। নবাবের মনোভাব যখন এইপ্রকার ছিল তখন গালিবকে যে নিরাশ হতে হয়েছিল এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। রামপুরে আসার পর গালিবের প্রতি কোন বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখানো হয় নি, মোটা টাকাও তিনি পান নি। রাজ্যাভিষেক দরবার উপলক্ষ্যে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল মাত্র 1000 টাকা। ফেরার আগে তাঁকে রাহা খরচ হিসাবে আরও দু'শত টাকা দেওয়া হয়েছিল।

একে তো এই অবস্থা, তার উপর গালিবের দিল্লী ফেরার পর দুজনের মধ্যে একটা মনোমালিন্যের ঘটনাও ঘটেছিল। তরুণ নবাব গালিবের কাছে একটা ফার্সী গদ্য রচনা পাঠিয়ে জানতে চাইলেন যে এটা একটা বইয়ের ভূমিকারূপে তিনি ব্যবহার করতে চান, এটা ঠিকভাবে লেখা হয়েছে কিনা। এই রচনায় নবাব এমন কিছু 'মুহাবরে' বা শব্দাবলী প্রয়োগ করেন যা ভারতে প্রচলিত থাকলেও ফার্সীর প্রাচীন পণ্ডিতদের অনমু-

মোদিত। গালিব এইগুলি সংশোধন করে পাঠান। নবাব যখন সংশোধিত রচনাটি পেয়ে পরিবর্তনগুলি লক্ষ্য করলেন, তখন তিনি এই পরিবর্তনের কারণ কী তা জানবার জন্য গালিবের কাছে পত্র লিখলেন। যে শব্দাবলী পরিবর্তন করা হয়েছে সেগুলি যে কোন কোন ভারতীয় ফার্সী লেখক একই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন— সে কথাও তিনি গালিবকে জানালেন। গালিব সারা জীবনে ভারতীয় ফার্সী লেখকদের মর্যাদা কোনদিন স্বীকার করেন নি, তাঁর মতে এঁরা ফার্সী লেখকই নন। এঁদের নজীর তুলে ধরায় গালিব রূঢ় ভাষায় এঁদের বিদ্যা-বুদ্ধির নিন্দা প্রকাশ করেন। এঁদের মত নবাব প্রামাণ্য বলে মনে করায় পরোক্ষভাবে এর দ্বারা নবাবের বিদ্যা-বুদ্ধিরও নিন্দা করা হয়েছিল। নবাব ছিলেন পরম্পরাবাদী। তাই গালিবের চিঠির সুর ও ভাষা তাঁকে অসন্তুস্ট করেছিল। দুজনের মধ্যে দুঃখজনক বাদ-প্রতিবাদের পালা এরপর চলতে থাকে। গালিব এ:তে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন, তাঁর ভয় জন্মেছিল যে এর ফলে তাঁর মাসিক বৃত্তি বন্ধ হয়ে যাবে। ভয় পেয়ে তিনি শেয পর্যন্ত নবাবের যুক্তিই মেনে নিলেন। কল্‌ব আলি খাঁন তাঁর পক্ষ থেকেও বাদ-প্রতিবাদ হঠাৎ বন্ধ করে দেন। তিনি কিন্তু শেষ পর্যন্ত গালিবকে জব্দ করার জন্য মাসিক বৃত্তি বন্ধ করেন নি। এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার পরিণাম এই দাঁড়িয়েছিল যে গালিব ও নবাবের মধ্যে সাহিত্য-সংক্রান্ত কোন পরামর্শ বা সহযোগিতার পালা চুকে গিয়েছিল। এমন আরও কয়েকটি

ঘটনায় দুজনের মধ্যে আরও অপ্রীতির ভাব জন্ম নিয়েছিল। এই অবস্থায় নবাবের কাছ থেকে কোন বাড়তি ‘প্রাপ্তি’ গালিবের ভাগ্যে ঘটে নি। দুজনের মধ্যে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক অবশ্যই শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল, তবে আগেকার মত সে সম্পর্ক আর প্রীতিপূর্ণ ছিল না।

দেহান্ত

এখন কবি নশ্বর জীবনের শেষ পরিণতির পথে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর শারীরিক অবস্থা ভাল যাচ্ছিল না। রামপুর থেকে দিল্লী ফেরার পথে যে দৈব-দুর্ঘটনা ঘটে তা তাঁর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছিল। এই সময় আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য— জীবনযাত্রার যে উচ্চ মান তিনি আজীবন বজায় রেখে-ছিলেন তা চালিয়ে যাওয়া আর সম্ভব হচ্ছিল না। বাল্য ও যৌবনকালে তিনি ভোগ বিলাস, এমন-কি বেপরোয়াভাবে জীবন অতিবাহিত করেন। বয়স যখন বাড়ল, তখন আয় অবশ্য কমে গিয়েছিল, ব্রিটিশ সরকার ও রামপুর নবাব-প্রদত্ত বৃত্তির মধ্যেই তা সীমায়িত ছিল। ইতিমধ্যে তাঁর দায়-দায়িত্বও বহু গুণ বেড়ে গিয়েছিল, বিশেষভাবে জৈনুল আবেদীনের ছেলে দুটি আসার পর থেকে। গালিব একাধিক রোগেও আক্রান্ত হয়ে-ছিলেন। পুরাতন কোষ্ঠ-কাঠিন্য রোগ থেকে নানা রোগের উপসর্গ দেখা দিয়েছিল। 1862 ও ’63তে তাঁর শরীরের নানা স্থানে

ক্ষত ও বিস্ফোটক দেখা দেয়, এদের প্রকোপে তাঁর শরীর খুবই ভেঙে যায়। এর আক্রমণ থেকে সামলে উঠতে না উঠতেই 'হার্নিয়া' রোগে তিনি আক্রান্ত হন, সম্ভবতঃ তাঁর দেহে বহুমূত্র রোগেরও কিছু লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁর আহার্যের পরিমাণও হয়ে গিয়েছিল খুব অল্প। অধিকাংশ সময়ই তিনি ঘরের মধ্যে কাটাতেন, বাইরে যেতে পারতেন না। এই অবস্থায় প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র লেখার কাজ করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। সারা-জীবন যে সাহিত্য-চর্চায় অতিবাহিত হয়েছে সে সাহিত্য-চর্চার সাধ্যও তাঁর ছিল না। এই কারণে তিনি দিল্লীর দুটি বহুল-প্রচারিত সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে এই মর্মে ঘোষণা প্রচার করেন যে এটা তাঁর পক্ষে গভীর পরিতাপের বিষয় যে সাহিত্য-সেবা তাঁর দ্বারা আর সম্ভব নয়, তাঁর বন্ধু ও শিষ্যবর্গের প্রতি তাঁর অনুরোধ তাঁরা যেন তাঁদের কোন রচনা তাঁকে সংশোধন উদ্দেশ্যে আর না পাঠান। গালিবের এই অনুরোধে কেউ কর্ণপাত করেন নি। তাঁর বন্ধুরা তাঁকে চিঠিপত্র লিখতেন, এবং গালিবকে তার জবাবও দিতে হত।

শেষ অবস্থা ঘনিয়ে এসেছিল। দুর্বলতা বেড়েই যেতে লাগল। মাঝে মাঝে তিনি চৈতন্য-হীন হয়ে পড়তে লাগলেন। কোন শক্ত খাদ্য খাওয়ার শক্তি তাঁর আর রইল না। 1869 খ্রীস্টাব্দের 14ই ফেব্রুয়ারি স্বাস্থ্যের এই শোচনীয় অবস্থায় তিনি সন্ন্যাস বা মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ রোগে আক্রান্ত হয়ে সংজ্ঞা হারালেন। তখনকার দিনের সর্বোত্তম চিকিৎসাতেও কোন ফল

হ'ল না। তার পরের দিন 1869 খ্রীস্টাব্দের 15ই ফেব্রুয়ারি মধ্যাহ্নের কিছু পরেই গালিব শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। ঐ দিনই সন্ধ্যায় তাঁর মরদেহ নিজামুদ্দীন নামে ছোট এক গ্রামে নিয়ে গিয়ে লোহারুবংশীয়দের পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত করা হয়। এইভাবে ভারতের শেষ 'ক্লাসিক' ফার্সী কবি ও উর্দু ভাষায় নূতন কাব্য-রীতির দিশারী পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। তাঁর প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করেই পরবর্তী কবিগণ উর্দু কাব্য-ধারাকে উচ্চমার্গে সমাসীন রাখতে পেরেছিলেন।

॥ 2 ॥

গালিবের কলা

গালিব এগারো কি বারো বছর বয়সে অতি শৈশবকালেই লেখা শুরু করেন। প্রথমে উনি 'আসাদ' এই ছদ্ম বা উপনাম ব্যবহার করতেন। এটা হল আসাদুল্লা খাঁ এই পুরা নামের অংশ-বিশেষ। কিছু কাল পরে তিনি জানতে পারেন যে আর-একজন লেখকও এই ছদ্ম-নাম বা 'তখল্লুস'টি ব্যবহার করছেন। বিভ্রান্তি এড়াতে তিনি নিজে গালিব এই 'তখল্লুস' গ্রহণ করেন। এই নাম নির্বাচনের কারণ কতকটা স্বাভাবিকই ছিল কারণ হজরত মুহম্মদের জামাতা আলির এক উপাধি ছিল আসাদুল্লাহ্ অল্ গালিব। এই সময়ে তিনি যে ফার্সী ভাষাতেও লিখতেন তার প্রমাণ থাকলেও এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে তিনি উর্দুতেই লিখতেন বেশী।

1821 খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তাঁর উর্দু কবিতার সংখ্যা এত বেশী হয়েছিল যে তাঁর নিজস্ব কবিতা-সংগ্রহ থেকে একটি 'দীওয়ান' প্রকাশ করা যেত। প্রথম দিকে তিনি এমন কয়েকজন ফার্সী কবির দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন যাঁদের রচনা ছিল অবাস্তব বিষয়ধর্মী এবং শৈলী ছিল কষ্ট-কল্পিত। গালিবের এই সময়ের রচনায় এই দোষগুলির সমাবেশ দৃষ্ট হ'ত।

এই ব্যর্থ পথ অনুসরণ করতে নিষেধ করার মত লোক অবশ্যই গালিবের বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন। গালিব ছিলেন অত্যন্ত জেদী ও দাম্ভিক প্রকৃতি-সম্পন্ন, বন্ধুদের এই বিরূপ সমালোচনা তিনি মোটেই গ্রাহ্যের মধ্যে আনতে অভ্যস্ত ছিলেন না। অনেক বৎসর পরে যখন তিনি দিল্লীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন, তখন তাঁর কয়েকজন বিশ্বস্ত বন্ধু তাঁকে লেখার ধরন বদলে এমন কতকগুলি উর্দু 'দীওয়ান' নির্বাচন করতে অনুরোধ করেন— যেগুলি সাধারণ পাঠক আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করতে পারবে। বন্ধুদের বন্ধুজনোচিত ও অকপট পরামর্শ উপেক্ষা না করতে পেরে গালিব তাঁর আগের দীওয়ান থেকে বহু কবিতা ছেঁটে ফেলেন, যাতে বাকী অংশটুকু সকলের পক্ষে হৃদ্যতর হতে পারে।

এই 'দীওয়ান' সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় 1841 খ্রীস্টাব্দে। এর প্রকাশ প্রকৃতপক্ষে উর্দু সাহিত্যের ইতিহাসে একটা যুগান্তর এনে দিয়েছিল। মাত্র 1100টি দুই-লাইনের কবিতা-যুক্ত এই ছোট পুস্তকটি সাধারণ ভাবে উর্দু ভাষার ও বিশেষভাবে উর্দু কাব্যের উপর কী সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল তা ভাবলে বিস্মিত বোধ করতে হয়। এই ঘটনার পর গালিব আরও আঠাশ বৎসর বেঁচে ছিলেন। এই দীর্ঘ-কালের মধ্যে এই দীওয়ানের দ্বিপদীর সংখ্যা 1800 অতিক্রম করে নি।

উর্দু ভাষা সাক্ষাৎ ভাবে একাধিক ভারতীয় ভাষা থেকেই জন্মলাভ করেছে। বিশেষ ভাবে খড়ী-বোলী ও হরিয়ানী ভাষা থেকেই এর উদ্ভব। এর ফলে উর্দু ভাষার শব্দভাণ্ডার-এর অধিকাংশই ভারতীয় সূত্র থেকেই এসে গিয়েছিল। এদেশে মুসলমানদের আসার ফলে যে ফার্সী ভাষা প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল, সেই ভাষার লিপিটিই অবশ্য এই ভাষায় গৃহীত হয়ে গিয়েছিল। উর্দু ভাষার প্রাথমিক যুগের লেখকেরা সবাই ছিলেন ফার্সী ভাষায় কৃত-বিদ্য, এঁদের মধ্যে ধার্মিকতার ভাবও প্রবল ছিল। নূতন ভাষা উর্দুর মাধ্যমে লেখার সময়ে এই লেখকেরা ফার্সী ভাষার 'ক্লাসিক' লেখকদের লিখনরীতিই অনুসরণ করতেন। ফার্সী কাব্যধারা গজল, কসীদা ও মসনবী এই তিন ধারায় প্রবাহিত।

'শায়রী'র এই ত্রিধারার মধ্যে বিশেষভাবে গজলের উপজীব্য বিষয় হল প্রেম, সুরা ও রহস্যবাদ। উর্দু কাব্যের উদ্ভবের বহু পূর্ব থেকেই 'শায়রী'র আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু সম্বন্ধে একটি ধারণা নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। উর্দু ভাষার কবিকুল প্রথম থেকেই কাব্যের এই আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু সম্বন্ধীয় ধারণার প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন নি, তাঁরা এই রীতিরই অনুসরণ করতেন। কাজে কাজেই এঁদের রচনায় কৃত্রিমতা ও অবাস্তবতা থেকেই যেত। এ-বিষয়ে কবিদের নিজস্ব অনুভূতি বলতে আর কিছু পাওয়া যেত না। এই ত্রুটি সত্ত্বেও একজন উর্দু কবি যেন 'সবজান্তা'র ভাব নিয়ে কলম ধরতেন। সবচেয়ে হতাশাজনক

ব্যাপার ঘটত এই যে— জীবনের অন্য নানাবিধ সমস্যাগুলির সম্বন্ধে এঁদের কোন বক্তব্যই থাকত না— সে সম্বন্ধে এঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। প্রেম, সুরা বা রহস্যবাদ এ-বিষয়গুলি অবশ্যই নিজ নিজ ক্ষেত্রে আলোচনাযোগ্য বস্তু হতে পারে। তবে শুধু এই বিষয়গুলি নিয়েই জীবন নয়, এরাই জীবনের সব-কিছু হতে পারে না। এই সঙ্কীর্ণচিন্তার পরিণাম এই হয়েছিল যে আমাদের প্রাথমিক যুগের উর্দু কবিগণ সবাই নিজের নিজের কল্পিত এমন এক জগতে বাস করতেন যার সঙ্গে বাস্তব জীবনযাত্রার কোন সম্পর্কই ছিল না।

এই অবস্থায় প্রথম যে কবি বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত করলেন তিনি হলেন গালিব। প্রথমে তিনিও তাঁর পূর্বগামীদের মতই কাল্পনিক ও অবাস্তব বিষয় নিয়ে লেখা শুরু করেন। কিছুদিন পরেই তিনি এই শ্রেণীর রচনার অন্তঃসারশূন্যতা উপলব্ধি করে কাব্যধারাকে এক নূতন যুক্তিগ্রাহ্য ও সহজ পথে প্রবাহিত করার চেস্টায় ব্রতী হলেন। তাঁর কাব্যের উপজীব্য হল— জীবন ও তার নানা সমস্যা; মানুষ ও বিশ্বাস-সমূহ, অন্তর্লীন ভাবস্রোত, প্রেম এবং তার মনোবিজ্ঞান-সম্মত প্রতিক্রিয়া-সংঘাত এমনি আরও অনেকানেক বিষয়— আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে উপলব্ধ অনুভূতি ইত্যাদি। এইভাবে তাঁর শায়রী হয়ে উঠল আমাদের জীবনের প্রাত্যহিক অনুভূতি-গুলির ব্যাখ্যান ও বিশ্লেষণ। অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই এই

কবিতাগুলি পড়ে পাঠকেরা অধিকতর সন্তোষ ও আনন্দ লাভ করতে পেরেছিলেন। তবে এ-কথাও স্বীকার্য যে গালিবের পক্ষে দুই শত বৎসর ধরে অনুসৃত পূর্বগামীদের দ্বারা স্থাপিত এই পরম্পরা নিঃশেষে ছিন্ন করা সম্ভব হয় নি। গালিবের 'দীওয়ানে' আমরা এমন অনেক কবিতার সমাবেশ দেখতে পাই যেগুলি অবাস্তবতা-দোষ-দুষ্ট, গালিব এই অবাস্তবতার দোষটুকু পূর্বগামী কবিদের কাছ থেকে ঐতিহ্য-সূত্রেই লাভ করেছিলেন। কাল্পনিক ও ভ্রমাত্মক লিখন-রীতির নিরর্থকতা হৃদয়ঙ্গম করে— গালিব এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে একটি নূতন কাব্য-রীতির প্রবর্তন করতে পেরেছিলেন— তাঁর বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য এইখানেই। গত শতাব্দীতে উর্দু কাব্য প্রশংসনীয় সাফল্য লাভ করে অতি উচ্চ-কোটিতে নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে। এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে উর্দু কাব্যের এই সমৃদ্ধির অন্যতম কারণ হল বহির্বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ এবং পাশ্চাত্য ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচিতি। তবে এ-কথা আমাদের পক্ষে মনে রাখা প্রয়োজন যে সর্বপ্রথম গালিবই একটি পুরানো বন্ধন ছিন্ন করে আমাদের কাছে জ্ঞান ও বিচারনিষ্ঠ এক অজ্ঞাত জগতের সন্ধান এনে দিয়েছিলেন।

বিভিন্ন বিষয়ের উপর গালিবের চিন্তা-ভাবনা ও কবি-কৃতির কিছু নিদর্শন এখানে সন্নিবিষ্ট করা হ'ল।

গালিব থেকে নির্বাচিত কবিতাগুচ্ছ

ঈশ্বর

দুর্জ্ঞেয়তমের রহস্য-ভাণ্ডারের সন্ধান তো তোমার জানা নেই।
তা যদি জানা থাকত,
তবে দেখতে পেতে প্রতিটি অবগুণ্ঠনের অন্তরালে ধ্বনিত
তাঁরই সেই এক স্বর।
তাঁর এই লুকোচুরি তাঁর সৌন্দর্য এত বাড়িয়েছে যে তা
বর্ণনার অতীত।
কেশগুচ্ছের চেয়েও এই অবগুণ্ঠন তাঁকে অধিকতর
শ্রীমণ্ডিত করেছে।

কে তাঁকে দেখতে পায়? যিনি অদ্বৈত ও তুলনা-রহিত।
দ্বিত্বের ছিটে-ফোঁটাও যদি সম্ভব হত, আমরা তাঁকে দেখতে
পেতাম কোথাও না কোথাও।

যখন কোথাও কিছু ছিল না, ঈশ্বর অবশ্যই ছিলেন।
যদি এমন হয়— কোথাও কিছুর অস্তিত্ব থাকবে না,
তবু থাকবেন ঈশ্বর।
আমিই তো আমার সর্বনাশের মূলে,
'আমি' না থাকলে কার কি এসে যায়?

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আসে শিশিরকণা ঢলে পড়ার পালা;
আমার অস্তিত্বের অবসান তোমার প্রেমোজ্জ্বল দৃষ্টিপাতে।

আমার প্রভু ধরাছোঁয়ার বাইরে, বুদ্ধির অগোচর,
যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা জানেন 'কিবলা' বা 'কাবা'
শুধু আসলের রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারে,
নিজে সে আসল নয়।

তাঁর রূপ-সজ্জার শেষ নেই,
অবগুণ্ঠনের বাইরেও রয়েছে তাঁর সামনে আরশি,
এরই সামনে প্রতিনিয়ত চলে রূপ-সজ্জায় পরিবর্তনের
খেলা।

পথিক দলের মধ্যে কেউ না কেউ,
একটি না একটি পান্থশালায় পৌঁছে,
ক্লান্ত হয়ে এলিয়ে পড়ে, আর এগিয়ে যেতে পারে না।
তোমার কাছে যারা পৌঁছাতে পারে না,
তাদের কি আর উপায় থাকে বল ?

প্রতিটি অণু-পরমাণুর উন্মত্ত নর্তনের কৈফিয়ৎ কে দেবে ?
বিশ্বচরাচরকে এমন মহিমায় পরিপূর্ণ করেছেন তিনি।
তাঁর সব কিছুই অনিত্যের ঘূর্ণীপাকে বাঁধা।

নিজের কাছ থেকেই তুমি দিব্যজ্ঞান লাভ করবে,
সব কিছুই বুঝতে নাই বা পারলে।

এক ঈশ্বরেরই প্রকাশ বহু ভাবে, আমরা এই কথা বলে থাকি,
এটা একটা অন্ধ-কল্পনার অনুসরণ মাত্র ;
সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের কল্পনার এই দেবতারা
আমাদের অবিশ্বাসী 'কাফির' করে তোলে।

সকল বস্তুতেই তো তুমি রয়েছ,
তবু তোমার মত কিছুই কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না।

ধর্ম

অপবিত্রতা না থাকলে পবিত্রতা আসবে কোথা থেকে?
বসন্ত-ঋতুর প্রতিবিম্ব প্রতিফলনের আধার রূপে
একটি উদ্যানের প্রয়োজন রয়েছে।

আমরা একেশ্বর-বাদী, আচার-অনুষ্ঠান বর্জন আমাদের ধর্ম।
মতবাদের কুয়াশা অপসৃত হলে, তখনই দেখা দেয় ধর্মের
প্রকৃত স্বরূপ।

আমাদের প্রার্থনা শুধু সুরা ও মধুর জন্য যেন না হয়,
এর জন্য দরকার স্বর্গকে নরকে ঠেলে দেওয়া।

জীবনে মহৎ কিছু করার সুবর্ণসুযোগ পেয়েও যে হারিয়েছে
তাকে সান্ত্বনা দেবার মত কিছু নেই,
যদিও হয়তো সে সুযোগের সময়টুকু প্রচুর-প্রার্থনাতেই
কাটিয়েছিল।

ধর্মের মূল কথাই হ'ল ঐকান্তিক ভক্তি,
মন্দিরে জড়-দেবতার পূজা করতে করতেই যে ব্রাহ্মণের
মৃত্যু হয়েছে,
তার সমাধির উপযুক্ত স্থান পবিত্র কাবা মসজিদ,
কারণ সে ভক্তিমান্।

বেহেস্তের প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ, বেহেস্ত হয়তো সত্যিই
খুব ভাল জায়গা ;
ঈশ্বরের কাছে আমার এই প্রার্থনা— সেখানে যেন তোমার
দেখা পাই ।

যে মূল্যবান জীবনের অবসান হয়ে গেল এ পারে,
তার ক্ষতি পূর্ণ হয়ে যায় বেহেস্তে ।
কিন্তু এটা কি সত্যি পুরস্কার !
কোথায় নেশার আনন্দ আর কোথায় অনিশ্চয়তার যন্ত্রণা ।

বেহেস্তের আসল খবর আমার জানা আছে ।
তবে মন খুশি রাখতে গেলে এমন চিন্তায়তো আনন্দ আছে ।

হে ঈশ্বর, যে পাপ কাজ করেছি, তার শাস্তি দিতে চাও দিয়ো ।
তবে যে পাপ-কাজের চিন্তা করেছি, কিন্তু যা করতে পারিনি,
তা আমাকে হতাশা-বিদ্ধ করেছে । এই হতাশা ভোগের জন্য
কিছু রেহাই তোমার কাছে আমার পাওনা ।

এটা কি সত্যি প্রয়োজন, যে সবাই পাবে এক হতাশাজনক
জবাব ?
চল তো দেখি, আমরা সবাই সিনাই পাহাড়ে চলে যাই ।
দেখি ভাগ্যে কি মেলে ?

ধার্মিকতার কেন প্রশংসা করব ?
যদিও হয়তো এটা খাঁটি, লোক-দেখানো নয় ।

ভাল কাজের পুরস্কার পাবার পিছনে,
পুঞ্জীভূত লোভের প্রকাশ জড়িত কি নেই ?

রহস্য-বাদ

ভালবাসার ছলা কলা আর নয়নের চাতুরী
ভাষায় যদি প্রকাশ করতে হয় এর উপমা দেওয়া চলতে
পারে,
ছোরা ও ছুরির সঙ্গে।
ঈশ্বরের প্রসঙ্গ নিয়ে কথা যদিও ওঠে,
এতেও এসে পড়বে পান-পাত্র আর মদিরার প্রসঙ্গ।

দর্শন, দ্রষ্টা ও দৃষ্ট-বিষয়— মূলতঃ এগুলো সব একই।
আমি ভেবে পাই না তাই, 'দেখা'কে এদের মধ্যে কোন্
শ্রেণীতে ফেলব।

মহাসমুদ্রের পরিচয় তার নিয়ত রূপ-পরিবর্তনে,
তা যদি না হত তবে জলকণা, জলের ঢেউ আর বুদ্বুদের
মূল্য আর কতটুকু ?

যা দেখেছি— এটা একটা নিতান্ত রহস্য
এটা যেন স্বপ্ন দেখতে দেখতেও স্বপ্ন থেকে জেগে উঠা।

বাইরের চটক দেখে ভুলো না,
এরা কেউ বলে এটা ঠিক, কেউ বলে ঠিক নয়।

আমার কাছে এ সংসার ছেলে-খেলা,
দিবা-রাত্রি আমার সামনে চলছে এই খেলা।
সলোমনের সিংহাসন আমার কাছে শুধুই খেলনা,
ঈশার চমৎকারিত্ব শুধু বাক্-বিলাস।

বিশ্ব-সৃষ্টি আসলে কিছুই না, একটা শুধু নাম ;
যা আমরা চোখে দেখি, তা শুধু কল্পনা-বিলাস।

আমার ধর্ম বিশ্বাস আমাকে বেঁধে রাখতে চায়,
অবিশ্বাস আমাকে বিপথে টানে।
পবিত্র কাবা আমার পিছনে পড়ে থাকে, সামনে এসে পড়ে গীর্জা।

জীবন

আসাদ, সংসারকে চিনে রাখ,
প্রেমিকার জন্য যে ফরহাদ পাথর ফুঁড়েছিল,
লোকাচারের শৃঙ্খল সেও ভাঙতে পারেনি।
আত্ম-হননের কাজে তাকে চির-পুরাতন প্রথায়
কুঠার ব্যবহার করতে হয়েছিল।

এ জীবনে কেউ কি কারো বিশ্বস্ততা পেয়েছে ?
নিশ্চয়ই না, এটা শুধু কথার কথা,
বিশ্বস্ততার কাজ কেউ কখনো করেনি।

আমার বন্ধুরা সবাই হয়ে গেল উপদেষ্টা,
হায় এটা কেমন বন্ধুত্ব !
আমার কত ভাল লাগত, যদি কেউ আমায় দেখাত একটু
সহানুভূতি,
যদি কেউ আমায় আমার লক্ষ্য-সাধনে
একটুখানি সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসত !

জীবনের যন্ত্রণাগুলোকে ছোট করে দেখো না,
এর একটা একটা কণিকা— পাথরেরও রক্ত নিঙড়িয়ে
তাকে নিঃশেষ করে দেবার সামর্থ্য রাখে ।

যন্ত্রণা জীবনের আয়ু কেড়ে নেয়,
কিন্তু যার হৃদয় আছে তার আর বাঁচার পথ নেই ।
প্রেমের বেদনা যদি না থাকত
তবে এ জীবন কাটতই বা কেমন ভাবে ?

বসন্ত ঋতু যে শরৎকালের পায়ে পায়ে 'হেনার' মত,
জীবনের স্রোতে চলমান প্রতিটি সুখ রেখে যায় একটি ক্ষত
একটি চিরস্থায়ী যন্ত্রণা ।

গালিব, আমার এই বিপদে কেউ যদি আমার সহায়তা করত,
তবে আমি কতই না কৃতজ্ঞ বোধ করতাম ;
গিঁট যখন খোলার মত নয়,
তখন আমার আঙুল দিয়েও তা করা যেত ।

আমি যন্ত্রণা যখন অনুভবই করি না,
আমি যখন নিঃসাড়, তখন আমার মাথাই কাটা যাক্ না,
তাতে ক্ষতি কি ?
আমার মাথা যদি না কাটা যেত,
তবে ওটা আমার জানুতে নত হয়ে পড়ত।

একটা জল-কণার পরম আনন্দক্ষণ তখনই,
যখন এটা নদী-জলে বিলীন হয়ে যায়।
যন্ত্রণা যখন সীমা ছাড়ায়
তখনই তার অবসান ঘটে।

আমার যা কিছু ছিল প্রেম তা গ্রাস করেছে,
এতে আমি লজ্জিত।
আমার আর কিছুই নেই,
শুধু আছে এক অপূর্ণ ইচ্ছা,
আবার সব কিছু ফিরে পাওয়ার।

জীবন ও যন্ত্রণা এ দুয়েরই একই অর্থ ;
যতক্ষণ বেঁচে থাকা যায়, যন্ত্রণার হাত থেকে পরিত্রাণ
কোথায়।

তুমি কি ঈর্ষার অনলে জ্বলে যাচ্ছ ?
জীবনের পথে বেড়িয়ে পড়,
অনেক কিছু দেখতে পাবে,

অনেকের সাথে হবে চেনা-জানা, মেলা-মেশা,
তখন তোমার চোখ খুলে যাবে
দৃষ্টি হবে উদার।

গালিব, আমার আশঙ্কা এই যে আমার চেষ্টা কখনও
সফল হবে না।

পঙ্গপাল যে শস্যক্ষেত্রের ক্ষতি করতে পারেনি,
বজ্রপাতে সে ক্ষেতের ফসল পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

দিনের বেলা আমার সর্বস্ব চুরি হয়ে গিয়েছিল,
তাই তো আমি রাত্রে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পেরেছিলাম।
চোরকে অতএব ধন্যবাদ দেওয়াই উচিত,
সম্পত্তি পাহারা দেওয়ার দায় থেকে সেই আমাকে মুক্তি
দিয়েছিল।

সরাইখানা থেকে আমাকে জোর করে বের করে দিয়েছে,
এখন যেখানে যাই না কেন, তাতে কি আসে যায়?
হ'ক-না তা মসজিদ, পাঠশালা, এমন-কি একটা মঠ।

আমার দরদী আমাকে অপমানিত করেছে,
আমি তাকে ধিক্কার দিই,
ব্যথা সহ্য করার ক্ষমতা যার নেই,
সে কেমন করে হবে আমার বিশ্বাসের পাত্র।

আমি খাঁচায় বদ্ধ হয়ে আছি।
বন্ধু, বাগানে যে দুর্দৈবের খেলা চলেছিল,

সেটা আমাকে অসঙ্কোচে বলতে পারো ;
গত কাল বাগিচায় যে বাজ পড়েছিল
সে তো আমার খাঁচায় পড়েনি।

যেখানে কেউ কোথাও নেই এমনি কোনো স্থানে
আমি যেন চলে যাই, যেন সেখানেই বাস করতে পারি,
কথা বলার লোক সেখানে নেই, কারো সঙ্গে তর্কাতর্কিও
হবে না।

একটা কাজ করতে হবে অবশ্য,
একটা বাড়ী বানাতে হবে, সে বাড়ীর
দরজা এমন-কি দেওয়ালও থাকবে না।
কোন প্রতিবাসী সেখানে থাকবে না,
থাকবে না আমার বাড়ীর ফটকে
কোনো দ্বার-রক্ষী।
যদি আমার সেখানে অসুখ করে, আমাকে দেখারও কেউ
থাকবে না ;
আর যদি মরেই যাই, কেউ থাকবে না শোক-করার।

জ্ঞানীরা বলেন যে, প্রতিটি শ্বাস আমরা গ্রহণ করি,
তা উত্তাপের সৃষ্টি করে এবং সেই উত্তাপ একদিন
শরীরকে গ্রাস করে নেয়।
আমার বড় দুঃখ এই যে আমার অন্তরের এই তাপ
অপ্রচুর।

এই তাপ আমাকে নিঃশেষ করতে পারছে না।
আমার যন্ত্রণার তাই আর শেষ নেই।
শরৎকাল ? অথবা বসন্তকালের কথা বলছ ?
ঋতু যাই হোক-না কেন,
আমার দশা সেই একই থাকবে,
সেই একই খাঁচায় বদ্ধ হয়ে আছি ;
আকাশের দিকে তাকিয়ে
নিজের অসহায়তার কথা ভাবতে ভাবতেই আমার দিন
কাটে।

সময় সময় আমারই ইচ্ছে করে
এই পৃথিবীকে বলি, ওহে কৃপণের শিরোমণি,
তোমার ভেতরে যে সব বহুমূল্য ধন-রত্ন রক্ষিত ছিল,
সেগুলি নিয়ে তুমি কি করলে ?

কেউ বাজে কথা বললে কান দিয়ো না,
কেউ যদি কোন অন্যায় করে, তার উল্লেখ কোরো না।

কেউ যদি বিপথে যায়, তার পথ রোধ করো।
কেউ যদি কোন ভুল করে, তাকে ক্ষমা করো।

বাসনা-হীন মানুষ কি এ পৃথিবীতে কেউ আছে ?
তা হলে ভেবে দেখতে হবে, সকলের সব ইচ্ছা কি করে
পূর্ণ হবে।

আমার নিজের এমন বাসনার সংখ্যা হাজার হাজার,
এই বাসনাগুলির মধ্যে প্রত্যেকটিরই চরিতার্থতার জন্য
জীবন- বিসর্জন ও সার্থক।
এর মধ্যে বহু বাসনাই আমার চরিতার্থ হয়েছিল,
তবুও এমন অনেক থেকে গেল— যেগুলির নাগাল
পেলাম না।

নিপুণ তীরন্দাজ নই, ওত পেতে থাকা শিকারীও নই,
আমার খাঁচার এক কোণে আমি তাই বেশ শান্তিতেই আছি

মানুষ

ঈশ্বরের মহিমার স্ফুরণ মানুষের উপর হওয়াই উচিত ছিল,
সিনাই পর্বতের উপর নয়।
কে কতটুকু পান করতে পারবে সেটা হিসেব করেই তো
সুরার পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়।

আমি তো একটি জলকণা মাত্র,
কিন্তু এই জলকণাই তো আসলে নদী।
বৃথা-গর্বী-মনসুরের মত আমি অবশ্যই
নিজেকে নদীর সঙ্গে তুলনা করি না।

তিনি আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমাকে দুটি জীবন
দিয়েছেন।
আমি প্রতিবাদ করি নি। দরদস্তুর করার মত ঔদ্ধত্য
আমার নেই।

সভাগৃহে জ্বলে জ্বলে ক্ষয়ে যাওয়া মোমবাতির সমব্যথী
অনেকেই থাকে।
কিন্তু তারা কিছুই করতে পারে না।
দুঃখে বেদনায় তার জীবন জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছিল,
কিন্তু তার দরদীরা তাকে কিই বা সাহায্য দিতে পারত।

সকলের কথা বোলো না, খুব কম লোকেই শেষ পর্যন্ত
নানা রকমের ফুল, এমন-কি
গোলাপ হয়ে ফুটে উঠতে পারে।
কবরের নীচে যাদের স্থান, তারাও কত শত সুন্দরভাবে ফুটে
উঠতে পারত।

বন্ধুজনেব মজলিসখানাকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলতে
একদা আমরাও জানতাম।
কিন্তু এই যে জানা, তা এখন বিস্মৃতিরূপ তাকের উপর
শোভ-মান রয়েছে,
অর্থাৎ সবই এখন ভুলে গিয়েছি।

বড় কিছু করার কত সুবর্ণ সুযোগ জীবনে এসেছিল,
এ সুযোগ যে হারিয়েছে— সে এ ব্যথা ভুলবে কেমন করে ?
হয়তো এই মূল্যবান মুহূর্তগুলিতে গভীর প্রার্থনায় তার
কেটেছিল।

তবু তার এ দুঃখ মুছে যাবার নয়।

পার্থিব সমস্যায় আমি যতই জড়িয়ে পড়ছি
আমার সত্য স্বরূপকে বুঝে নেওয়া ততই শক্ত হয়ে পড়ছে।

জীবন-দর্শন

জীবনের মূলেই রয়েছে ধ্বংসের বীজ,
ভাল করে দেখে রাখো, কৃষকের কপালের ঘাম
একদিন বজ্রাগ্নির রূপ নেবে,
তার ফসল পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

গভীরভাবে ভালবাসা আবার নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার
স্বাভাবিক প্রবৃত্তি,
এই দুইয়েরই সহাবস্থানের চেষ্টা বা কল্পনা— এটা মূর্খতা
মাত্র।

বজ্রাগ্নির উপাসনা যে করে সে তো তার আগুনে সর্বস্ব
নিশ্চিতই খোয়াবে,
তখন আর হায় হায় করে কি লাভ।

সৌন্দর্যের ধ্যান, সে তো একটি সৎ কাজ
(আমি তো জীবনে তাই করে এসেছি)।
তাই তো আমার কবরের নীচে থেকে বেহেস্তের
দুয়ার খুলে গেছে।

জেনে রেখো, যে কাজ করা খুব সোজা বলে মনে হয়,
সে কাজ করে ওঠা খুবই কঠিন।
এমনই দুঃসাধ্য যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছে করলেই 'মানুষ' হয়ে
উঠতে পারে না।

কোন এক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অক্লান্ত কাজের প্রেরণা
দিয়ে থাকে
মানুষেরই উচ্চাশা।
মৃত্যু যদি না থাকত,
তবে মানুষের জীবনের আকর্ষণ সবই লোপ পেয়ে যেত।

প্রতি জলকণাই দাবি করতে পারে : "আমিই সমুদ্র"
একজন যখন অন্যের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে,
সত্যিই তার আর পৃথক সত্তা কিছুই থাকে না।

একটি জলকণা থেকেই আন্দাজ করা উচিত,
নদীর গভীরতা কতখানি।
একটু টুকরো থেকেই আসে সমগ্রের বোধ।
যদি তা না হয়, তবে বুঝতে হবে,
দৃষ্টির অভাব, সবটাই অবোধ শিশুর খেলার মত।

তিনি যে জীবন আমায় অনুগ্রহ করে দিয়েছিলেন,
সে জীবন আমি ত্যাগ করেছি।
এই যে দিয়েছি, এটা কি সত্যিই দান ?
স্বর্গের ঋণ আমি তো শোধ করতে পারি নি।

যত সাহসের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়া যায়
সাফল্যও আসে ঠিক সেই মাপে।
যে অশ্রু-বিন্দু মোতিতে পরিণত হবার চেষ্টা করেনি,
সে তো জলকণাই থেকে যাবে।

মানুষের মন লক্ষ লক্ষ চিন্তার খেলার মাঠ,
নির্জনতা তাই আমার কাছে মনে হয়,
কলরব-মুখর বন্ধু-গোষ্ঠীর মেলা।

দিবারাত্রি ধরে চলেছে সাতটি তারার আবর্তন,
কিছু-না-কিছু তো ঘটবেই, এতে ভাবনার কি আছে ?

সারা জীবন ধরেই তো আমি মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেছি।
মৃত্যু যখন সত্যিই আসবে, তখন আমার ভাগ্যে কি ঘটবে,
তা কি আমি জানি ?

প্রতি জলস্রোতের নীচে বিস্তারিত রয়েছে
হাজার হাজার ক্ষুধার্ত কুম্ভীরের করাল-গ্রাস।
একটি জলবিন্দুকে মুক্তায় পরিণত হতে হলে বাধা কত দুস্তর,
তা কি কেউ জানে ?

জীবনের দৈর্ঘ্য, সে তো চক্ষুর নিমেষ ;
পানোৎসবে যারা যোগ দেয়,
তাদের হুল্লোড় চলে শুধু ততক্ষণ
যতক্ষণ পর্যন্ত না কাঁপতে কাঁপতে
নিভে যায় মোমবাতির আলোক-মালা।

আসাদ ! জীবনের যন্ত্রণার কোন প্রতিকার নেই
যতক্ষণ পর্যন্ত না মৃত্যু এসে পড়ে ;
সর্ব ঋতুতেই বাতিগুলিকে জ্বলতে হয়,
সূর্যোদয়ের পূর্বকাল অবধি।

সে যদি আমার প্রতি একনিষ্ঠ থেকে থাকে,
লোকে বলবে এটা নিষ্ঠুরতা।
ভাল লোককে মন্দ বলে চিহ্নিত করা,
এটাই হল সাধারণ রীতি।

জীবনের ঘোড়া লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে চলে,
কোথায় যে তা থামবে, কেউই বলতে পারে না।
শক্ত মুঠোয় লাগাম আমরা ধরতে ঠিক পারি না,
আমাদের পা'ও ঠিক পা-দানির উপর রাখা যায় না।

বোঝার ক্ষমতা আছে এমন মনের কাছে,
সমস্যার ঝঞ্ঝাবাত যেন পাঠশালার মত।
ঝড়ের এক-একটা কশাঘাতের সঙ্গে গুরুমশায়ের সস্নেহ
বেত্রাঘাতের তুলনা দেওয়া যেতে পারে।

যন্ত্রণায় অভ্যস্ত হয়ে পড়লে, যন্ত্রণাবোধ চলে যায় ;
আমি জীবনে এতই কষ্ট পেয়েছি,
যে এদের সামলানো আমার পক্ষে সহজ হয়ে উঠেছে

কারো কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষা নিলে,
তোমার নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা নষ্ট হয়ে যাবে,
সংসারের কাছে অতএব ঋণী না থাকাই সংগত,
আত্ম-তুষ্টির মনোভাব নিয়ে চলতে শেখো।

এই সংসারে 'টিউলিপ' ফুল ফোটে,
নিজের অভ্যন্তরে একটা দুষ্ট-ক্ষত নিয়ে,
এই ক্ষতই তাকে নিঃশেষ করে।
এমনি ভাবেই কৃষকের আপন শরীরের স্বেদ
বিদ্যুৎ-বহ্নিতে রূপান্তরিত হয়ে
তার উৎপাদিত ফসল পুড়িয়ে ছাই করে দেয়।

একটি জলবিন্দু নদী জলে মিশে, নদী হয়ে যায়।
"যার শেষ ভালো তার সব ভালো"।

বাড়ীতে কলরব ধ্বনিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন,
বেশ কিছু লোক-জনের সমাবেশ,
যদি উৎসব সংগীতের অবকাশ না থাকে
শোকসংগীতও গৃহ মুখরিত করতে পারে।

এই পৃথিবীর সমৃদ্ধি থেকে বোঝা যায়,
অনেক শক্তিমান ও দুঃসাহসী ব্যক্তির এখানে জন্মানো
বাকী আছে।

সরাইখানার পানপাত্রগুলি যদি সুরাপূর্ণই থেকে যায়
তবে এটাই বোঝা যায়, যে এই পান্থশালায় বেশী লোকের
যাতায়াত নেই।

চিরাচরিত ঐতিহ্যের অন্ধ-অনুসরণকারী,
জগতের বুদ্ধিজীবী সমাজ কিসের জন্য গর্ব করতে পারে ?

গালিব, অন্তিম বিনাশের পথ আমার চিন্তায় চিরজাগরূক,
জীবনের ঢিলে-ঢালা পাতাগুলো একত্রে বেঁধে রাখতে
এই চেতনার বিশেষ প্রয়োজন।

প্রেম

তুমি বলছ, আমার যে মন তুমি কুড়িয়ে পেয়েছ
তা আর ফিরে দেবে না।
আর ছলনার প্রয়োজন কি। তুমি হদিশ দিয়েছ অবশ্যই।
হৃদয় আমার অনেক আগেই খোয়া গিয়েছিল,
এখন জানা গেল, কার কাছে সেটা বাঁধা রয়েছে।

প্রেম থেকেই আমি জীবনের স্বাদ পেলাম।
সব ব্যথার ওষুধ তো পেলাম, কিন্তু প্রেমের ব্যথার ওষুধ
যে নেই।

আমার প্রেমিকা সরলা অথচ দুষ্টুমিও বেশ জানে
ভুলো-মন আবার হুঁশিয়ারও কম নয়।
তার আপাত-ঔদাসীন্য কাজে কাজেই আমাকে দুঃসাহসী
করে তোলে।

গোলাপের সুরভি, বিষাদের বেদনা অথবা বাতির ধোঁয়া
যা নিয়েই হোক্-না, তোমার মঞ্জিল থেকে যেই চলে এসেছে,
সেই ফিরেছে গভীর-বেদনা নিয়ে।

প্রিয়তমার অবহেলার যন্ত্রণা আমি এড়াতে চেয়েছিলাম,
তার প্রতি আমার একনিষ্ঠতার ত্রুটি অবশ্যই ছিল না;
কিন্তু এতই সে নিষ্ঠুরা যে সে আমাকে মরতেও দেয় নি।

নবোদিত সূর্যরশ্মি যেভাবে প্রভাতকালে তৃণশীর্ষের শিশির-
বিন্দুতে প্রতিবিম্বিত হয়,
তোমার অস্তিত্ব তেমনি ভাবেই আমার হৃদয়-দর্পণে
প্রতিফলিত হয়েছিল।

গালিব, আমার হৃদয় ছিল জ্ঞানের রত্নভাণ্ডার,
বিচ্ছেদের যন্ত্রণা আমার সেই হৃদয়কে বিদীর্ণ করে দিয়েছে।

প্রিয়তমার জন্য আমার ব্যাকুলতাকে ধিক্কার,
বার বার সেই পাগলামি আমাকে তার বাড়ীর দিকে টেনে
নিয়ে যায়,
এতে আমার যন্ত্রণা আরও বেড়ে যায়।

আমার শিরশ্ছেদ করার পর তার নিষ্ঠুরতায় ছেদ পড়ে।
চমৎকার! খুব তাড়াতাড়িই তার মনে অনুতাপ জেগেছিল।

আমার প্রতি তোমার এই অবহেলা,
সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে।
আমার বেদনার কাহিনী দীর্ঘকাল ধরে শুধু বলেই যেতে
থাকি,
তুমি মন দিয়ে শোনোও না। একবার হয়তো অন্যমনস্ক
ভাবে শুধাও—
"কি বলছ"?

ঈশ্বর যদি আমাকে বন্দী করে থাকেন,
তবে তাই ভাল, তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হোক।
কিন্তু তিনি কি এই বিশ্বাস পোষণ করে থাকেন—
যে তাঁর আমাকে এই বেকায়দায় ফেলা,
প্রিয়তমার প্রতি আমার মুগ্ধতার অবসান ঘটাবে?

প্রিয়তমার সঙ্গে আমার মিলন— এটা ভাগ্যের অভিপ্রেত
ছিল না।
আমি যদি দীর্ঘদিন বাঁচতাম, তবে আজও আমি তার
অপেক্ষা করতাম।

তোমার বক্রিম কটাক্ষ লাভের আনন্দ ভাষায় প্রকাশের
অতীত,
অলজ্জিতা হয়ে সোজাসুজি আমার দিকে তাকাতে যদি,
আমি বুঝে নিতাম, আমার আর কোন আশা নেই।

গালিব, আমার প্রিয়তমা সর্বরূপেই আনন্দ-দায়িনী,
তার কথা, একটু ইশারা অথবা যে-কোন ভঙ্গিমা, সবই
আনন্দের উৎস।

আমার প্রেম-ব্যাধি কোন প্রতিষেধকের সাহায্য নেয় নি,
কাজেই এটা সারবার মত রোগ নয়, তা মন্দ কি!

অত্যাচারী সময়ের শিকার হয়েছিলাম, এটা সত্যি,
তবে এমন সময় কখনও ছিল না, যখন তোমার চিন্তা
থেকে মুক্ত ছিলাম।

বিরোধ ছিল বলেই তো ধরে নিতে হবে পরস্পরের মধ্যে
একটা সম্বন্ধের অভাব ছিল না।
যখন এক দিক থাকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় উদাসীন তখন
অপর জন প্রতারিত হতে পারে না।

যেহেতু আমি কানে শুনি কম, আমার দ্বিবিধ আব্‌দার
তোমায় সহ্য করতে হবে।
দুবার করে না বললে কোন কথাই আমি যে বুঝে উঠতে
পারি না।

প্রিয়তমার প্রেমের জন্য হা-হুতাশ করতে করতে হয়তো
জীবনই কেটে যাবে,
তখন হয়তো কিছু ফল লাভ হতে পারে ;
তোমার কেশ-দামের পূর্ণ দৈর্ঘ্যলাভ পর্যন্ত
কে বল অপেক্ষা-রত থাকবে ?

আমি মেনে নিলাম যে তুমি আমাকে একদিন কাছে ডাকবে,
কিন্তু তোমার আহ্বানের অবসর যখন আসবে,
তার আগেই তো আমি ফুরিয়ে যাব।

কত কত রাত্রি ধরে আমি প্রিয়া-মিলনে বঞ্চিত রয়েছি,
তার হিসেব যখন করতে বসি
সব ভুলে যাই। জানি না কতদিন কাটল জীবনরূপ এই
মরুভূমিতে।

আমার চিঠি নিয়ে যে পত্রবাহক প্রিয়ার কাছে গিয়েছে,
জবাব সহ তার ফিরে আসার আগেই আর একটা চিঠি
লিখতে হবে,
আমার আগের চিঠির কি জবাব আসবে তা তো
জানাই আছে।

মজলিসে আমার কাছে পান-পাত্র তো কখনও পৌঁছায়নি।
ভাগ্যক্রমে আজই পৌঁছালো। আমার ভয় এই যে
'সাকী' এর সঙ্গে আরও কিছু মিশিয়ে দিয়েছে।

একটা চোরা কটাক্ষের দাম হাজার প্রেম-কলার চেয়ে বেশী,
হাজার রকম সাজগোজের চেয়ে প্রিয়ার রোষ অনেক
বেশী উপভোগ্য।

বেকুফেরাই কামনাকে মনে করে পূজা!
কী লজ্জা, আমি কি নিষ্ঠুরা হৃদয়হীনা স্ত্রীলোকরূপী এই
মাটির পুতুলের পূজক!

কান্না আর কিছু নয়, এটা যেন বলতে চায় আবেদনের সুরে,
'ওগো নিষ্ঠুরা— দয়া কর'।
বিনা প্রতিবাদে যদি আমি এমনি কেঁদেই চলি,
তবে তোমার নিষ্ঠুরতাকেই প্রশ্রয়ই দেওয়া হবে।

ঈশ্বরের কি মহিমা, সে আমার বাড়ীতে এসেছিল।
আমি কিছুক্ষণ তাকিয়েছিলাম তার দিকে পলকহীন চোখে,
আবার তাকিয়েছিলাম আমার এই দীন-কুটিরটির দিকে।

প্রতিযোগীর প্রতি সকলেই ঘৃণা পোষণ করে।
কিন্তু আশ্চর্য, জুলেখা মিশরী রমণীদের প্রতি
কোন বিদ্বেষ প্রকাশ করেন নি। তিনি খুশী হয়েছিলেন,
যে ঐ রমণীরাও তাঁরই মত কন্‌আনের চাঁদ ইউসুফের
প্রেমে বদ্ধ হয়েছে।

তোমার কেশ-পাশ যার বাহুর উপর লুটিয়ে পড়েছিল
(হে সুন্দরি),
তার নিদ্রা কত মধুর হয়েছিল, তার ভাগ্য কত প্রসন্ন ছিল,
রাত্রিটি তাকে কত সুখেরই না অধিকারী করেছিল।

প্রেমহীন জীবন যাপন সম্ভব নয়,
আবার আমার অবস্থা এতই কাহিল, যে আমার আর
প্রেমের জ্বালা
সহ্য করার শক্তিও নেই।

ধর্মভীরু যে, প্রেমে যে একনিষ্ঠতার দাবি করে,
সেই পুরুষ কেন এমন রমণীর ছায়া মাড়ায়—
যে ধর্মভীরু বা এক-নিষ্ঠা নয় ?

আমি বলছি না যে তোমার ভালবাসা কেবল আমাতেই
নিবদ্ধ থাকবে।
তবে তুমি অখুশী হলেও আমি এই চাই
তোমার শিকার যেন আমিই হতে পারি, আর কেউ না।

আমার ক্ষোভ এই যে তুমি আমার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীর
কথা ভেবে
আমার কাছে তার প্রসঙ্গ উঠিয়েছিলে।
তার প্রতি তোমার অবজ্ঞাই প্রকাশ পেয়েছিল,
কিন্তু এ প্রসঙ্গের অবতারণাই বা কেন ?

তুমি আমাকে অবজ্ঞা করতে চাও কর। কিন্তু তোমার সঙ্গে
আমার পুনর্মিলনের আশা,
একেবারে নষ্ট হতে দিয়ো না।
তোমার ঐ নিরুত্তাপ দৃষ্টি আমার কাছে যেন বিষের মত
বোধ হচ্ছে।

যখন প্রেমে পড়েছিলে, তখন আর চেঁচামেচি, কান্নাকাটি
কেন ?
তোমার হৃদয়ই যখন ভেঙেছে, তখন তোমার রসনাও
নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়া উচিত।

সে যখন তার চড়া মেজাজ ছাড়তে চায় না, তখন আমিই বা
আমার স্বভাব বদলাব কেন ?
"ওগো, তুমি আমার উপর রুষ্ট হয়েছ কেন" ? এমনি
ভাবে তার সঙ্গে কথা বলে
আমি নিজেকে ছোট করতে পারব না।

একি বিশ্বস্ততা ? ভালবাসাই বা কোথায় ?
আমার মাথাই যদি ভাঙে
তোমার দুয়ার-প্রান্তে, হে নিদয়ে !

হায় বন্ধু, আমার এত কান্নাকাটি না করাই ভাল ছিল।
আমি তো জানতাম না যে এই কান্নাকাটি হা-হুতাশ,
আমার যন্ত্রণা আরও বাড়িয়ে দেবে।

গালিব, আমি চাইছি প্রিয়ার সঙ্গে দেখা করে তাকে জানাই
তার সঙ্গ-চ্যুতি আমার মনে কি দুঃসহ ব্যথার সৃষ্টি করেছে।
হায়, সে দিন যেন আসে, যেদিন আমার সৌভাগ্য হবে
প্রিয়ার কাছে যাওয়ার আর এ কথা বলার
যে আমি তার সঙ্গে মিলন চাই, আর তার বিচ্ছেদ কত
মর্মান্তিক !

গালিব, আমরা নিশ্চয়ই তোমার প্রিয়াকে জানাব
তোমার বিচ্ছেদ-বেদনার যন্ত্রণার কথা।
কিন্তু সে তোমাকে কাছে ডাকবে কিনা
তা আমরা বলতে পারব না।

আমাকে মনে করিয়ে দিয়ো না, এক কালে তুমি আমাকে
বলতে
"তুমিই আমার জিন্দ্‌গী"।
এখন আমি বেঁচে থাকা বা 'জিন্দগী'তেই
অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি।

ঈশ্বরের দোহাই, আমার সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ো না
আমার সঙ্গে ভালবাসায় সম্পর্ক না রাখতে পার,
বিরাগটা অন্ততঃ বজায় রেখো।

তুমি বলতে চাইছ যে আমার দুশমন তোমার প্রণয়াসক্ত,
হোক তা।
কিন্তু তাই বলে তোমার ঔদাসীন্য কেন সহ্য করব,
কেনই বা তোমার প্রতি একনিষ্ঠ থাকব ?
আমি এত নির্বোধ নই।

তার দেখা পাওয়ার একটা সুযোগ পেয়েছি,
এই সৌভাগ্যে আমি নিজেই নিজেকে ঈর্ষা করছি।
তাকে দেখার সৌভাগ্য হবে, এই সুখ যেন অসহ্য।
হায় কত দুর্ভাগা আমি।

তোমার চিন্তার গভীরতা, তোমার হৃদয় শুষে নেবে
খুবই শীঘ্র,
তীব্র মদিরা তার আধারকেও গলিয়ে দেবার শক্তি রাখে।

তার প্রতি আমার যে প্রেম সেটা 'আমি তার পরোয়া
করি না,'
—এমনি একটি মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে রাখি।
সে যখন সামনে আসে তখন আমি যেন কি রকম হয়ে পড়ি।
প্রিয়ার চতুর-চোখে সত্য ব্যাপারটা ধরা পড়ে যায়।

আমার নয়নানন্দদায়িনীকে দেখতে পেলেই আমি খুশী,
আর আমি কিছুই চাই না।

আমার সন্দেহ আছে— বেহেস্তের হুরীদের মধ্যেও
তোমার মত অতুলনীয়া সুন্দরী কেউ আছে কিনা।

আমি মরে গেলে তোমার বাড়ী যাবার রাস্তায়,
আমাকে কবর দিও না।
কারণ সেটাই হয়ে উঠবে পথিকদের পক্ষে
তোমার বাড়ীতে পৌঁছানোর নিশানা।

ওগো, প্রিয়ার বাড়ীর গলিতে তোমরা যারা বাস করো,
নিশ্চয়ই তোমরা জানো প্রিয়ার বাস-গৃহ কোনখানে ;
দয়া করে একটু চোখ রেখো,
পাড়ায় যদি তোমরা ভ্রাম্যমাণ বেচারা গালিবকে দেখতে
পাও।

আমার সুপ্ত কামনার যন্ত্রণা আমাকে যে দহন-জ্বালা দিচ্ছে,
নরকাগ্নিও তা দিতে পারত না।

তার চড়া-মেজাজের অভিজ্ঞতা আমার আগেও হয়েছে,
তবে দেখছি, এখন তার যে কোপনতা প্রকাশ পেল,
তা আরও ভয়ংকর।

প্রিয়া মিলনের শুভ-সন্দেশ পাচ্ছি না,
তার রূপ এক নজর দেখতেও পাওয়া যাচ্ছে না।
বহু দিন থেকে আমার চোখ আর কান
দুই-ই অচরিতার্থ।

চাঁদ যখন ষোলো-কলায় পূর্ণ, তখনই তার সৌন্দর্যের
পরাকাষ্ঠা,
এতে সন্দেহ নেই।
তবে, আমার চন্দ্র-মুখী প্রিয়তমা যখন সূর্যপ্রভার মত
ঝল্‌মল্ করে
তখন তাকে আরও বেশী চমৎকারিণী মনে হয়।

প্রিয়তমাকে দেখেই আমি খুশীতে ঝল্‌মল্ করে উঠি,
আর আশ্চর্য এই যে, সে ভাবে শুধু আমার স্বাস্থ্য ভাল
হয়েছে।

তুমি যদি ভেবে থাক,
আমার মৃত্যুবরণ আমার ভালবাসার সর্বোচ্চ প্রমাণ নয়,
তবে তাতে কিছু যায় আসে না।
তুমি যদি আরও পরীক্ষা করতে চাও,
তা করতে পার। এটার কথা ভুলে যাও।

প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে 'রাখ্-ঢাক্' আর সংযমই যদি
থাকে,
তবে আর 'মিলন' কোথা? এটা তো বিচ্ছেদের চেয়ে
মন্দ কম নয়।
উপভোগ তখনই চরম, যখন নিজেই বেশ কিছু এগিয়ে
আসে নায়িকা,
আর নায়ক হয়ে ওঠে বেশ একটু উদ্দাম ও চঞ্চল।

একদিন নিশ্চয়ই তাকে আমি চুম্বন করতে পারব।
এর জন্য চাই তীব্র-বাসনা আর বেপরোয়া দুঃসাহস।

খুব সম্ভব প্রিয়া স্বপ্নের মধ্যে আমায় সান্ত্বনা দিতে আসবে।
কিন্তু তার আগে আমার চিত্তজ্বালা শান্ত হয়ে ঘুম আসা
প্রয়োজন।

সে যদি আমার প্রিয়ার প্রেমে পড়ে গিয়ে থাকে,
তবে তাকে দোষ দেওয়া যায় না, এটাই স্বাভাবিক।
সে আমার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে গিয়েছে,
যদিও তাকেই আমি পাঠিয়েছিলাম প্রিয়ার কাছে
আমার বার্তাবহ রূপে। সে তাই থেকে যাক্-না কেন।

প্রণয়ের ব্যাপারে জীবন-মৃত্যুর ভেদ খুবই কম,
যার জন্য প্রাণটা যেন বেরিয়ে যায়,
তার সঙ্গে মিলনেই আবার যেন বেঁচে উঠি।

আত্ম-বিষয়ক

কফিন-বিহীন এই লাশ গালিবের,
ঈশ্বর তাকে কৃপা করুন, তার মধ্যে তো ধার্মিকতা ছিল না।

চুপ করে থাকি বটে, তবে বহু অচরিতার্থ বাসনা আমার
মনের মধ্যে চাপা আছে,
আমি যেন একটা অন্ধকার কবরখানায় নির্বাপিত মোমবাতি।

আমার দুঃখ দুর্দশায় বন্ধুর যে সহানুভূতি,
আমাকে বাঁচিয়ে তুলতে চায়, তা কি কাজে আসে ?
আমার ক্ষতগুলি যতক্ষণে সেরে ওঠার অবস্থায় আসে,
তারই মধ্যে আমার হাতের নখগুলি বেড়ে ওঠে,
আর তাদের কাজে লাগিয়ে আবার আমি নূতন ক্ষতের
সৃষ্টি করে ফেলি।

পরমেশ্বর যদি আমাকে দেখা করতে ডাকেন,
তবে সেই আহ্বানকে আমি অবশ্যই 'স্বাগত' জানাব।
কিন্তু আমাকে কি কেউ বলে দেবে,
আমাকে কি উপদেশ দেওয়ার ইচ্ছা তার আছে ?

তুমি আমার সঙ্গে দেখা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে,
তবু আজও আমি বেঁচে আছি ;
কারণ তোমার সেই প্রতিশ্রুতি আমি বিশ্বাস করি নি।
যদি বিশ্বাস করতাম তবে সেই প্রতিশ্রুতির আনন্দেই
আমার মৃত্যু হত।

তুমি কি সুন্দর রহস্যবিত্তার ব্যাখ্যান কর, গালিব !
হায়, তুমি যদি মত্তপ না হতে,
তবে তোমাকে আমরা সাধু-সন্ত বলেই মেনে নিতাম।

আমি অবশ্যই ঈশ্বরের সৃষ্ট,
তবু আমি নিজেকে স্বাধীন ভাবি।

আমার আত্ম-সম্মান বোধ এত প্রখর,
যে স্বর্গের দরজা আমার জন্য যদি নিজেই না খুলে যায়,
তবে সেখান থেকে আমি নির্দ্বিধায় ফিরে চলে আসব।

গালিব তো অনেকদিন গত হয়েছেন,
তবু আমরা তাঁর বাণী যখন তখন স্মরণ করি,
বলি— তিনি হলে, এ বিষয়ে কি বলতেন।

উর্দু শায়রীর তুমিই একমাত্র ওস্তাদ নও, গালিব!
সকলেই বলে অতীতেও একজন ছিলেন, তাঁর নাম মীর।

আমার মুখে প্রিয়ার রূপের ব্যাখ্যান শুনে,
যে ছিল আমার বিশ্বাসী বন্ধু, সে হয়ে গেল আমার
প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী।

আকাশের উচ্চতম স্থল 'অরস,'
তারই এদিকে হায়, যদি কিছু জায়গা পাওয়া যেত
তবে সেখানে আমি একটা নিরীক্ষা-ঘর বানাতাম
আরও উঁচুতে।

আমি কখনও জ্ঞানী ছিলাম না, কোন বিষয়কর্মেও পটু
ছিলাম না,
তবে বিনা কারণে, ভাগ্য আমার উপর এত বিরূপ হয়ে
উঠল কেন?

ওরা জিজ্ঞাসা করে গালিব কে ?
আমাকে কেউ কি বাৎলে দেবে, ওদের কী জবাব দেওয়া
যেতে পারে ?

মোমবাতি যখন নিভে যায়, তখন ধোঁয়া ওঠে,
আমার মৃত্যুর পর, প্রণয়িনীর শোকের চিহ্ন তাই কালো
পোষাক।

"প্রেমের সর্বগ্রাসী সুরা পান করার সাহস কার আছে,
কে আসবে এগিয়ে ?"
আমার মৃত্যুর পরে, আমার সাকীর কণ্ঠেও এই আওয়াজ
ধ্বনিত হবে।

আমি এখন কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছি,
আর প্রিয়া বলতে চাইছে,
'ও কী চায় না জানালে, আমি ওর মনের কথা কি করে
বুঝব ?'

যদিও জান তোমার অনুরোধ মানা হবে
তবুও কিছু চেয়ো না।
যদি কিছু চাইতেই হয় তবে কামনা-শূন্য হৃদয়ের প্রার্থনা
জানিও।

কত শত বাসনা আমার নিষ্ফল হয়ে গিয়েছে
সে সব কথা মনে পড়ে যায়। হে ঈশ্বর, তোমার দোহাই,
আমার পাপের ফিরিস্তি চেয়ে বোসো না।

আমার ভাগ্য ঘুমিয়েই থাকে,
তার কাছ থেকে আমি শুধু একটিমাত্র সুখস্বপ্ন ধার
চাইছি ;
গালিব, এই ঋণটিই বা আমি শোধ করব কি করে ?

পৃথিবীর সবাই আমার আদর্শ অনুসরণ করবে
এমনি ভাবা বাতুলতা মাত্র।
যেখানে যা কিছু ভাল আছে
তা সকলেরই চিত্ত জয় করবে
এটা কি কখনও সম্ভব হয় ?

হায় ভগবান, সংসার কেন আমার অস্তিত্ব মুছে ফেলতে
চাইছে ?
জীবনের পাতায় আমি তো দুবার লেখা অনাবশ্যক শব্দ
নই।

আমার হৃদয় রক্ত-মাংস দিয়ে গড়া,
এটা তো ইঁট অথবা প্রস্তরখণ্ড নয়।
আমার যখন খুশী তখন আমি কাঁদব,
কেউ যেন তখন আমাকে উপহাস না করে।

এটা মন্দির নয়, মসজিদ নয়, সাধুসন্তের মকবরাও নয়,
আমি একটা রাজপথে বসে বিশ্রাম নিচ্ছি,
আমাকে এখান থেকে কোনো লোক কেন তাড়িয়ে দেবে ?

বড় ঘরে তার জন্ম, তার উপর সে সুন্দরী, কাজেই তার
স্বভাব উদ্ধত।

এদিকে আমার আত্ম-মর্যাদা জ্ঞানও বেশ টনটনে,
সকলের সামনে তার কাছে ঘেঁষা মুস্কিল,
আবার সেও তার কাছে আমাকে ডেকে নেবে না!

আমার দুঃখ দুর্দশায় উপেক্ষা যদি তোমার স্বভাবে দাঁড়ায়,
এই অবস্থা কেমন করে মেনে নেওয়া যায় তা আমাকে
আস্তে আস্তে
শিখে নিতে হবে।

এ সংসারে হাতের কাছে যা পাওয়ার সম্ভাবনা
এবং পরলোকে যা পাওয়া যেতে পারে, দুই-ই লোভনীয়;
আমার আত্ম-মর্যাদা বোধ আমাকে রক্ষা করেছে,
আমি দুটোই নিতে অস্বীকার করেছি।

আমার অন্তর্দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা আমাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে,
এর হাত থেকে কিছু কালের জন্যও যদি মুক্তি পেতাম
তবে দেখিয়ে দিতাম, মজনুর কীর্তি কতই অসার।

নিজের প্রতি

গালিব, আমি জীবনের ঝড়-ঝাপ্টা সবই তো পার হয়ে
এসেছি,
এখন আমি শুধু আকস্মিক মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আছি।

গালিব, কি দুঃখময় জীবনই-না আমি যাপন করেছি,
কোন্ স্মৃতি আমি বহন করে বেড়াব : আমাকে দেখার জন্য
ঈশ্বর কি ছিলেন না ?

বসন্ত-ঋতুর আমন্ত্রণে বহুদিন যথোচিত সাড়া দিই নি,
এখন সময় এসেছে প্রার্থনা-কারীর পোষাক আর আসন
বন্ধক দিয়ে
সুরার সাহচর্য।

এমন কি কেউ আছে যে গালিবকে চেনে না ?
সে তো একজন ভাল শায়র, তবে ওর অনেক বদনাম।

বসন্ত ঋতু

এত রঙের মেলা নিয়ে বসন্তকালের সমাগম হয়েছে,
যে তার শোভা-দর্শন-কারীর মধ্যে আছে চন্দ্র ও সূর্য পর্যন্ত।

হে পৃথিবীবাসিগণ, দেখ দেখ দেখ
সংসারের কী বিচিত্র অঙ্গ-রাগ।

ধরিত্রীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সবুজের কী
শোভা,
নীলাকাশের গম্বুজ এই শোভার কাছে হার মেনে যায়।

সবুজ আর কোথাও বসার জায়গা না পেয়ে
জলের উপর শেওলার রূপ নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল।

নার্সিসাসের চোখ শুধু
সবুজের শোভা ও পুষ্পের সমারোহ দেখার জন্যই।

বাতাস যেন নেশার আমেজে ভরপুর,
নিঃশ্বাস টানলেও যেন নেশা লাগে।

ইচ্ছা-পত্র

পার্থিব স্ফূর্তির আকাঙ্ক্ষা পূরণের অভিলাষী হে নবাগতের
দল,
সুরা ও সংগীতে যদি তোমাদের আসক্তি থাকে, তবে
সাবধান হও।

যদি তোমাদের দেখে শেখার মত চোখ থাকে, আমাকে দেখ,
উপদেশ শোনার মত কান যদি থাকে, তবে আমার কথা
শোন।

সুন্দরী 'সাকী' জ্ঞান ও ধর্মের হন্ত্রী
মধুকণ্ঠী গায়িকা প্রতিষ্ঠা ও বুদ্ধি হারিণী।

গত রাত্রে আমরা কি দেখেছিলাম ?
জলসাঘরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত
প্রতিটি স্থান,

দেখাচ্ছিল যেন বাগিচার মালীর ফুলের ঝুরি
অথবা ফুলওলার বানানো ফুলের তোড়ার মত।
সাকীর মন্থর গতির চরম সৌন্দর্য, আর
একর্ডিয়ন বাদ্যযন্ত্রের মধুর ধ্বনির আনন্দও সেখানে ছিল।
পরের দিন প্রভাতে সেই ঘরেই দেখা গেল আর এক দৃশ্য,
পানোন্মত্তদের বেপরোয়া খুশীর হুল্লোড় সেখানে আর
ছিল না।
গত রাত্রির আনন্দ-উৎসবের ধ্বংসাবশেষ স্বরূপ সেখানে
পড়েছিল
একটি ভগ্নহৃদয় অর্ধ-দগ্ধ মোমবাতি। সেটিও ছিল নীরব
ও মৃত।

আমার চিন্তার প্রেরণা আসে এক অদৃশ্য লোক থেকে,
গালিব, আমার এই যে লেখনী-সঞ্চালন এটা হল দৈবাগত
বাণীর অনুরণন।

বিবিধ

প্রিয়ার কথাগুলি আমার খুবই ভাল লেগেছিল,
তার কথাগুলি মনে হয়েছিল
যেন আমার হৃদয়েরই প্রতিধ্বনি।

হে সাকী, প্রসন্ন হয়ে আজ তুমি আমাকে প্রাণভরে পান
করতে দাও।

অন্য দিন, রাত্রির পর রাত্রি কম-বেশী যতটুকু পাই,
তাই নিয়েই তো আমি সন্তুষ্ট থাকি।

বন্ধু, তার সঙ্গে তুমি আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলে,
তার জন্য আমি তোমার উপর দোষারোপ করছি না।
যে পত্রবাহক প্রেমিকার কাছে গিয়েছিল
তার প্রতি অশিষ্ট আচরণের জন্য তাকে
অবশ্যই সেলাম জানাবে।

খিজির নামে যে পয়গম্বর পথভোলা পথিককে পথ দেখাতেন,
তার আদর্শ অনুসরণ করতেই হবে এমন কোন কথা নেই।
তবে হ্যাঁ, সফরের সময় তিনি আদর্শ বন্ধুর কাজ করতেন,
এতে সন্দেহ নেই।

আমার অন্ধকার কারাগৃহে
আছে শুধু একটানা দুঃখনিশার প্রবাহ।
উষার একমাত্র নিশানা যে বাতির আলো সেটাও মৃত,
অন্ধকারের একঘেয়েমিতে নেই কোনো ছেদ।

আমার মাটির পানপাত্রটি ভেঙে গেলে,
আপসোসের কিছু নেই, বাজার থেকে আর একটি কিনে
আনলেই চলবে,

এমন যে সুলভ জিনিস, এটা ইরাণের বাদশা জামসেদের পানপাত্রের থেকেও অনেক ভাল।

সুর-ভরা বাদ্যযন্ত্রের মত,
আমার মনের মধ্যেও অজস্র বেদনা।
একবার ছুঁয়েই দেখ, কত সুরই-না সেখানে ঝংকৃত হবে।

যে ক্ষত সেরে উঠতে পারে, এমন ক্ষত আমার জন্য নয়,
হে ঈশ্বর, আমার দুশমনকে এমনি ক্ষতই দিও।

কেউ যদি মৃত্যুর মধ্যেই তার যন্ত্রণার অবসান ঘটাতে চায়,
তবে তাকে তীব্র হতাশার শিকার হতে হবে, মৃত্যু যদি
না আসে।

আজ আসবে না, তবে একদিন সে আসবেই
মৃত্যুর এই পণ। মৃত্যুর বিরুদ্ধে এইজন্য
আমার তীব্র অভিযোগ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

অনর্থ সৃষ্টির শক্তি তোমার মধ্যে এমন পুঞ্জীভূত হয়ে আছে,
যে তুমি পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিতে পার।
তুমি যদি কারো ভালো করতে চাও,
তবে কোন দুষ্ট-গ্রহের প্রয়োজন হবে না,
সে বেচারা এমনিই খতম্ হয়ে যাবে।

ঈশ্বরীয় বিধান আর রাজার আইন,
এই দুটিই সামাশৃিজক-শৃঙ্খলা বজায় রাখে।

কিন্তু যে শয়তান এই নীতি-নিয়মের ধার ধারে না,
তাকে তোমরা কি করে সামলাবে ?

একটি কথা বললেই যখন তোমার জিহ্বা ছিন্ন হওয়ার
আশঙ্কা,
তখন তোমার চুপ করে, যা বলা হচ্ছে তাই শুনে যাওয়াই
ভাল।

মধু-শালার সঙ্গে ধর্মোপদেস্টার কোন সম্পর্ক থাকার কথা নয়।
কিন্তু কি আশ্চর্য, গালিব, গত রাত্রে আমি যখন পান-শালা
থেকে বেরিয়ে আসছি,
তখন দেখলাম, মহাশয় ব্যক্তিটি সেখানে ঢুকছেন।

ওহে গালিব, ধর্মোপদেশক মশায় তোমাকে গালাগালি
করেন,
এতে তুমি ক্ষুব্ধ হোয়ো না। এমন লোক কি কেউ আছে,
যাকে সবাই প্রশংসা করবে ?

সাকীকে এ কথা জানাতে সংকোচ হয়,
তবে আসলে পানপাত্রে মদিরার তলানিটুকু পেলেও
আমি পরম সন্তুষ্ট।

আমার নিজের দেশ থেকে বহুদূর বিদেশে আমার মৃত্যু হ'ল;
আমি যে বন্ধুহীন
এ লজ্জার গ্লানি থেকে ঈশ্বর আমায় রক্ষা করলেন।

একজন চীৎকার ক'রে বলছেঃ "মেম সাহেবকো মার দিয়া।" আমি সেদিকে ছুটে গেলাম। দেখলাম, জজের বাংলোর পশ্চিম দিকে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। আমি কোচম্যানকে তার আসনে দেখলাম।

গাড়ির ভেতরে দেখলাম দুজন মহিলা। ঘোড়ার দিকে মুখ রেখে একজনের মাথাটা গাড়ীর ডান পাশে ঝুঁকে পড়েছে, ভীষণ গোঙাচ্ছে, পরিচ্ছদে আগুন, দুটো হাতই গাড়ির বাইরে ঝুলছে। আর এক মহিলার মাথাটা, যেখানে সহিস বসে সেখানে, বাধা অবস্থায় শায়িতা। তাঁর পরিচ্ছদেও আগুন এবং তিনিও গোঙাচ্ছেন।

আমি মহিলাদের চিনতে পারলাম না। আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলামঃ কে আপনারা? কোন জবাব পেলাম না। রাত্রিটা ছিল ঘোর অন্ধকার, গাড়ীর লম্ফে যে আলো ছিল তাও নিভে গেছে। আমি কোচম্যানকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ গাড়ি কার? সে বলল, কেনেডি সাহেবের। এরপর দেখলাম, ডানদিকে যে মহিলা ছিলেন তার পরিচ্ছদ রক্তাপ্লুত। আমি কোচম্যানকে বললাম গাড়িটা জজ বাড়ির প্রাঙ্গনে নিয়ে চলো। আমি পেছন পেছন গেলাম। সিঁড়িতেই মিঃ কিংসফোর্ডের সঙ্গে দেখা। তিনি ডানদিকের মহিলাকে নিয়ে গেলেন এবং আমাকে বললেন, আর একজনকে নিয়ে আসতে। আমি তাই করলাম। ওখানে একজন ছিল তাকে আমি পরিচ্ছদের আগুন নিবোতে বললাম।

আমি গাড়িটা চিনি। চারদিকে গাছ—ষ্টেশন ক্লাব থেকে ডাকবাংলো অবধি রাস্তার দক্ষিণে। ফলে, ছায়াপাত ঘটেছে জায়গাটায়। ঘটনাস্থলে মিঃ উডম্যান আমার জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করলেন।

মিঃ কেনেডির কোচম্যান কালীরাম তার সাক্ষ্যে বললঃ আমরা যখন জজ বাড়ির পূব গেটে পৌছোলাম তখন দুটি লোক দক্ষিণে গাছগুলোর নীচ থেকে বেরিয়ে এল। তারা গাড়িটার কাছাকাছি আসতেই সইস বলল, হঠ্ যাও! কিন্তু তার কথা শেষ হ'তে না হ'তেই দু'জনের একজন রোগামত, দুই হাতে একটা গোল জিনিস ছুঁড়ে মারল। গাড়িতে মেয়েরা বসেছিলেন সেইদিকে। রোগা লোকটির পেছনে যে লোকটি ছিল সেও একটা কি গোল জিনিস ছুঁড়ে মারল। দুজনের গায়েই শাদা সার্ট ও খালি মাথা। রোগা লোকটা গাড়ির দেড় হাত দূরে ছিল দক্ষিণ পানে। অন্য লোকটি তার পাশে ছিল দক্ষিণ পশ্চিমে হাত খানেক দূরে। ওদের মুখ খানিকটা দেখতে পেয়েছি। রোগা লোকটি : ৭।১৮

বছরের হবে; আর একটি বয়স কিছু বেশি হবে। আমি তাদের চিনতে পারিনি। (১)

শব্দটা প্রচণ্ড হয়েছে। ঘোড়াটা ছুটে পশ্চিমে ডাকবাংলোর দিকে যায়। চৌমাথায় আমি থামলাম এবং চেঁচিয়ে বললাম, "মেম সাহেবকো মার দিয়া।" সইস পড়ে গেছল।

আমার চীৎকারে শাদা পোষাকে দু জন কনষ্টেবল ও একজন সাহেব সেখানে এলেন। মেম সাহেবের পোষাকে আগুন ধরে গেছল। কনষ্টেবলরা ও সাহেব আগুন নিবিয়ে দিল। সাহেব আমাকে জলদি গাড়িটা জজ বাড়িতে নিয়ে যেতে বললেন। জজ দু জন মহিলাকেই গাড়ির বাইরে নিয়ে এলেন। গাড়ির আলো নিবে গেছল।

প্রথমে যখন আমি বিবৃতি দিই তখন আমার মনে বিভ্রান্তি ছিল, তাই বলেছিলাম, একটি লোক, পরদিন সকালেও বলেছিলাম একটি লোক।

ক্ষুদিরাম নিজে জেরা করলেন। সাক্ষী বলল, আমি নিজে দেখেছি প্রত্যেকেই (অর্থাৎ দু জনই) একটি করে গোলাকার বস্তু ছুঁড়েছে। একথা সত্য নয় যে, প্রথম লোকটি চার পাচ হাত দূরে ছিল।

ম্যাজিস্ট্রেট এখানে ক্ষুদিরামকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, তিনি কিন্তু জেরায় একথা স্বীকার করে নিচ্ছেন যে, যে-লোক মিঃ কেনেডির গাড়ির কাছে ছিল সে লোক তিনিই। এ সবই তার বিরুদ্ধে যাবে। ক্ষুদিরাম একথায় থেমে যান এবং আর জেরা করেন না। (২) কিশোরী বাবুর উকিল জেরা স্থগিত রাখেন।

কনষ্টেবল ইয়াকুব বলল: আমি যখন মতিঝিল মহল্লায় ছিলাম তখন একটা প্রচণ্ড বোমা বিস্ফোরণের শব্দ শুনলাম। আমি ট্রেজারি গার্ডব্যারাকে থেকে আসছিলাম। আমি যখন দাতব্য হাসপাতালের দক্ষিণ-পশ্চিমে এলাম তখন রাস্তা দিয়ে দুটি লোককে পশ্চিম থেকে পূব দিকে রেল-ষ্টেশনমুখো ছুটে যেতে

(১) মুহূর্তের মধ্যে ঘটনা ঘটলেও কোচম্যান [illegible] দের দু জনকে দেখেছে, গায়ে শাদা সার্ট দেখেছে, রোগা না মোটা লক্ষ্য করেছে, শুধু তাই নয়, তাদের মুখ দেখে ঠিক ঠিক বয়স অনুমান করেছে, ক্ষুদিরামের ১৭।১৮, প্রফুল্ল চাকীর কিছু বেশি। অথচ অশিক্ষিতরা নিজেদের বয়সই বলতে পারে না, এই আমাদের অভিজ্ঞতা।

(২) এ আমাদের পরম লজ্জা যে, ক্ষুদিরামের পক্ষ সমর্থনে কোন উকিল পাওয়া যায়নি বা দাঁড়াননি। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে ধন্যবাদ, তিনি সেই দুঃসময়েও ক্ষুদিরামকে ক্ষতিকর জেরা থেকে নিরস্ত করেছিলেন। আদালতের বাইরে বিবৃতি এক কথা, আদালতের ভেতরে আর এক কথা।

দেখলাম। আমি রাস্তার মাঝখান দিয়ে যাচ্ছিলাম। লোক দুটো রাস্তার দুদিকে ছিল। দৌড়োচ্ছিল। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম: দৌড়োচ্ছো কেন ? একজন জবাব দিল: একটি লোক চলে যাচ্ছে। (এর পর সাক্ষী ওদেব পরিচ্ছদের যে বর্ণনা দিল তাতে আগের সাক্ষীর সাক্ষ্যের সমর্থন পাওয়া যায়)। তাদের কথাবার্তা থেকে আমি বুঝতে পারলাম তাবা কোন্ শ্রেণীর লোক। সে সময় আমার মনে কোন সন্দেহ জাগেনি। আমি পুলিস সাহেবকে বলেছি, তারা ধর্মশালার দিকে যাচ্ছিল। আমরা সবাই মিলে পুলিস সাহেবেব সঙ্গে ধর্মশালায় গেছলাম। জেরা স্থগিত থাকে।

এদিনকার শেষ সাক্ষী আবদুল করিম। সে বলল, আমার তারিখটা মনে আছে ৩০ এপ্রিল। কাঠগড়ার এই ক্ষুদিরামকে আমি এর আগে ২৯ এপ্রিল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ র‍্যাকেট (Racquet) হাউসের দক্ষিণে দেখেছি। তাব সঙ্গে আরও একটি লোককে দেখেছি। দু'জনই বাঙালি। আমি টাউন ক্লাবের একজন সভ্য। আমি ফুটবল খেলছিলাম। ফুটবল মাঠের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দু'তিন "লোগ" দূরে দুজনকে বসে থাকতে দেখেছি। আগে তাদের কখনও দেখিনি। আমি তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম—কোত্থেকে আসা হচ্ছে ? ক্ষুদিরাম বলেছিলেন, তাঁরা নৈহাটি থেকে এসেছেন। আমি বললাম, ক্লাবে গিয়ে বসুন না, নয়তো আসুন, খেলি। ক্ষুদিরাম বললেন, তিনি খেলবেন না। অন্যজন বললেন, তিনি কাল খেলবেন। ৩০ এপ্রিল আমি দীঘতব লোকটিকে দেখলাম। তাকে আদালতে দেখছিনে। লোকটি জজ-বাড়িব গেটেব বিপবীত ভাগে কোনাকুনি মাঠ পার হয়ে যাচ্ছিল। আমি তাঁকে খেলায় যোগ দিতে বললাম। সে বলল, তার সঙ্গী এখনও আসেনি, সে এসে গেলে খেলবে। দেখলাম যে, র‍্যাকেট হাউসের কাছাকাছি বসল। আধ ঘণ্টা পর, ক্ষুদিরামকেও দেখলাম। সে বাত্রে আমি সাড়ে সাতটা পৌনে আটটায় ক্লাব থেকে চলে আসি। টাউন ক্লাব থেকে কোনাকুনি ময়দান পার হয়ে এলাম। যখন ষ্টেশন ক্লাবে পৌছোলাম তখন আমি দুই ক্লাবের মাঝামাঝি জায়গায় রাস্তার ধারে একটা খালের ধারে ঐ দুটি লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। আমি চলে গেলাম। ওদের কিছু বললাম না।

সাক্ষী লোক দুটির পরিচ্ছদের বর্ণনা দিয়ে বলল, আধ ঘণ্টা পর বাড়ি থেকে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ শুনি। ভাবলাম, ও বোধ হয় দিনাপুর সময় সঙ্কেতের কামান গর্জন।

আমি স্টেশনে গেছি। দুটি লোকের একজনকে সনাক্ত করেছি। আমি স্টেশন ক্লাবে গিয়ে মিঃ উডম্যানকে সব কথা বলেছি। বরৌনিতে গিয়ে আমি বাবহার (Bahr) ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে অন্য লোকটির লাশ সনাক্ত করেছি।

২২ মে, দ্বিতীয় দিনের শুনানীকালে মিঃ কিংসফোর্ড বললেন, আমি ১৯০৪-এর আগষ্ট থেকে ১৯০৮-এর মার্চ অবধি সি-পি-এম (চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট) ছিলাম। অনেক রাজদ্রোহের মামলা করেছি। 'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা', 'বন্দেমাতরম্' ও অন্যান্য সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে। যত ছেড়েছি, তত দণ্ড দিয়েছি। আমার ধারণা, এসব মামলা শুরু করার আগেই আমি বিরাগভাজন হয়েছিলাম। আমি কলকাতা আসবার আগে 'বেঙ্গলী', 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র মতো কাগজগুলো আমার খুব অপযশ ছড়িয়েছে। যখন আমি রাজদ্রোহের মামলা করি তখন যুগান্তর' প্রভৃতি পত্রিকায় আমার নামে খুব প্রচার হয়। আমি ওসব কাগজের এমন অসংখ্য লেখা পড়েছি। তাতে থাকত অশালীন গালমন্দ। আমি ২৬ মার্চ মুজঃফরপুরে আসি। ঘটনার পর জানতে পারলাম, আমাকে রক্ষার জন্য পুলিস ব্যবস্থা নিয়েছিল। ঘটনার রাত্রে আমি ক্লাবে সাড়ে আটটা অবধি ছিলাম। সন্ধ্যাটা ক্লাবেই কাটিয়েছি। আমার গাড়িটা এক ঘোড়া টানা ল্যাণ্ডোলেট। আমার ও মিঃ কেনেডিরটা একই ধরণে তৈরি। কেনেডির ও আমার ঘোড়া দুটো ছিল দ্রুতগতির ঘোড়া। আমার স্ত্রী ক্লাবে ছিলেন। আমরা একসঙ্গে সাড়ে আটটায় বেরিয়ে এলাম। মিসেস ও মিস কেনেডি আমাদের আগেই বেরিয়ে পড়েছিলেন। আমি তাঁদের চলে যেতে দেখিনি। আমরা যখন ক্লাব-গেটের ২০ গজের মধ্যে রয়েছি তখন আমি একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনলাম, দেখলাম একটা ঝলকানি। জায়গাটা ঠিক ঠাহর করতে পারিনি। রাত্রিটা ছিল ঘোর অন্ধকার। আমরা অবশ্য চলতে লাগলাম। রাস্তার ওপর আমার যে গেটটা, অর্থাৎ যে গেট দিয়ে আমি সচরাচর যাতায়াত করি, সেখানে কি একটা জ্বলতে দেখলাম। আমি বুঝিনি যে, বিশেষ কিছু ঘটেছে, সুতরাং, আমি বাড়ি চলে গেলাম। কয়েক সেকেণ্ড পরেই আমি আমার আর একটা গেট, অর্থাৎ পশ্চিম গেটের দিক থেকে একটা চীৎকার শুনলাম। চীৎকারটা একটি গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে এগোচ্ছিল। শুনলাম কে হাঁকছে, "জজ সাহেব!" কণ্ঠস্বর কোন ইউরোপীয়ানের। আমি এ চীৎকারও শুনলাম: "বাঙালি লোক মেম সাহেবকো মার দিয়া।" গাড়িটা থামলে উইলসন নামলেন। আরও পাঁচজন কারা এল ; তাদের মধ্যে একজনকে মনে হল কনস্টেবল।

তারপর দেখলাম গাড়িতে মিসেস ও মিস কেনেডিকে ভীষণ আহতাবস্থায়। উভয়েই কার্যতঃ অচেতন। মিস কেনেডির শরীর আগাগোড়াই শায়িত অবস্থায় ছিল। আমি ও উইলসন ধরাধরি করে মহিলাদের আমার বাড়িতে নিয়ে এলাম। আমি প্রথমে মিসেস কেনেডিকে নিয়ে যাই। মিস কেনেডিকে নিয়ে যেতে উইলসন আমাকে খানিকটা সাহায্য করেছিলেন। তারপর আমি গাড়ি ক'রে সিভিল সার্জেনের বাড়ি গেলাম। তারপর গেলাম উডম্যানের বাড়ি। তাঁকে পেয়ে আমার গাড়িতে তুলে নিলাম। আমরা মিঃ আর্মস্ট্রংয়ের খোঁজে বেরোলাম। পথেই পেলাম। তাঁকেও সঙ্গে নিয়ে আমার বাড়িতে এলাম। আমি যখন ফিরলাম, দেখলাম, সিভিল সার্জেন এসে গেছেন। আমার বাড়িতে ফেরবার পরে পরেই মিস কেনেডি মারা গেলেন। মিসেস কেনেডি তখনও বেঁচে। পরদিন আমি বাঁকীপুর গেলাম। আমি মতিহারীতে যাবার পথে মজঃফরপুর স্টেশন ছুঁয়ে যাওয়া ছাড়া মজঃফরপুরে ফিরিনি। তখন আমি আমার বাড়ি যাইনি। আমি মজঃফরপুর স্টেশনে মিসেস কেনেডির মৃত্যু সংবাদ শুনি।

বারহার মহকুমা-হাকিম বাবু জ্যোতিষচন্দ্র সেন তাঁর জবানবন্দীতে বলেন, ২ মে'র রাত্রি। মিঃ সোয়েইন আমাকে বললেন, মোকামে স্টেশনে যে মানুষটি আত্মহত্যা করেছে তার দেহটি আনবার জন্য, প্রয়োজন হ'লে মোকামে থেকে মজঃফরপুরে। সনাক্তকরণ বরৌনি জংসনে হ'তে পারে। সনাক্তকরণ হ'ল। এই সেসব ফটোগ্রাফ দেহটির। এগুলো আমার সামনেই তোলা হয়। তিনজন সাক্ষী ছিল। প্ল্যাটফর্মের যেখানে দেহটি ছিল সেখানে তাদের এক এক করে আনা হয়। আমি সে সময় নোট নি। করিম ছিল প্রথম সাক্ষী। প্রথমে সে বলল, ফুলে গেছে বলে সে চিনতে পারছে না। আর দু'জন সাক্ষীর জবানবন্দী তার সামনে নেওয়া হলে, সে বলল, সেও চিনতে পারছে, এ হচ্ছে সেই দুজনের একজন যে দুজনকে সে ঘটনার দিন বেলা সাড়ে পাঁচটায় জজ বাড়িতে দেখেছিল। কনস্টেবল তহশীলদার খাঁন সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল, এই সে দুটির একটি লোক যারা ৩০ এপ্রিল রাত সাতটায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হ্যাঁ, এই লোকটির গায়েই শাদা সার্ট ছিল। পরের সাক্ষী ফৈজুদ্দিন। সেও তৎক্ষণাৎ দেহটি চিনতে পারল—৩০ এপ্রিল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে সাতটায় যে দুটি লোক ক্লাবের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল এই সার্টপরা লোকটি তাদের একজন। সাক্ষীদের দূরে দূরে রাখা হয়েছিল এবং একজনের পর আর একজনকে আনা হয়েছিল। আমরা বরৌনিতে পৌঁছোবার পরই সনাক্তকরণ শুরু হয়। সুতরাং,

সাক্ষীদের পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শ করবার কোন অবকাশ মেলেনি। কনস্টেবল-দের শব সনাক্তকরণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েছে এবং তারা সবাই বলেছে, তারা সুনিশ্চিত।

কনস্টেবল ফৈজুদ্দিন প্রধানতঃ তহশীলদারের সাক্ষ্যই সমর্থন করে।

কেশবলাল চ্যাটার্জি বলেন, কাঠগড়ার আসামীকে আমি চিনি। আমি সকালে তাঁকে সেকেন্দাবপুব ময়দানে দেখেছি। তারিখটা মনে আছে। ১০ই। হিন্দুদেব কি একটা ছুটির দিন, অফিস বন্ধ ছিল। এঁর সঙ্গে আবও একজন ছিল, রাজেন্দ্রলাল মিত্র। পুরোনো চাঁদমারিব শেষ গাছটির নীচে মানুষটি বসে ছিল। অপরিচিত বলেই মনে হ'ল। জিগ্যেস করলাম, আপনি কে বটেন? তিনি বলেন, আমি বারাণসী যাচ্ছি, একজন পর্যটক, টাকা চুরি গেছে। বললাম, এতো ব্রাঞ্চ লাইন, মেন লাইন তো নয়। জিজ্ঞেস করলাম, কি কবে এখানে এলেন, কোত্থেকে এলেন? তিনি মেদিনীপুব, না, ফরিদপুর বললেন ঠিক মনে নেই। তিনি বলেছিলেন, তিনি একজন ছাত্র। আমি জিজ্ঞেস কবলাম, কোন আত্মীয়-স্বজন আছে কি? তিনি বললেন, না, তিনি ধর্মশালায় আছেন। বাড়ী পালিয়েছে বলে আমি সন্দেহ কবলাম, মজঃফরপুরে প্রায়ই এরকম আসে। তিনি কে বলবার জন্য চেপে ধরতে বললেন, সবাইকেই ঘর-পালানো মনে করেন কেন? আমি ভাবলাম, এবাব ভেগে পড়াই ভাল, যদি কিছু চেয়ে বসে!

তাঁকে গ্রেপ্তারেব পর যখন তাঁকে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনা হল তখন আমি তাঁকে কাঠগড়ায় দেখেছি। তক্ষুণি আমাব মনে হ'ল, একে যেন কোথাও দেখেছি। একটু ভেবে এই উপসংহারে এলাম যে, এই সেই লোক যাকে আমি ১০ তারিখে দেখেছি। আমি তখন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু মনসারঞ্জন সেনকে সব বললাম, তিনি আমাকে তক্ষুণি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে খবব দেবাব জন্য পরামর্শ দিলেন। আমি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে খবব দিলাম।

সাক্ষীকে জেরা করতে চান কিনা ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞেস করা হ'লে ক্ষুদিরাম বলেন, কি জিজ্ঞেস করব। আমি তো তখন মেদিনীপুর ছিলাম।

তারপর তিনি প্রশ্ন করলেন, আপনি ঠিক বলছেন, তারিখটা দশোই?

সাক্ষী বললেন, তারিখটা যে দশোই, এ বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত।

মজঃফরপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এইচ সি উডম্যান এর পরের সাক্ষী। তিনি বললেন, ঘটনার সময় আমি বাড়ি ছিলাম। আমি একটা বিস্ফোরণের

আওয়াজ শুনেছিলাম। আমার বাড়িটা মাইলটেক দূরে। তখন রাত্রি সাড়ে আটটার কিছু পর।

মিঃ কিংসফোর্ড স্বয়ং গাড়ি করে আমার বাড়ি এলেন। তিনি বাড়ির চাকরদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমি তার কণ্ঠস্বর শুনে বেরিয়ে আসি। তখন ৯টা বাজতে মিনিট দশেক বাকি। তিনি আমাকে বললেন, একটা বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে। আমরা যখন গাড়ি করে যাচ্ছিলাম তখন তিনি আমাকে সব বৃত্তান্ত বললেন। এসে প্রথমেই তিনি বলেছিলেন, বোমা বিস্ফোরণে দু'জন মহিলা আহত হয়েছেন। পথে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে দেখা; তাঁকে তুলে নিলাম, তারপর ঘটনাস্থলে গেলাম। গাড়ির টুকরোটাকরা দেখলাম, আসনগুলো এলোমেলো, ছেঁড়া ছেঁড়া কাপড়। এই দেখে আমরা মহিলা দু'জনকে দেখতে গেলাম। মিস কেনেডি অতি দ্রুত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছেন। মিসেস কেনেডিও কিছু বলতে পারছিলেন না। কমিশনারের উদ্দেশে তারবার্তা পাঠালাম, রাজ সরকার ও আরও কারও কারও নামে। আমি গেটের বাইরে সইসকে দেখতে গেলাম। সইস নিম্নাঙ্গে আহত হয়েছিল। একটা টেবিল আনালাম, কাগজ, চেয়ার ইত্যাদি। একটা স্লিপে সইসের বিবৃতি লিখলাম এবং তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলাম। আমি হাসপাতাল গেলাম এবং আবার সইসকে জিজ্ঞাসাবাদ করলাম—যদি তার নতুন কিছু বলবার থাকে। স্নায়ুর ওপর আচমকা চোট পেয়ে সে ছিল কাতর, অবস্থাও ছিল উদ্বেগজনক। কোচম্যানকে জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। কোচম্যানকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। উইলসন, তহশীলদার খান ও ফৈজুদ্দিনের বিবৃতিও নিলাম।

বিবৃতি নেবার সময় কিছুক্ষণ বিরাম দিতে হয়েছিল; ডাকবাংলোয় গেছলাম। আর একবার এক হেড কনস্টেবলের জন্য কিছু বাধা পেয়েছিলাম। সে এসে বলে, সে একটা জুতো পেয়েছে। টেবিল থেকে একটা ল্যাণ্টার্ন তুলে নিলাম, খাল পেরিয়ে বড় গাছটার নীচে এলাম, হেড কনস্টেবল কাঁকর স্তূপের দক্ষিণে জুতোটা দেখিয়ে দিল! জুতোর কাছে একটা চাদরও পাই। আরও তিনটি জুতো পাওয়া গেল। ওর মধ্যে প্রথম জুতোর আর এক পাটি। বড় গাছটার কাছে আলাদা আলাদা পড়ে ছিল। চাদরটায় মস্ত এক ফুটো, ২নং নিদর্শনের মতই। এসব জিনিস পাবার পর আমি ফিরে গেলাম জজের বাড়ি। এরপর বাড়ি চলে গেলাম এবং মাঝরাতের কিছু পর আবার এলাম এখানে। এরপর টেলিগ্রাফ অফিসে গেলাম, পুরস্কার ঘোষণা করে নানা জায়গায়

টেলিগ্রাম পাঠালাম। পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বললাম, তিনি একটা বিবরণ শহরে প্রচার করুন।

জুতোগুলো পাবার পর আমি পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে ঘটনাস্থলের একটা স্কেচ-ম্যাপ করতে বললাম। আমি স্টেশনে গেলাম, কনস্টেবলদের পাঠিয়ে দিলাম। আরো কিছু ব্যবস্থাবিধি করে আমি রাত দুটো কি তিনটেয় বাড়ি ফিরলাম। গাড়িটা পরীক্ষা করতে গেলাম। কোচম্যান, আব্দুল করিমের বিবৃতি নিলাম এবং হাসপাতালে গিয়ে সইসের বিবৃতি নিলাম। কোচম্যানের জবানবন্দী নেবার পর কনস্টেবল ইয়াকুব আলিরও জবানবন্দী নিলাম। মিস কেনেডি সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেছলেন। ওয়েইনি স্টেশনে গ্রেপ্তারের সংবাদ শুনলাম বেলা চারটেয়। সন্ধ্যা ৬-২০ মিনিটে স্টেশনে গেলাম, ট্রেনটা পাওয়া গেল, ক্ষুদিরামের সঙ্গে সশস্ত্র পুলিশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ইন্সপেক্টর ও অন্যান্য পুলিস দেখলাম। আমি আমার কাছারীতে এলাম। তালাবদ্ধ ছিল। ক্লাবে গেলাম। আমাকে বলা হল যে, আসামী বিবৃতি দেবে। আমি তক্ষুণি ক্লাবে বিবৃতি নথিবদ্ধ করলাম। আমি ক্লাবে গেছলাম, কেননা, ওটাই ছিল নিকটতম জায়গা। বন্দীকে একটা ফিটনে করে স্টেশন থেকে ক্লাবে আনা হয়। কোন চাপ না দিয়েই ঐ বিবৃতি পাওয়া যায়। বন্দীর বিবৃতি বেশির ভাগ ছিল বাংলায়, সামান্য কিছু ইংরেজী শব্দ। একটু সাহায্য নিয়ে আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম। আমি যা নথিভুক্ত করেছি সে সম্বন্ধে আমার আস্থা আছে। আমি এক বাঙালি ইন্সপেক্টরকে দিয়ে আমার উপস্থিতিতে বন্দীকে পড়িয়ে শুনিয়েছিলাম। বন্দী বলেছে ঠিক আছে। আমি রাতে যে দুটি কনস্টেবলের বিবৃতি নিয়েছিলাম এবং যে-ছেলেটি যেচে সাক্ষ্য দিয়েছিল তারা সবাই বন্দীকে এই বলে সনাক্ত করে যে, ঘটনার আগে তারা যে দুজনকে রাস্তায় ঘোরাফেরা করতে দেখেছে এ তাদেরই একজন।

আমি শাদা পোষাকের কনস্টেবল বৈজুদ্দিনের ও তহশীলদার খাঁনের আরও খানিকটা বিবৃতি নিয়েছি।

ক্ষুদিরাম দীনেশ রায়ের শব সনাক্ত করলেন

পরদিন আমি কনস্টেবল শিউপ্রসাদ ও ফতে সিংয়ের বিবৃতি নথিভুক্ত করলাম। এরাই বন্দীকে ওয়েইনি স্টেশনে ১ মে তারিখে গ্রেপ্তার করেছিল। যে মানুষটি নিজেকে গুলি করে মেরেছে তার শব আনা হল। আমি স্টেশনে

গেছলাম। ক্ষুদিরামকে দিয়ে দেহটি সনাক্ত করালাম। স্টেশন প্ল্যাটফর্মে ক্ষুদিরামের বিবৃতি নথিবদ্ধ করলাম। পড়ে শোনালাম, বললেন ঠিক আছে। আমার কোন সন্দেহ নেই যে, ঐ বিবৃতি স্বেচ্ছায় দেওয়া। আমি সার্টিফিকেটটা গেঁথে দিই নি, আমি মনে করিনি ওটার দরকার আছে। আমি মনে করি ওটা পরিপূরক মাত্র। আমি তারপর পুলিস স্থপারিন্টেণ্ডেন্টের সঙ্গে গেলাম। ধর্মশালার যে ঘরে বন্দী থাকত সে ঘরটা দেখিয়ে দিল। ঘরটা তালাবদ্ধ ছিল। নানারকম জিনিস পাওয়া গেল। ৯ তারিখে বিস্ফোরকের ইন্সপেক্টর এলেন। আমি তাঁর হাতে টিনের বাক্সটা অর্পণ করলাম। আমি কে চন্দ্রকে এক জোড়া জুতো জেলে বন্দীর পায়ে পরিয়ে দেখতে বললাম। কলকাতা থেকে কিশোরী-মোহন ব্যানার্জির প্রযত্নে দীনেশচন্দ্র রায়ের নামে যে টাকা এসেছিল তার মনি অর্ডার ফরমটা পাঠাবার জন্য ৮ তারিখ পি এম জিকে টেলিগ্রাম করেছিলাম। বিস্ফোরক ইন্সপেক্টর সযত্নে গাড়িটা, বাক্সটা, থলেটা, বোমার টুকরোগুলো পরীক্ষা করলেন। আমার উপস্থিতিতে তাঁকে ওগুলো দেওয়া হয়েছিল। আমি ২ মে কে এল চ্যাটার্জির বিবৃতি নি।

সাব-ইন্সপেক্টর জে শারন (J. Saran) থানার ডায়েরী এনে প্রমাণ করেন যে, তহশীলদার খাঁন ও ফিয়াজদ্দিন কনস্টেবলকে ২৭ এপ্রিল থেকে প্রতিদিন ডেপুট করা হয়েছে। ২৯এ দুজন কনস্টেবলকে সন্ধ্যা ছটায় টহল দেবার জন্য ডেপুট করা হয়েছিল ! ৩০এ একা তহশীলদারকেই ডেপুট করা হয়েছিল। ২৬এ আর একজন টহল দিয়েছিল।

সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর ফতেসিং বলল, আমি বন্দী ক্ষুদিরামকে চিনতে পারছি। আমি তাকে ওয়েইনি স্টেশনের বাইরে দেখতে পাই। ১ তারিখে এক মুদির দোকানে দেখতে পাই। আমি মজঃফরপুর থেকে সকাল ১টার ট্রেনে এক সাব-ইন্সপেক্টর, ৮ কনস্টেবল ও এক হেড কনস্টেবলের সঙ্গে যাই। ৩০ এপ্রিল রাত্রে আমি ও শিউপ্রসাদ ওয়েইনিতে নেমে পড়ি, এখানেই আমাদের মোতায়েন করা হয়েছিল। ঠিক ভোরে আমরা সেখানে পৌছোই। আমরা যে ট্রেনে এলাম সে ট্রেনটা তল্লাস করলাম। কাউকে পাইনি। ট্রেনটা চলে গেল, আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। সকাল সাড়ে সাতটায় আর একটা ট্রেন। খোঁজ করলাম, কেউ নেই। আমাদের যে দুটি বাঙালির বিবরণ দেওয়া হয়েছিল তাদের খালি পা, একজনের ডোরাকাটা কালো কোট, আর একজনের শাদা সার্ট গায়ে, বয়স ১৮। আমরা সাধারণভাবে বিবরণ মিলিয়ে দেখলাম।

স্টেশন থেকে পনের গজ দূরে আমরা জিতুরামের দোকানে গেলাম। দেখলাম বন্দী জল খাচ্ছে। আমাদের দুজনেরই শাদা পোষাক। আমার ছিল এম্যুনিশন বুট। আর এক কনস্টেবলের ছিল খালি পা। বন্দী আমাদের কাছে দেওয়া বিবরণের সঙ্গে মিলে গেল। আমি জিজ্ঞেস করলাম কোথায় যাচ্ছেন, কোত্থেকে এসেছেন? তিনি বললেন, পূব থেকে আসছি, তেজপুর থেকে, যাচ্ছেন বাঁকীপুর। আমি বললাম এখানে কেন নামলেন? আপনাকে তো মজঃফরপুরে বদলি করতে হবে।

আমি যখন তাকে দেখি, তিনি তখন মুড়ি খাচ্ছিলেন। কাছেই ছিল এক ঘটি জল। তিনি বললেন বড্ড তেষ্টা পেয়েছিল। জল খেতে নেমেছি, বলেই দিলেন দৌড়। আমরা দুজন পেছন থেকে তাঁকে জাপটে ধরলাম। যখন জাপটে ধরলাম তখন তাঁর কোমর থেকে একটা পিস্তল পড়ে গেল। আমরা তাকে বেঁধে ফেলবার আগেই তিনি আর একটা রিভলভার নিলেন। আমরা দুজনে তাও কেড়ে নিলাম। এরপর তাঁকে তালাস করলাম। এখন যে পোষাকে সে পোষাকেই ধরা পড়েছেন। এই কালো কোট, এই সার্ট। এখন যে কুর্তা পরে আছেন তাতেই ছিল কিছু কার্তুজ আর কিছুটা ছিল কোমরে ধুতি জড়ানো। সব জিনিস একত্র করে আমাদের চাদরে বাঁধলাম, তাঁকে রেল স্টেশনে নিয়ে এলাম। পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নামে তার পাঠালাম। পুলিস সুপার এলেন বিকেল সাড়ে তিনটায়। বন্দীকে তাঁর হেফাজতে দিলাম, দিলাম বাণ্ডিলটাও। ঐদিনই আমরা সন্ধ্যা ছ'টায় মজঃফরপুর এলাম। পরদিন সকালবেলা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিবৃতি লিখে নিলেন।

মজঃফরপুরের সিভিল সার্জেন কর্ণেল গ্রেঞ্জার (Col. Granger) বোমাহত মহিলাদের পরীক্ষাসংক্রান্ত সাক্ষ্য দিলেন। তিনি বললেন বোমার আঘাতেই তাঁরা আহত হয়েছেন। কিন্তু তার বিবরণ এতই পীড়াদায়ক যে তিনি না-প্রকাশের অনুরোধ জানালেন।

ফতে সিংয়ের সঙ্গে যে আর এক সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর কনস্টেবল গেছল সেই শিউপ্রসাদ মিশিরেরও সাক্ষ্য নেওয়া হল, সে ফতে সিংয়ের কথাই সমর্থন করল।

ধর্মশালায় এক দাওয়াইখানা ছিল, তার কম্পাউণ্ডার ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। তিনি নাকি ঘটনার আগের দিন পান-লেমনেডের দোকানে দুটি বাঙালিকে দেখেছিলেন। ঘটনার ১০।১৫ দিন পর পুলিস সুপার ধর্মশালায়

ক্ষুদিরাম ও দীনেশের ফটো দেখিয়েছিলেন। এঁদেরই তিনি পান-লেমনেডের দোকানে দেখেছিলেন বলে চিনতে পারলেন। কাঠগড়ায় ক্ষুদিরামকেও তিনি সনাক্ত করলেন।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আর চন্দ্র বললেন, ৬ মে তিনি জেলে যান এক জোড়া জুতো ক্ষুদিরামের পায়ে লাগে কিনা যাচাই করতে। তার সুমুখেই ক্ষুদিরাম জুতো জোড়া পরেছিলেন। ঠিক লেগেছিল। ক্ষুদিরাম নিজেই বলেছেন, ও তাঁরই।

ডাঃ এস সি ব্যানার্জি বললেন, আমি ৩০ এপ্রিল মিঃ কেনেডির সইস সঙ্গতকে পরীক্ষা করেছি। তিনি আটটি ক্ষতের বিবরণ দেন। বলেন, কোন ভোতা হাতিয়ারের আঘাতে এগুলো হয়ে থাকবে। সইস এখনও হাসপাতালে আছে। সে তার কাজ করতে অক্ষম।

নাটের অন্যতম নায়ক নন্দলাল ব্যানার্জি বলল : সিংভূম থেকে ছুটি নিয়ে আমি ৩০ এপ্রিল মজঃফরপুর ছিলাম। আমি ১ তারিখ সকাল বেলা বাঙালিদের কাণ্ড শুনলাম। ১ তারিখ আমি ট্রেনে মজঃফরপুর থেকে সিংভূম ফিরছিলাম। সমস্তিপুরে যিনি এখন মৃত তাঁর সঙ্গে আমার রেল প্ল্যাটফর্মে দেখা হয়ে যায়। নতুন পাঞ্জাবী, নতুন ধুতি, নতুন পাম্পসু, খালি মাথা। তিনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন, কখন গাড়ী ছাড়ে ? আমি এই সুযোগে আলাপ জমালাম। তাঁর সঙ্গে ছিল মোকামাঘাটের টিকিট। আমরা দুজন একই কামরায় উঠলাম। তাঁর কথা বলার ধরণ ও চেহারা দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল। ট্রেন সমস্তিপুর ছেড়ে যাবার আগে আমি আমার দাদামশাই, মজঃফরপুরে সিনিয়ার গবর্মেণ্ট প্লীডার (প্রবীণ সরকারী উকিল) শিবচন্দ্র চ্যাটার্জিকে এই বলে এক তার করি, সন্দেহবশে লোকটাকে গ্রেপ্তার করবার অধিকার দেবার জন্য তিনি যেন পুলিস সুপারকে বলেন। ২ মে সকাল সাড়ে দশটায় মোকামেয় নেমে পড়ি। ঐ মানুষটিও আমার সঙ্গে মোকামে স্টেশনে আসেন এবং আমার প্রশ্নে প্রশ্নে বিরক্ত হয়ে আর একটা কামরায় গিয়ে ওঠেন। আমি এজন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়ে মোকামে স্টেশনে তাঁকে আমার জিনিসগুলো দেখতে বলি। তারপর সোজা চলে যাই স্টেশন মাষ্টারের অফিসে ওকে গ্রেপ্তারের জন্য দুটি লোক আনতে। (অবশিষ্টাংশ ২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য, পুনরাবৃত্তি বাহুল্য মাত্র) আমি শব আগলে সেই রাত্রেই মজঃফরপুর গেলাম। এস ডি ও এবং পাটনার এস পি শবের সঙ্গে এলেন। বরৌনিতে শবটির ফটো নেওয়া হ'ল এবং সনাক্তকরণ হ'ল।

সাব-ইন্সপেক্টার শর্মা তাঁর সাক্ষ্যে যা বলেছেন তা ২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ; পুনরুক্তি

নিষ্প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, সন্ধ্যার ট্রেনে শব সরিয়ে আনা হ'ল রেল স্টেশনে। এই সময় পাটনার এস-পি মিঃ সোয়েইন (Swaine) এলেন। ফটো নেওয়া হল শবটির ঐ রাত্রেই খুব জোবালো আলোব সাহায্যে।

১টায় এস পি, এস ডি ও, নন্দলাল, আমি ও কনস্টেবলরা শব নিয়ে মজঃফরপুরের ট্রেনে উঠলাম। ফটোগ্রাফারও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আমরা সকাল সাড়ে সাতটায় বরৌনি পৌঁছোলাম। সকালে আবাব শবটির ফটোগ্রাফ নেওয়া হ'ল।

সঙ্গং সইসকে আদালতে একটি চেয়ারে করে আনা হল, তার ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ। সে বলল, সে কেনেডি সাহেবের গাড়িতে ছিল; ক্লাব থেকে ফিরছিল; রাত ৮টা হবে, গাড়িতে ছিলেন মিসেস ও মিস কেনেডি। গাড়িটি যেই জজ সাহেবেব পূবের গেটের বিপরীত দিকে এসেছে, অমনি একটি লোক একটা গোল বল গাড়িব দিকে ছুঁড়ে দিল। আমি তার মুখ দেখিনি। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম: 'হেই—হেই।' আমি আব একটি লোককে দেখিনি। আমি শুধু একটি লোককে গাড়িতে একটা গোলা ছুঁড়তে দেখেছি। বিস্ফোরণ হয়েছিল। আমি অচেতন হয়ে পড়ে যাই। আমাব যখন জ্ঞান ফিবে এল, দেখলাম আমি জজ সাহেবের গেটেব কাছে পড়ে আছি। কালেক্টব সাহেব আমাকে হাসপাতালে পাঠান। সেখানে এখনও আমি চিকিৎসাধীন আছি।

মামলায় যাকে বলা হয় 'মেটিরিয়াল উইটনেস' বা প্রত্যক্ষ সাক্ষী এই সহিসটি তেমনই একজন সাক্ষী। সে একেবারে ঘটনা ও দুর্ঘটনাব মধ্যে পড়েছিল; নিজে আহত হয়েছে। সাধারণ লোকের সময় জ্ঞান থাকে না। তবু যাহোক তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে রাত আটটা বলানো গেছে। কিন্তু অন্যান্য অনৃতভাষী সাক্ষীদের মতো সেই অন্ধকারে যুবক দুটির হুবহু বয়স, পরিচ্ছদ, বর্ণ ইত্যাদির বর্ণনা সে দিতে পারেনি। সে বলেছে, একটি লোক, কিন্তু তার মুখ সে দেখেনি। দ্বিতীয় লোককেও সে দেখেনি। সাধারণভাবেই বলেছে গোল বল। শিখিয়ে পড়িয়ে গোল বল পর্যন্ত বলানো গেছে, বোমা নয়। ওটা ফাটবার কথাও সে বলেছে। তারপরেই সে অচৈতন্য।

এই সাক্ষ্য থেকে কাউকে জড়ানো যায় না—না ক্ষুদিরামকে, না দীনেশ রায় ওরফে প্রফুল্ল চাকীকে। আততায়ীকে বা আততায়ীদের কেউ দেখেনি। এই সাক্ষীর ওপর মামলা দাঁড়ায় না অথচ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে সইসের সাক্ষীই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ, কেননা, কোচম্যানের দৃষ্টি ঘোড়া ও পথের দিকে

নিবদ্ধ, সইসের দৃষ্টি শুধু পথের দিকে, তার দৃষ্টিপথ প্রশস্ততর। এই সাক্ষ্যের ঘটনার ওপরও সামান্যই আলোকপাত করে, আততায়ীদের ওপর সে-সামান্যটুকুও করে না।

পুলিস ইন্সপেক্টরের পদভাব-প্রাপ্ত জামিরুল হোসেন ধর্মশালায় সেই কক্ষটি তালাসীর জন্য যান যে কক্ষটি ক্ষুদিবাম জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে দেখিয়েছিলেন। দরজাটায় তালা লাগানো ছিল। আমবা দরজা ভেঙে ঢুকলাম এবং যে জিনিসগুলোর কথা আগেই বলা হয়েছে সেগুলো পেলাম। এই থলি করে বোমা আনা হয়েছে বলে ক্ষুদিবাম বলেছেন। মোকামে থেকে যে মৃতকে আনা হয়েছিল আমিই তার পায়ে জুতো লাগিয়ে দি। ঠিক লেগে যায়। ৩০ তারিখে রাত্রে কিশোরীমোহনেব বাড়ি গেলাম। কিছুই পেলাম না। কোন অপবিচিত লোক তাঁর কাছে এসেছিল একথা তিনি অস্বীকার কবলেন। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম ১৮।২০ বছরের কোন অপরিচিত বাঙালি তাঁব বাড়িতে এসেছিল কিনা এবং তিনি তাদের জানেন কিনা। তিনি বলেন, অপরিচিত কেউ আসেনি, তিনি এমন কোন অপরিচিতেব কথা জানেনও না। এ ছাড়া, ৫ তারিখে আর কিছু জিজ্ঞেস কবেছিলাম কিনা আমাব মনে নেই। আমি ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্টেব সঙ্গে তাঁর বাড়ি তালাসীতে গেছলাম। সেখানে পৌছোলে তাঁকে ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জিজ্ঞেস বরেছিলেন: ক্ষুদিরাম ও দীনেশচন্দ্র বায়কে চেনেন? তাঁদের চলাফেরার খবব রাখেন কিছু? তিনি বলেন, তাঁদেব সঙ্গে তাঁর কোন সম্বন্ধ বা কারবাব নেই। দীনেশচন্দ্র বায় সম্পর্কে সব কথা অস্বীকার করলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। অন্যান্য কাগজের সঙ্গে তাঁব কাছে একটা মনিঅর্ডাব কুপনও পাওয়া যায়। ঠিকানাসহ আব একটা কাগজ, দুটি বাংলা গান, একটা ছাপা, একটা হাতে লেখা।

পত্রিকা সম্পাদকীয় প্রবন্ধের একটুকু

যাঁরা গবর্ণমেণ্টকে ভয়ংকব মূর্তি ধারণেব পরামর্শ দেন তাঁরা গবর্ণমেণ্টের বন্ধু নন, শত্রু। পীড়ন নীতি কি সর্বনাশা পরিণতি ডেকে আনতে পারে তা দেখবার চোখ তাদের নেই। দেশে সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য কর্তৃপক্ষ কি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট করেন নি?

"They have deported men without trial, they have filled jails with men whom the people believe to be innocent, they

have quartered punitive and military police in various parts of the country to create terror in the minds of tens of thousands, they have pitilessly punished little boys, uninformed youths, conductors of newspapers and some well-known popular leaders. And the result ?

"তাঁরা বিনাবিচারে মানুষকে নির্বাসন দিয়েছেন, সাধারণ্যে যাঁরা নিরীহ বলে গণ্য তাঁদের নিয়ে জেল ভর্তি করছেন, হাজার হাজার লোকের চিত্তে ত্রাস সৃষ্টির জন্য দেশের নানা অংশে পিট্যুনি ও মিলিটারি পুলিশ বসিয়েছেন, নির্দয়ভাবে শিশুদের অপরিণত তরুণদের, সংবাদপত্র পরিচালকদের এবং কয়েকজন প্রখ্যাত জননায়ককে সাজা দিয়েছেন। কি ফল হয়েছে ?

"Well, the police in the interior have had to be doubled and trebled. The District Magistrates have, as a rule, to keep themselves constantly guarded, additional officials, both civilian and non-civilian, have had to be posted in several districts, and a feeling of vague uneasiness now fills the mind of almost every European official in the country. And in thus seeking to infuse terror in the hearts of the people, Government have only made its own officials extremely nervous—some of them ludicrously so.

"মফঃস্বলে পুলিশের সংখ্যা দুইগুণ তিনগুণ করা হয়েছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটরা সদা সতর্ক থাকবার জন্য নানা জায়গায় নানা লোক বসিয়েছেন। অধিকাংশ পদস্থ ইউরোপীয়ানদের মনে এক অস্বস্তির সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ জনসাধারণের চিত্তে ভীতি সঞ্চারের জন্য গবর্ণমেণ্ট নিজেদের অফিসারদেরও নার্ভাস করে তুলছেন।

"আর যে মানুষদের ভয় দেখাবার জন্য গবর্মেণ্ট যত এই দমন-নীতি অনুসরণ করছেন তাঁরা ক্রমশঃই তত নির্ভয় হয়ে উঠছে। 'যুগান্তর'-এর কথাই ধরুন, কেবল যে আর একজন মুদ্রাকর পাওয়া গেছে তাই নয়, ঐ যুবক ম্যাজিষ্ট্রেটকে খোলাখুলি ও স্বচ্ছন্দে বলেছে যে, সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ, সে তার পূর্বগামীদের এই পরিণতি জানে যে, তাঁরা জেলে পচে মরছেন এবং তারও সেই একই পরিণতি হতে পারে। তবু যে কাগজ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে সে তারই মুদ্রাকর হবে।

"Is this not a most extraordinary spectacle ? The young men who are undergoing trial for 'waging war against the king are quite unconcerned about their terrible surroundings and their dismal outlook......The jail, even gallows, seem to have no terror for them. No, they appear to be cheerfully courting them. The repressive measures have thus proved a failure in respect of those for whom they are intended.

আশ্চয বাতাবরণ নয় ? রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের অভিযোগ যাদের মাথার ওপর ঝুলছে, তারা তাদের পারিপার্শ্ব সম্পর্কে উদাসীন। জেল, এমন কি, ফাঁসিরও ভয় তাদের নেই। হ্যাঁ, প্রফুল্লচিত্তে তারা এ বরণ করছে। যাদের উদ্দেশে এই দমন নীতি তাদের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ ব্যর্থ হয়েছে।

The best advice which one can give to Government is to ask it to remember that it cannot afford to make its conscience muddy. For, a 'bad conscience makes cowards of us all.' You may gag, bind and disarm a whole nation and arm the officials with powers from head to foot. The latter would yet show symptoms of nervousness and yield to panic, if their conscience is not clear. It is, therefore, essential that the rulers should feel that they deserve well of the people—that the latter have no grievances against them."+

২৩শে মে সকাল সাড়ে ছ'টায় ক্ষুদিরামের মামলার তৃতীয় দিনের শুনানী।

ডেপুটি সুপারিণ্টেডেণ্ট অব পুলিশ বাচ্চু নারায়ণ বললেন, ঘটনার রাত্রে আমি আমার বাসস্থানে ছিলাম। আমি একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনলাম। পৌনে ন'টায় এ খবরও আমাকে পৌঁছে দেওয়া হল। আমি ঘটনাস্থলে এলাম। তদন্ত আরম্ভ করলাম। আমি রেলস্টেশনের ওয়েটিংরুম তালাস করলাম। ট্রেনে মোকামে ও বাঁকীপুরে লোক পাঠালাম। দু'জন বাঙালীর বর্ণনা দিলাম। ১ মে আরও খোঁজখাঁজ নিলাম। ২ মে সকালবেলা সরকারী উকিল শিববাবু আমাকে একটা তার পাঠালেন এই বলে যে, কাউকে সন্দেহবশে গ্রেপ্তার করা যায় কিনা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জেনে নিন। আমি তক্ষুণি মোকামের নন্দলালকে

+ অমৃতবাজার পত্রিকা, মে ২৩, ১৯০৮, পৃঃ ৮।

তারযোগে জানালাম সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করো এবং এখানে নিয়ে এস। এরপর আমি রাত আড়াইটার ট্রেনে মোকামে রওনা হলাম। সমস্তিপুরে শুনলাম, সন্দেহভাজন ধরা পড়েছিল, কিন্তু নিজেকে গুলি করে মারা গেছে।

৪ মে আমি মজঃফরপুর ফিরে আসি। ৫ মে আমার উপর আদেশ হল কিশোরীবাবুর বাড়ি তালাস করতে। তুজন তালাসী সাক্ষী যোগাড়ের জন্য আমি ইন্সপেক্টরকে ডেকে পাঠালাম। তারা এল। কিশোরীবাবু তাঁর বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। যখন তিনি কাছে এলেন, আমি তাঁকে বললাম, আমি আপনার কাছে এসেছি জানতে আপনি বাঙালি তুজনকে জানেন কিনা। তিনি বললেন, তিনি কিছুই জানেন না। আমি তখন বললাম, আপনি যে-ধর্মশালার হেডক্লার্ক তারা সেখানে ছিল। তিনি বললেন, তিনি মৃতের খবর কিছু রাখেন না। কিন্তু যে-মানুষটি ধরা পড়েছেন তাঁকে তিনি দেখেছিলেন। আমি তখনও কিশোরীবাবুকে গ্রেপ্তার করিনি বা গ্রেপ্তারের কথা কিছু ভাবিনি। আমি কিশোরীবাবুর বাড়ি তালাস করতে লেগে গেলাম। তার দেহও তল্লাস করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেন তল্লাসী চালাচ্ছেন? আমি বললাম, আমি দেখতে চাইছি, চিঠিপত্রে আপনার সঙ্গে ক্ষুদিরাম-দীনেশের কোন যোগাযোগ ছিল কিনা। আমি সব কাগজ জড় করলাম এবং কিশোরীবাবুকে গ্রেপ্তার করে ওগুলো আদালতে এনে উপস্থিত করলাম। ঐ কাগজপত্র তারই সম্মুখে হস্তগত করা হয়েছে। যে ডাকপিয়ন তাকে মনিঅর্ডার দিয়েছিল তাকে খুঁজে বের করলাম। তার বিবৃতি নিলাম। সে স্বীকার করল যে, টাকাটা কিশোরীবাবুকে দেওয়া হয়েছিল।

দীনেশ এবং অফিস-পিয়ন রামধারীর সঙ্গে কি কথাবার্তা হয়েছে তা নিতান্তই শোনা কথা বিধায় বাবু গোবিন্দচন্দ্র তা নথিভুক্তকরণে আপত্তি করলেন।

মিঃ মানুক এভিডেন্স এক্টের ১৫৭ ধারা উদ্ধৃত করে বলেন, রামধারীর কথার সমর্থনেই এ গ্রহণযোগ্য।

গোবিন্দবাবু: আপনি কি রামধারী কি বলবে আগেভাগেই ধরে নিচ্ছেন?

মিঃ মানুক: আমার উচিত ছিল আগেই রামধারীর জবানবন্দী নেওয়া। আমি এখনই তা করব।

গোবিন্দবাবু তাঁর আপত্তি প্রত্যাহার করে নেন।

মহতা এস্টেটের ২ নং কেরানী হরিনাথ চ্যাটার্জি বললেন, ১৯০৮ এর জানুয়ারি থেকে আমি কিশোরীবাবুকে চিনি। তাঁর হাতের লেখা দেখার

সুযোগ আমার হয়েছে। মনি অর্ডার ফরমে যে স্বাক্ষর তা কিশোরীবাবুর ; তিনি তা দীনেশের বকলমে সই করেছেন। রসিদ আর কুপনের লেখা আমি চিনিনে ; কিশোরীবাবুর লেখাটা আমি চিনি।

যজ্ঞেশ্বর তেওয়ারী বলল, আমি একজন ডাকপিয়ন। কাঠগড়ার কিশোরীবাবুকে আমি জানি, তিনি মহতা এস্টেটের কোর্ট অব ওয়ার্ডস এর হেডক্লার্ক। তাঁর অফিস ও বাড়ি আমি চিনি। অফিস হচ্ছে ধর্মশালায়। তাঁর চিঠিপত্র তাঁর লোকের কাছে ডাক-ঘরের জানালায় দেওয়া হয়। ভিপিপি, মনি অর্ডার, রেজিস্টার্ড চিঠি পত্র আমিই দি। প্রথম বিলি হয় তাঁর বাড়িতে, দ্বিতীয় বিলি হয় তাঁর অফিসে। গতমাসে তাঁকে মনি অর্ডার দিয়েছি। এই মনি অর্ডার আমিই তাঁকে দিয়েছি। ঠিকানা ছিল, দীনেশ চন্দ্র রায়, প্রযত্নে কিশোরীমোহন ব্যানার্জি, কিশোরীবাবুই সই করে নেন। আমি কিশোরীবাবুকে জিগগেস করেছিলাম, যাঁর নামে মনি অর্ডার এসেছে তিনি কে ? কিশোরীবাবু বলেছিলেন, তাঁর জানা-শোনা। আমি জিগগেস করেছিলাম, তিনি কোথায় ? তিনি বলেছিলেন, কি জানি কোন ঠিকানা না দিয়ে চলে গেছে, বলে গেছে টাকা বা চিঠি পত্তর এলে নিয়ে রাখতে। দীনেশ চন্দ্র রায়ের নামে আমি দ্বিতীয় কোন মনি অর্ডার কিশোরীবাবুকে দিইনি।

খেমান কাহার বলল আমি বোমা বিস্ফোরণের কথা, দুজন আওরতের মৃত্যুর কথা পরদিন শুনেছি। দুপুরবেলা দারোগাবাবু এলেন আমার কাছে খোঁজ নিতে। (ফরিয়াদি পক্ষীয় কৌঁসুলি বললেন, ঠিক ঠিক মনে করে দেখো) দুদিন পর আমাকে নিয়ে গেলেন ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহতাবাবুর বাড়ি। আমার বিবৃতি নিলেন। গত চৈত্র মাসের শেষে প্রথম ৬।৭ দিন আমি ক্ষুদিরামকে দেখেছি। তাঁর একজন সঙ্গী ছিলেন। ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাকে একটা ফোটো দেখালেন ; ক্ষুদিরামের সঙ্গীর ফোটো। কিশোরীবাবু ও রামধারী সিং ধর্মশালায় ওঁদের ঘর দিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা ৫।৭ দিন ছিলেন। ভিতরের ঘর খালি করে দেবার জন্য কিশোরীবাবু হুকুম দিয়েছিলেন। আমি তাঁদের পাঁচ, সাত কি দশ দিন দেখিনি। আবার দশ দিন পর দেখি ক্ষুদিরাম বারান্দার পশ্চিম দিকে রান্না করছেন। "মেমসাহেবদের" মারা যাবার তিন চারদিন আগে। মেমসাহেবদের মারা যাবার পর আর দেখিনি। আমি কিশোরীবাবুকে ক্ষুদিরামের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে দেখিনি।

ঘটনার দু'তিন দিন পর আমি যখন ধর্মশালায় ছিলাম তখন কালেক্টর ও

পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এলেন। সেখানে ক্ষুদিরাম ও দীনেশ যে ঘরে থাকতেন সে ঘরটি তালা ভেঙে খুললেন। দুপুর বারোটা নাগাদ অফিস খুলল। দরজা যখন খোলা হয় তখন কিশোরীবাবুর তরফে কেউ আসেনি। যে ঘরে তাঁরা থাকতেন, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে ঘরটা ক্ষুদিরাম দেখিয়ে দিলেন। ওটা ছিল ক্ষুদিরামের তালা। কি ভাবে খোলা হল আমি তা বলতে পারব না। ক্যানভাস ব্যাগের ভেতরে কি ছিল আমি দেখিনি। দীনেশ ও ক্ষুদিরাম ব্যাগটা নিয়ে এসেছিল। কার হাতে ব্যাগটা ছিল আমার মনে নেই।

গোবিন্দবাবুর জেরার উত্তরে সাক্ষী বলে:—ঘটনার পর পুলিস আমাকে গ্রেপ্তার করে এবং জেলে রাখে। ১৩।১৪ দিন আটক ছিলাম। জেলে থাকতে আমার বিবৃতি লিপিবদ্ধ করা হয়নি। কিশোরীবাবুর গ্রেপ্তাবের একদিন কি দুদিন আগে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়। আমি জেল হাজতে আটক ছিলাম। ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাকে প্রশ্ন করেন নি। একজন মুসলমান অফিসার জেলে যেতেন, কিন্তু আমাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করেন নি।

মহতা এস্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অফিস-পিয়ন রামধারী মিশির বলল: আমি কিশোরীবাবুকে চিনি। তিনি হেডক্লার্ক। মহাদেও প্রসাদ হচ্ছেন ম্যানেজার। তাঁর অনুপস্থিতিতে কিশোরীবাবুই সই দস্তখত করেন। আমি কখনও ক্ষুদিরামকে দেখিনি। বোমা বিস্ফোরণের কথা আমি জানি। এ দেড় মাস আগের এক ঘটনা। ঘটনার মাসখানেক আগে, দুজন বাঙালি আসেন ধর্মশালায়, বয়স ১৯।২০ হবে। প্রথম আমার সঙ্গে দেখা হয়। আমাকে তাঁরা জিগগেস করেন, কিশোরীবাবু ধর্মশালায় আছেন কিনা। আমি বললাম, তিনি অফিসে আছেন। তখন বাবুরা তাঁর কাছে যান। তাঁরা বাংলায় কথা বলেছেন। আমি বুঝিনি। উঠোনে খেমানের সঙ্গে দেখা হল। কিশোরীবাবু ও বাঙালি দুজন উঠোনে আমাদের কাছে এলেন। কিশোরীবাবু খেমানকে বললেন বাঙালিদের থাকবার ব্যবস্থা করে দিতে। তারপর আমরা সবাই চলে গেলাম। ঘর ধর্মশালার ভেতরে। সেই থেকে আর কখনও আমি বাঙালি দুজনকে দেখিনি। ম্যানেজারের অফিস ধর্মশালার পূর্ব দিকে। বাঙালি দুজনার গোঁফ ছিল না। দুজনেরই মাথায় লম্বা চুল। বাঙালি দুজন কিশোরীবাবুর পূর্বপরিচিত কিনা আমি বলতে পারব না।

জেরার উত্তরে বলল, আমি বলতে পারব না আদালতে যে ফোটো দেখানো হয়েছে তার মত কাউকে আগে দেখেছি কি না।

মহম্মদ ইব্রাহিম দপ্তরি বলল, আমি মহতা কোর্ট অব ওয়ার্ডস অফিসের দপ্তরি। আমি কিশোরীবাবুকে জানি। তিনি হেডক্লার্ক। আমি ক্ষুদিরামকে জানিনে। দীনেশের মতো একজন মানুষকে আমি দেখেছিলাম। এ হচ্ছে ঘটনার ১০।১৫ দিন আগে। আমি তাঁকে কিশোরীবাবুর ওখানে ১৯ তারিখে দেখি। কিশোরীবাবুর বাড়ি হচ্ছে আবগারী দারোগাবাবুর বাড়ি থেকে ২।৩ "লোগোন।" আবগারী ইন্সপেক্টরেব বাড়ি যেতে আমাদের কিশোরীবাবুর বাড়ি পার হয়ে যেতে হয়। বেলা চারটে নাগাদ যিনি মারা গেছেন তিনি কিশোরী-বাবুর বাড়ির চৌকাঠে বসে ছিলেন। এই বারান্দা রাস্তার পশ্চিম পারে। সেখানে আরও দুতিনজন বাঙালি ছিলেন। বাবান্দায় দরজার কাছে একটা টেবিলের সামনে বসে ছিলেন হরিবাবু, বসন্তবাবু, কেশববাবু ও কিশোরী বাবু। যিনি মারা গেছেন তিনি দক্ষিণমুখো হয়ে একটা চেয়ারে বসে ছিলেন। বাস্তা থেকে "এক লোগান" দূরে। আমি বারান্দায় চলে গেলাম। দারোগার কাছে যাবার সময় আমি এদের দেখিনি। ফেরবার পথে দেখেছি। কিশোরী-বাবু জিগগেস করলেন, কোথায় ছিলে? আমি বললাম দারোগার ওখানে গেছলাম। তিনি আমাকে কল্যাণী ডাকঘর থেকে কিছু পোষ্টাল এনভেলাপ আনতে বললেন। আমি নিয়ে এলাম। আমাব কিছু বেতন পাওনা ছিল এস্টেটের কাছে। আমি তাঁকে তা চুকিয়ে দিতে বললাম। তিনি আমাকে আর এক সময় আসতে বলেন। দু এক দিন পর আমি তাঁর বাড়ি গেলাম। একজন মোটা সাব-ইন্সপেক্টর সবাইকে দুই তিনখানা ফোটো দেখাচ্ছিলেন। সবাইকে বলছিলেন, যদি কেউ এদেব ধরিয়ে দিতে পারে, পুরস্কার পাবে। আদালতে যে দুটি ফোটো, তাছাডাও একটি ফোটো ছিল।

গোবিন্দবাবুর জেরাব উত্তরে বলল, ছেলেবেলা থেকে আমি এ শহরের বাসিন্দা। একই বাড়িতে বাবার সঙ্গে থাকি, কিন্তু কাজ করি আলাদা। বছর দুই আগে চোরাই মাল রাখবার অপরাধে আমার দুমাস জেল হয়েছিল। আমি, পুলিসের চব নই। কারাদণ্ড শেষে একটা চোরকে ধরিয়ে দেবার জন্য আমি পুরস্কৃত হই। মহতা অফিসে আসবার সময় থেকেই আমি কেশববাবুকে জানি। তিনি এই মামলার সাক্ষী কিনা আমি জানিনে। হ্যাঁ, তারিখটা ১৯ই হবে। আমি স্ট্যাম্প ভেণ্ডারেব কাছ থেকে যেদিন ডাকটিকিট আনি সেদিনটা ছিল রোববার। কালিয়াকির চৌমাথায় এক স্ট্যাম্প ভেণ্ডার বসে; আমি তাকে চিনি। কমিশন প্রত্যাহার করায় ভেণ্ডাররা স্ট্যাম্প বেচে না, এ আমি জানিনে।

আমার যেদিন জেল হয় সেদিন আমাকে ডিসমিস (কর্মচ্যুত) করা হয়। আমার কারাদণ্ডের সময় আখতার আলি কোতোয়ালি সাব-ইন্সপেক্টর ছিলেন না। কেবল আমার কারাদণ্ডের জন্যই আমাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয় না। আমি কাজ ছেড়ে দি। কারাদণ্ডের জন্য কাজ ছাড়িয়ে দেওয়া হয় না। আমি যে ফোটো সনাক্ত করলাম তা একটা পকেট বইয়ে টুকে রাখা হয়। আমি সর্বদাই আদালতে আসি। ১০।১২ দিন আগে একটা আবগারী মামলায় আমার সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। দারোগার নাম মহাবীরপ্রসাদ। আমি স্ট্যাম্প ভেণ্ডারের নাম জানিনে। তিনি হিন্দু, বুড়োও নয়, যুবকও নয়। স্ট্যাম্প ভেণ্ডারকে সনাক্ত করতে পারি। আমি পুলিসকে তাকে দেখাইনি।

মহম্মদ ইয়াকিন বলল, পুলিস সাহেবের হুকুমমত আমি এই ম্যাপ করেছি। স্কেল-পরিমাপে আঁকা।

মহম্মদ হাফিজ বিস্ফোরণ স্থানেব ম্যাপ সাবুদ করল।

একা চালক ঘসিটা কবরি বলল, আমি ধর্মশালা থেকে ২০।২৫ লগি দূরে মতিঝিলে থাকি (অনুমানে যা দেখালো তা ২৫০ গজের মত হবে)। আমি ধর্মশালার সামনে ভাড়া খাটাবার জন্য আমার একা রাখি। ঘটনার চার পাঁচ দিন পর দারোগা বাবু চারখানা ফোটো নিয়ে ধর্মশালায় আসেন, অনেককে দেখান এবং জিগগেস করেন, কেউ এদের দেখেছে কি-না। আমি দুজনকেই চিনি বললাম এবং আরও বললাম যে, আমি এদের দেখেছি। বম্-বারির সাত আট দিন আগে আমি এদেব প্রথম দেখি ধর্মশালায় কেরাণীবাবুর সঙ্গে। কেরাণীবাবুব নাম আমি জানিনে। দীর্ঘকাল ধরে আমি কেরাণীবাবুকে তিন চারবাব ক'বে দেখতাম ধর্মশালার কাছে। (সাক্ষী ক্ষুদিরাম ও কিশোরীমোহন ব্যানার্জীকে সনাক্ত করে)।

জেরায় সে বলে : ঘটনার পাঁচ সাত দিন পর এস-আই আখতার আলি প্রথম আমার বিবৃতি লিখে নেন। একটা খোলা শাদা কাগজে দারোগাবাবু আমার বিবৃতি লিখে নেন। আমি ধর্মশালার ভেতর যাইনে। কিশোরীবাবু দীর্ঘকাল ধরে আমার চেনা। তিনি কখনও আমার একায় চড়েন নি। আমি পুলিসের কাছে এর আগে কোন মামলায় সাক্ষ্য দিই নি। আমি ধর্মশালার বাইরে তিনজনকে দেখেছি। আমি একবার যাকে দেখি তাকে আবার দেখলে চিনতে পারি। ওদের সঙ্গে আমার কখনও কোন আলাপ হয়নি।

জেরার জন্য ইন্সপেক্টর জামিরুল হোসেনকে ডাকা হ'ল। তিনি বললেন,

আমি চৌদ্দ বছর পুলিসের চাকরিতে আছি। প্রকৃত বোমা নিক্ষেপকদের বিরুদ্ধে ম্যাজিস্ট্রেট, এস-পির সঙ্গে আমিও তদন্ত করি। আততায়ীদের ধর্মশালায় পাব বলে আমি সেখানে যাই। কিশোরীবাবুর বাড়ির ঘর তালাস করি। আমি কিশোরীর বিবৃতি লিখে নিইনি। ৫ তারিখে ডি-এস-পি সহ যে তদন্ত হয় তার দায়িত্বভার আমার উপর ছিল। আমরা সেখানে শুধু তল্লাসীর জন্যই গেছলাম, সাক্ষ্য যোগাড়ের জন্য নয়। আমি কিশোরীবাবুর বাড়ি তালাস করা স্থির করি। ফৌজদারী কার্যবিধি অনুসারেই আমি এই তল্লাসীতে অগ্রসর হই। ও বাড়ির সদর দরজাটা উত্তরমুখো। কিশোরীবাবুর বাড়িটা একটা গলিতে; ঐ গলি আবার আর একটা গলিতে গিয়ে মিশেছে, শেষের গলিটা ওর্সলি রোডে (Worsely Road) গিয়ে পড়েছে। কিশোরীবাবুর বাড়িটা ছুটি রাস্তার উপর। সদর দরজাটা উত্তরমুখো। কিশোরীবাবুর বাড়িতে গুটি কয়েক ঘর। কোনায় একটা ছোট ঘর। বারান্দা উত্তরমুখো। ৩০ এপ্রিলও বটে ৫ মে-তেও বটে, দু-দিনই ও বাড়িতে মেয়ে-পুরুষ মিলিয়ে অনেকে ছিল। দু'টি বয়স্ক পুরুষও ছিল। আমি অফিসের বাক্সটা কিশোরীবাবুর শোবার ঘরে পেলাম। তারিখের তল্লাসীর সাক্ষী ছিল পুরানি বাজারের বেণীপ্রসাদ ও মহম্মদপুরের মুন্সী আলি খান। ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে তাদের কারুরই পরিচয় নেই। তাদের সামাজিক মর্যাদা কি তাও আমি জানিনে। বারো দিনেরও কম সময় খেমান চৌকিদার জেল হাজতে ছিল। কে কিশোরীবাবুর বিবৃতি লিখে নিয়েছে আমি জানিনে। অভিযোগ-পত্র (চার্জ-শীট) দাখিল করেছেন ডেঃ সুপার। কিরকম সাক্ষ্যসাবুদ দরকার তা নিয়ে আমাদের মধ্যে কোন আলোচনা হয় নি। কোন অপরাধীকে আশ্রয়দান ও কোন অপরাধে প্ররোচনা দেওয়া কি সহায়তা করার পার্থক্য আমি জানি। আমি এক্কা-চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। কোন্ তারিখে তা হয়েছিল তা আমার স্মরণ নেই। ১২ তারিখে সমস্তিপুর থেকে ফেরার পর আমি দপ্তরিকে জিজ্ঞাসাবাদ করি। আমি শহরে তাকে দেখেছি। আগে তাকে চিনতাম না। এস-আই আখতার আলিই আমাকে জানায় যে, এই সেই দপ্তরি যে ফোটোগুলো চিনতে পেরে বিবৃতি দিয়েছে। কোথায় যে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ঠিক বলতে পারব না। আখতার আলি আমাকে বলেনি যে, দপ্তরি একজন জেল-ছাড়া কয়েদী।

মিঃ মান্নুকের আবার জিজ্ঞাসার উত্তরে বললেন, দপ্তরি ও ঘসিটার বিবৃতি

আমি লিখিনি, কেননা আমি জানতাম এস-আই আখতার আলি তার ডায়েরীতে তা টুকেছেন।

ডি-এস-পি জেরার উত্তরে বলেন, ৩০ এপ্রিল কিশোরীবাবুর বাড়ি তল্লাসীর খবর আমি রাখি। কিশোরীবাবু কোন বিবৃতি দিয়েছেন বলে আমি জানিনে। ৫ মে তারিখের আগে জামিরুল হোসেন তাঁকে একথা বলেছিল কিনা তাঁর স্মরণ নেই যে, কিশোরীবাবু আততায়ীদের সম্পর্কে কিছুই জ্ঞাত নন বলে জানিয়েছেন। গ্রেপ্তারের আগে আমি কিশোরীবাবুর বিবৃতি লিপিবদ্ধ করিনি। গ্রেপ্তারের পর ৫ তারিখে তা করেছি। আমরা নিঃসন্দেহ ছিলাম যে, প্রকৃত আততায়ীর সংখ্যা দুইয়ের বেশি ছিল। আমি কিশোরীবাবুর বাড়ি তালাস করতে এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করতে গেছলাম। আমার উপর সেই আদেশই ছিল। আমার উপরওলা কেউ সাক্ষীদের জবানবন্দী নেন নি। আমার অধস্তন কাউকে আমি কোন বিষয় লিখতে বলিনি। আখতার আলিকে সাধারণভাবে তদন্ত করবার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। ১১ কি ১২ তারিখে প্রথম আমি এস-আই আখতার আলির ডায়েরী দেখি। তখনই প্রথম জানলাম যে, দপ্তরি সাক্ষ্য দিয়েছে। আমি তাকে আমার কাছে আনবার জন্য এস-আইকে বললাম। আজ সকালে আমি দপ্তরিকে হাজির করেছি। আমার মনে হয়, একবার কি দু'বার আমি তার ঠিকানা চেয়েছিলাম। আদালতকক্ষ ছাড়া তাকে এর আগে কখনও দেখিনি। তার জবানবন্দী হয়ে গেলে জানলাম সে জেলে ছিল। সে কোথায় থাকে সন্ধান নেবার জন্য হেড কনস্টেবলকে লাগানো হয়েছিল। সে আমাকে তার পূর্ব-পরিচয় দেয়। দপ্তরি যে খারাপ লোক সে খবর আমি জানতাম না। আমি শুনেছিলাম, সে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছে। আলাপ-আলোচনাকালে একজন পুলিসের কাছে আমি এ খবর পাই। সে তাকে একথা বলে। এ মামলার সকল সাক্ষী সম্পর্কেই আমি যখন সাধারণভাবে আলাপ করছিলাম তখন নিজেই সে দপ্তরির পূর্ব-পরিচয় দিল। আমি মাস পাঁচেক শহরে খুব ব্যস্ত ছিলাম। পোস্টাল স্ট্যাম্প বিক্রি করার উপর যে কমিশন-ব্যবস্থা ছিল তা রহিত হবার কথা আমি শুনেছিলাম, কিন্তু স্ট্যাম্প ভেণ্ডাররা যে ডাকটিকিট বিক্রি বন্ধ করেছে তা জানতাম না। মেহতা হাউসে আমি খেমানের বিবৃতি লিখে নি। আমি যখন কলকাতায় তখন খেমান হাজতে। খেমান ১৯এ খালাস পায়। আমি তাকে ছেড়ে দেবার জন্য সুপারিশ করি। একটা হত্যাকাণ্ডের সহায়ক বলে খেমানকে সন্দেহ করা

হয়েছিল। ইন্সপেক্টর জামিরুল হোসেন খেমানকে গ্রেপ্তার করেছিলেন। কার হুকুমে তিনি খেমানকে গ্রেপ্তার করেছিলেন তা আমি জানিনে।

কোর্ট ইন্সপেক্টর উপেন্দ্রনাথ (?) বললেন, আমি বাংলা গানটার (ইংরাজি) অনুবাদ করেছি। হাতে লেখা বাংলা গানটারও আমি অনুবাদ করেছি। যথার্থ অনুবাদ হয়েছে। আমি বাংলা ভালই জানি। আমি ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষায় ফেল করেছি। আমি যেখানে শিক্ষালাভ করেছি সেখানে বাংলা শেখায় না।

কিশোরীমোহন ব্যানার্জি

আমার বয়স ৪২। আমাব স্বর্গত পিতার নাম মহিমচন্দ্র ব্যানার্জি। আমার বাড়ি ঢাকা জেলার শ্রীনগর থানা অন্তর্গত রাজদিয়ায়। হাল সাকিন মজঃফরপুর। আমি এখানে মেহতা এষ্টেটের হেড ক্লার্ক। আমি ইংরাজি ভাল বুঝিনে। আমাকে বাংলায় জিজ্ঞাসাবাদ করলেই আমার সুবিধে। আমি ক্ষুদিরামকে চিনিনে। আমি একজনকে জানতাম, তার নাম দীনেশচন্দ্র রায়। কেন না, সে মার্চ মাসের শেষে ধর্মশালায় এসেছিল।

প্রঃ এই ফোটোগুলো চিনতে পারেন ?

উঃ না।

প্রঃ যে দীনেশচন্দ্র বায় ধর্মশালায় এসেছিলেন তাঁর সঙ্গে এই ফোটোর মিল আছে কি ?

উঃ না।

প্রঃ দীনেশ কদ্দিন ধর্মশালায় ছিলেন ?

উঃ এক সপ্তাহেবও বেশি কাল।

প্রঃ কবে ধর্মশালা ছেড়ে গেছেন ?

উঃ ১০ এপ্রিল।

প্রঃ তারপব তাঁকে দেখেছেন ?

উঃ না।

প্রঃ ধর্মশালায় থাকতে দীনেশের সঙ্গে আপনার কি সংস্রব ছিল ?

উঃ কিছুমাত্র না।

প্রঃ কি করে নাম মনে রাখলেন তবে ?

উঃ ম্যানেজারের পিয়ন, রামধারী সিং আমাকে এসে বলে, দু'জন বাঙালি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। সময়টা মার্চের শেষাশেষি হবে। আমি

ধর্মশালার ভেতরে আমার আফিসের পেছনে গেলাম। দীনেশকে দেখলাম, আর একজনকে দেখলাম, সে রামধাবী।

প্রঃ দীনেশের সঙ্গে আর যে ছিল সে কি বাঙালি? আপনি কি সুনিশ্চিত যে, দীনেশের সঙ্গে এই ছেলেটি (ক্ষুদিরাম) ছিল না?

উঃ আমি সুনিশ্চিত।

প্রঃ যে-ঘবে দীনেশ ছিল ধর্মশালাব সে ঘরটা আপনি দেখেছিলেন?

উঃ হ্যাঁ।

প্রঃ সেটা কোথায়?

উঃ ধর্মশালাব ভেতরে।

প্রঃ ডি-এস-পি ও ম্যাজিস্ট্রেট যে ঘরের তালা ভেঙে ঢুকেছিলেন সে ঘরটা চেনেন?

উঃ না।

প্রঃ ৩ মে আপনি কোথায় ছিলেন?

উঃ রোববার বলে আমি আমাব বাড়ি ছিলাম।

প্রঃ আপনাকে কি কেউ পরে খবর দিয়েছিল যে, ডি এস পি ও ম্যাজিস্ট্রেট একটি ঘরেব তালা ভেঙেছেন?

উঃ হ্যাঁ, ধর্মশালাব একটা বাইরের ঘর।

প্রঃ ধর্মশালায় যাঁবা থাকতে আসেন তাঁদেব কি আপনি ঘব দেখিয়ে দেন?

উঃ না।

প্রঃ আপনি দীনেশকে ঘব দেখালেন কেন?

উঃ কারণ, দীনেশ এবং তাব সঙ্গী আমার সঙ্গে দেখা কবে বলল, কলকাতা থেকে আসবার পথে তাদেব টাকা চুবি গেছে, তারা কখনও মজঃফরপুরে আসেনি। তাদের ইচ্ছে আছে বাবাণসী যাবার। অবশ্য যদি কলকাতা থেকে টাকা পাঠায়। তারা বলল, আমরা অচেনা, কোথায় যাব, বলুন?

প্রঃ ৩০ তাবিখ এস-আই জামিরুল হোসেন আপনাব কাছে এসেছিলেন?

উঃ হ্যাঁ।

প্রঃ তিনি কি দুজন বাঙালির কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন?

উঃ তিনি দু'জন বাঙালির কথা উল্লেখ করেন নি। তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন আমার এখানে কোন বিদেশী লোক এসেছে কি না; আমি বলেছিলাম কোন বিদেশী আমার এখানে আসেনি।

প্রঃ ডি এস পি ও ম্যাজিস্ট্রেট ৫ তারিখে আপনার বাড়ি এসেছিলেন ?

উঃ হ্যাঁ, এসেছিলেন।

প্রঃ তিনি কি আপনার কাছে দীনেশচন্দ্র রায়ের নামোল্লেখ করেছিলেন ?

উঃ না।

প্রঃ আপনি কি শুনেছিলেন, মোকামেয় দীনেশচন্দ্র রায় নামে একটা লোক আত্মহত্যা করেছে ?

উঃ একটা লোক আত্মহত্যা করেছে শুনেছি, সে যে দীনেশচন্দ্র রায় তা শুনিনি।

প্রঃ এই মামলা সম্পর্কে কখন আপনি দীনেশচন্দ্র রায়ের নাম শুনলেন ?

উঃ ৫ মে, সেদিন একজন এস-আই, তার নাম আমি জানিনে, দেখলে চিনতে পারব, এক্কা করে একজনকে আদালতে এনেছিলেন এবং কথায় কথায় দীনেশচন্দ্র রায়ের নামোল্লেখ করেন।

প্রঃ দীনেশ চন্দ্র রায় সম্পর্কে আপনি যা জানতেন তাঁকে আপনি বললেন ?

উঃ হ্যাঁ।

প্রঃ দেখুন তো, এই রসিদটা আপনার বাড়ি পাওয়া গেছে ?

উঃ আমার বাড়িতে পাওয়া যায়নি। আমি নিজেই আমার অফিসের বাক্স থেকে ওটা ডি-এস-পির হাতে দি।

প্রঃ এই কাগজগুলো আপনার বাড়িতে পাওয়া গেছে ?

উঃ আমার বাড়িতে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু আমি জ্ঞাত নই।

প্রঃ কুপনের হাতে লেখা আপনার ?

উঃ হ্যাঁ।

প্রঃ দীনেশের টাকা আপনি নিলেন কেন ?

উঃ মার্চের শেষে সে যখন এসেছিল, বলেছিল, ট্রেনে তার টাকা খোয়া গেছে, কলকাতা থেকে আপনার প্রযত্নে কিছু টাকা আনতে পারি ? আমি রাজি হই। মনিঅর্ডার আসে। পিয়ন আমার কাছেই নিয়ে আসে, বলে, আমার প্রযত্নে দীনেশের নামে মনিঅর্ডার এসেছে এবং জিজ্ঞেস করে, দীনেশ কোথায় ? আমি বলি, দীনেশ ধর্মশালায়। পিয়ন বলে, তার তাড়া আছে, সে আমাকে ট্যাকাটা নিতে বলে, আমি নি এবং সই করে দি।

প্রঃ আপনি দীনেশের কাছ থেকে কোন রসিদ নিয়েছেন ?

উঃ আমি টাকাটা দীনেশকে দিয়ে দি।

প্রঃ ইব্রাহিম ও ঘসিটার কথাগুলো মিথ্যে ?

উঃ হ্যাঁ, সর্বতোভাবে মিথ্যে।

প্রঃ আপনার কিছু বলবার আছে ?

উঃ ভাবছি। আমি লিখিত বিবৃতি দেব।

ক্ষুদিরামের দুটি বিবৃতি

(ক) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ উডম্যানের কাছে ক্ষুদিরাম প্রথম বিবৃতিতে বলেছেন :

"মিঃ কিংসফোর্ডকে মারবার জন্য আমি কলকাতা থেকে পাঁচ ছ'দিন আগে মজঃফরপুরে এসেছি। আমি ধর্মশালায় যাই। আমার সঙ্গে আর একজন আসেন, নাম—দীনেশচন্দ্র রায়। তিনি আমাকে বললেন তাঁর বাড়ী বাঁকিপুর। তাঁর সঙ্গে আমার হাওড়া স্টেশনে দেখা। এর আগে তাঁকে কখনও দেখিনি। আমরা এক সঙ্গে এলাম। তিনিও একই উদ্দেশ্যে এসেছেন। আমি আমার নিজের উদ্যোগেই এসেছি। নানা কাগজে নানারকম পড়ে আমার মনে উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিল এবং এই দৃঢ় পণ করি। এই সব কাগজ হল 'সন্ধ্যা' 'হিতবাদী', 'যুগান্তর' ও আরও অনেক। ইংরাজ সরকার যে জুলুম চালাচ্ছে, কাগজগুলো সে সম্পর্কে লিখছিল। কিংসফোর্ডের নাম বিশেষ করে উল্লেখ করা হত। কিন্তু আমি যে তাঁকে হত্যার জন্য কৃতনিশ্চয় হলাম, তার কারণ তিনি অনেককে জেল দিয়েছেন। এসব কথা আমরা আলাপ করি। কিন্তু কেউ তাঁর উত্তেজনার কারণ কিনা একথা আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করিনি। কেননা, হঠাৎ দেখা হয়ে গেল ট্রেনে। এমনি আলাপ জমালাম। কথায় কথায় তিনি তাঁর উদ্দেশ্য বললেন, আমি বললাম আমার। ট্রেনে আরও সব যাত্রী ছিল। তাদের সঙ্গে কথা বলিনি। মজঃফরপুরে আমরা যখন ধর্মশালায় পৌঁছোলাম তখন সেখানে আমরা চার পাঁচদিন কিংসফোর্ডকে মারবার সুযোগ নিয়ে পরামর্শ করলাম। দু'তিনদিন বাইরে গিয়ে তার বাড়িটা দেখে এলাম। সন্ধ্যায় যখন তিনি বেরোতেন তখন আমরা তাঁকে দেখতাম। সকালবেলা কখনও তাঁকে দেখিনি। তবে একদিন কাছারী গিয়ে তাঁকে দেখে এসেছি। আমার ইচ্ছা ছিল রিভলভার দিয়ে তাকে গুলি করবার। আমার কাছে দুটো রিভলভার ছিল। দীনেশের কাছে একটা রিভলভার ও একটা বোমা ছিল। সে ওগুলি তৈরি করেই এনেছিল। ধর্মশালায় তৈরি করেনি। ধর্মশালায় বসে সে কিছু করেছে। আমি বাইরে

গেছলাম, ফিরে দেখি, সে বোমাটা খুলে আবার ঠিক করছিল। দীনেশ আমাকে বলল, সে এসব বোমা তৈরি করতে জানে। কিন্তু বলল না কোত্থেকে সে এটা এনেছে। এই বোমাটি ছিল টিনের, ছিল গোল, আর, এই এত বড় (যা দেখালেন তার ব্যাসার্দ্ধ তিন চার ইঞ্চি)। বোমাটা আমাদের কাপড়-চোপড়ের সঙ্গেই রেখেছিলাম। ধর্মশালায় একটা গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগে ছিল। দু'তিন দিন দীনেশের সঙ্গে একটা টিনে করে বোমাটা নিয়ে বেরিয়েছি। দীনেশ ও আমি দু'তিনদিন সন্ধ্যায় বেরিয়েছি এবং জজ বাড়ির সামনে ময়দানে ঘুরেছি। তিনবার তাঁকে (কিংসফোর্ডকে) দেখেছি। কিন্তু সুবিধেমত পাইনি। তাঁকে গাড়িতেও দেখেছি। শেষের রাত্রিটায় একটা সুযোগ পাওয়া গেল, আমি বোমাটা ছুঁড়ে দিলাম। দীনেশ ও আমি ময়দানের গাছের নীচে গেছলাম। দেখলাম ক্লাব থেকে একটা গাড়ি বেরোচ্ছে। আমি ভাবলাম, আমি কিংসফোর্ডের গাড়িটা চিনেছি ঃ তাই বোমাটা ছুঁড়েছিলাম। আমি এখন জেনেছি আমি ভুল করেছি। যে কনস্টেবল আমাকে ধরেছে তার কাছে জেনেছি। আমি একটাই বোমা ফেলেছি। রাস্তায় আমি গাড়িটার কাছে দৌড়ে গেছলাম এবং বোমা গাড়ির ভেতরে ছুঁড়ে দিয়েছি। আমি ভেবেছিলাম জজ ওর ভেতরে আছেন। আমি পরিষ্কার দেখতে পাইনি গাড়িতে ক'জন ছিল। ঘোর অন্ধকার রাত্রি। তখন আমার গায়ে এই ডোরাকাটা কোটটা ছিল। দীনেশের গায়ে প্রথমে ছিল একটা সিল্কের কুর্তা। সে সেটা খুলে ফেলে এবং আমাকে দেয়। কেননা ওতে সুবিধে হচ্ছিল না। এরপর সে একটা ভেস্ট আর চাদর গায়ে দেয়। আমাদের পায়ে জুতো ছিল, কিন্তু খুলে ফেললাম, বোমা ফেলবার আগে গাছের নীচে জুতো রাখলাম। বোমাটা ফেলবার জন্য আমি ছুটে সামনে গেলাম। দীনেশ কি অবস্থায় ছিল আমি দেখতে পাইনি। দীনেশের একটা রিভলভার ছিল ; সেটা তার হাতে ছিল কিনা দেখিনি। সে গুলি ছুঁড়েছে কিনা বলতে পারব না। বোমায় আমি একটুও চোট খাই নি। দীনেশের কোন চোট লেগেছিল কিনা বলতে পারব না। ধর্মশালা পর্যন্ত আমরা একসঙ্গে কিছুক্ষণ ছুটলাম। তারপর আমরা পৃথক হ'য়ে গেলাম। আমি লাইন ধরে এগোলাম। তারপর সমস্তিপুর রোড ধরে। ধর্মশালায় পৃথক হবার পর দীনেশ সোজা পথ ধরল।

আমরা যখন ধর্মশালার দিকে ছুটে আসছিলাম, একজন কনস্টেবল আমাদের ডেকেছিল, আমরা কানে তুলিনি। চুপি চুপি দৌড়োতে লাগলাম।

ঐদিন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ আমরা যখন জজ বাড়ির সামনে অপেক্ষা

করছিলাম তখন দু'টি লোক আমাদের সঙ্গে কথা বলেছিল এবং জিজ্ঞেস করেছিল আমরা কোথায় থাকি। আমি বলেছিলাম, আমরা কিশোরীবাবুর ওখানে থাকি। আমরা তাঁর নাম জানতাম, কেননা তিনিই ছিলেন ধর্মশালার ম্যানেজার। তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হয় নি। আমি ঐ লোক দু'টিকে বলেছিলাম, আমরা একটি ছেলের জন্য অপেক্ষা করছি। তারপর আমরা উঠে খানিকটা পায়চারি করলাম, জজের কাছারী ও পুকুর ঘুরে একটা গাছের নীচে এলাম। গাড়িটা আসা পর্যন্ত তখন থেকে সেখানেই ছিলাম। যখন লোক দুটির সঙ্গে কথা বলছিলাম তখন আমার বাঁ হাতে বোমা-পাত্রটা ছিল। আমার হাতটা ঝুলছিল। পাত্রটা টিনের ; গাছের নীচোয় যাবার আগে টিনটা ছুঁড়ে ফেললাম। বোমাটা যদিও দীনেশের, ছুঁড়েছিলাম আমিই, কেননা আমারই "বেশী ইচ্ছা" ছিল এই কাজে। আমি যখন পালাই তখন একটা ধুতি ধর্মশালায় ফেলে আসি। দীনেশ কিছু ফেলে এসেছিল কিনা জানিনে। দীনেশ আমার বয়সী। গোলপানা মুখ ও আমার চাইতে শক্ত-সমর্থ। আমার মতই উঁচু হবে, তার ভ্রূ জোড়া আলাদা। তার মাথার চুল আমার মতই কোঁকড়ানো, কালো। সে আমাকে বলেছিলো তাব এক ভাই রেলে কাজ করে বাঁকিপুরে।

আমি খবরের কাগজ পড়া ছাডাও বিপিন পাল, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, গীস্পতি কাব্যতীর্থ প্রমুখেব বক্তৃতা শুনেছি। এসব বক্তৃতা হ'ত বীডন স্কোয়ার ও কলেজ স্কোয়ারে। তাঁরাই আমাকে একাজে অনুপ্রাণিত করেছেন। কে একজন সন্ন্যাসীও বীডন স্কোয়ারে বক্তৃতা দিতেন। দারুণ বক্তৃতা। আমি আমার মামা সতীশচন্দ্র দত্তের কাছে থাকতাম। তিনি আমার দূরাত্মীয়। তিনি কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে থাকেন, নম্বরটাও ৪ কি ৫ হবে। তিনি স্কুলের মাষ্টার। স্কুলটাও কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে।

এই যে ২৩টি ছোট ও ১৪টি বড় কার্তুজ—এ আমার। আমি এগুলো কর্ণওয়ালিশ ও বৌবাজারের বাজারে রাত্রে কিনেছি। আমার কোন লাইসেন্স নেই। অমূল্যরতন দাস নামে একটি ছেলে আমাকে রিভলভার যোগাড় করে দেয়। একটার দাম ২৫ টাকা, আর একটার ১৫ টাকা। মাস দুই আগে। এই ঘড়িটা আমার। রেলওয়ে টাইমটেবিলের এই অংশ বিশেষ, এই মোমবাতি, দেশলাই, টাকা—সব আমার, তিনটে দশ টাকার নোট, একটা টাকা, একটা দু আনি, আর কিছু খুচরো। মোট ৩১ টাকা সাত আনা তিন পাই। হ্যাঁ, এইটেতে বোমা ছিল, এই জুতো জোড়া আমার, ঐ জোড়া দীনেশের। চাদরটা

দীনেশের ; সে মাঝে মাঝে ওটা মাথায় জড়াতো। খানিকটা ছিঁড়ে টিনে-রাখা বোমাটা জড়ানো হয়েছিল। দু'তিনবার ছিঁড়তে হয়েছিল।

আমি বছর খানেক আগে মেদিনীপুর কলেজ ছেড়ে দিই।

বিচারক ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মার্থুডের কাছে ক্ষুদিরাম ২৩ মে আর একটি বিবৃতি দেন। কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে। বিশেষ করে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত প্রমুখের পটভূমিকায় ক্ষুদিরামের এই বিবৃতি বিশ্লিষ্ট করার প্রয়োজনেই দরকার। বারে বারে সন্দেহ হয়, অভিজ্ঞতার অভাবে অথবা ইচ্ছে করে শুধু নিজেকে জড়াতে গিয়ে এবং দীনেশকে সম্পূর্ণ আড়াল দিতে গিয়ে সত্য মিথ্যার মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। স্পষ্টতই হাওড়া স্টেশনে বা ট্রেনে তাঁদের সাক্ষাৎ, এমনকি দুই অপরিচিতের একই উদ্দেশ্যে মিলন, গোপীনাথ দত্ত লেনে হেমচন্দ্র দাসের সামনে দুইয়ের 'বৈপ্লবিক পরিচয়' ক্ষুদিরামের বিবৃতিতে মুছে গেছে, মুছে গেছে এক অমূল্যরতন দাসের মারফৎ ২৫ টাকা ১৫ টাকায় দুটি রিভলভার যোগাড়, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ও বৌবাজারে গুলি কেনার কাহিনীতে বারীন্দ্রকুমার ঘোষের দেওয়া বিভলভার দুটি এবং অন্যান্য প্রাথমিক কাহিনী। সত্য আছে এই যে, বোমাটা দীনেশের, মানে, প্রফুল্ল চাকীর কিন্তু 'বেশি ইচ্ছা'বশতঃ তিনিই ছুঁড়েছেন এবং বারবারই বলেছেন, বোমা একটাই। প্রফুল্ল তাঁর কাছে আগাগোড়াই দীনেশ চন্দ্র রায়।

(খ) দ্বিতীয় বিবৃতিতে বলেছেন, এই যে দেহ পড়ে আছে, এ দীনেশ চন্দ্র রায়ের। সাধারণ আকৃতি থেকে তাকে চিনি, কোন বিশেষ চিহ্ন থেকে নয়। এই পাঞ্জাবীটা কার বলতে পারব না। (নতুন সার্ট, রক্তমাখা, দেখানো হলে বললেন) এসব কার জানিনে। এই বেনিয়ানটাও নয়। (জুতো জোড়া নতুন, বেনিয়ানটা নোংরা, মনে হয় না নতুন)। এই পিস্তলটাও আমি চিনিনে। [একটা ব্রাউনিং পিস্তল ক্ষুদিরামকে দেখানো হয়েছিল] দীনেশ বলেছিল তার একটা পিস্তল আছে। এ চাদরটা আমি চিনি, ঐ টুকরোটাও, মনে হচ্ছে, ও দুটো একটা গোটা চাদরেরই টুকরো। আমি যখন প্রথম দেখি, তখন পুরোটাই ছিল। এই কাপড়ের টুকরোটাও আমি দেখেছি। দীনেশ এটা পরত। কিন্তু এ কাপড়টা আমি চিনিনে, বিশেষ কোন চিহ্ন নেই। আর, যে কাপড় শবের ওপর রয়েছে তাও আমি দেখিনি। ধুতিটা নতুন মনে হচ্ছে। দীনেশ বাঁকি-পুরে থাকত। আমি সত্য কথাই বলছি। সে নিজে আমাকে একথা বলেছে, এর সত্যাসত্য যাচাই করবার আমার কোন উপায় ছিলনা। সে তার ভাইয়ের

সঙ্গে থাকত। সে শিক্ষিত কিনা আমি জানিনে। তার ভাইয়ের নাম আমি জানিনে।

প্রঃ ১ মে আপনি কি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে এক বিবৃতি দিয়েছেন ?

উঃ হ্যাঁ। [ঐ বিবৃতি পড়ে শোনানো হলে তিনি বললেন, ঠিক আছে]।

স্বেচ্ছায় বিবৃতিতে কি বলতে হয় দীনেশ আমাকে তা শিখিয়ে দিয়েছে। বিবৃতি দেবার জন্য আমার ওপর কোন চাপ দেওয়া হয়নি। [তাঁকে দীনেশের ফোটোগ্রাফ দেখানো হলে তিনি বললেন] আমি চিনতে পারছি। তাঁর পুরো নাম দীনেশ চন্দ্র রায়। ঐ জুতো আমার, আর ঐ জুতো দীনেশের। জুতোগুলো গাছতলায় ছিল। বোমা ছোঁড়বার ১০।১৫ মিনিট আগে ওখানে রেখেছিলাম। (ক্যানভাস গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগটা দেখানো হলে) ঘটনাস্থলে যাবার আগে ওটা ধর্মশালায় ফেলে এসেছিলাম। এই টিনে আমরা বোমাটা নিয়ে যাই। ব্যাগে তুলোর ওপর বোমাটা রাখা হয়েছিল। এই টিনটা আমরা ময়দানে ফেলে দিয়েছি। এই কাপড়ের টুকরোয় বোমাটা জড়ানো ছিল। ঠিক মনে নেই, সম্ভবতঃ এই কাপড়ের টুকরোই টিনে পড়ে ছিল। চাদরটা চিনি, রিভলভার দুটো, কার্তুজগুলো, টাকার খুতি, মোমবাতি, কোট, টাইম টেবিল চিনতে পারছি। আমাকে গ্রেপ্তারের সময় আমার কাছে ওগুলো পাওয়া যায়। রেল স্টেশনে আমি ১ মে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটা বিবৃতি দিই।

আমাকে বাংলায় পড়ে শোনানো হয়। আমি স্বেচ্ছায় সে বিবৃতি দিয়েছি। আমার ওপর কোনরকম চাপ দেওয়া হয়নি। আমার মনে হয়েছে উডম্যান ম্যাজিস্ট্রেট। আমি সুনিশ্চিত নই। রেলস্টেশনে প্রথম আমি পিস্তলটা দেখি। তখন আমি মিঃ উডম্যানের কাছে বিবৃতি দিচ্ছিলাম। এটা যে দীনেশের তা আমি চিনতে পারি। কনেষ্টেবলের বিবৃতি সর্বতোভাবে সত্য নয়। তারা বলেছে যে, যখন তারা বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনতে পায় তখন তারা জাজেস কোর্ট রোডে ছিল, বস্তুতঃ আমি তাদের দেখেছিলাম ব্রীজের ওপর বসে থাকতে। (ঠিক কোথায় কনষ্টেবলরা বসে ছিল ক্ষুদিরাম ম্যাপে একটা চিহ্ন দিয়ে তা দেখান) একজন কনষ্টেবল বলেছে, কোটটা আমার সার্টের নীচে ছিল, আসলে ছিল আমার বাহুর উপর। ছোট রিভলভারটা ছিল আমার পকেটে, কেড়ে নেওয়া হয়নি। আমি পকেট থেকে ওটা বের করিনি। বাকি কথাগুলো ঠিকই বলেছে।

তাঁর বিবৃতির কোন্ অংশ দীনেশের শিখিয়ে দেওয়া জিজ্ঞাসা করা হলে

ক্ষুদিরাম বললেন, আমাদের হাওড়া ষ্টেশনে দেখা হবার কথাটা। কলকাতা ছেড়ে মজঃফরপুর রওনা হবার পাচ-ছ দিন আগে যুগান্তর অফিসে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়; আমি সেখানে মেদিনীপুরের যুগান্তর বিক্রি সংক্রান্ত টাকা-পয়সার হিসেব নিকেশ করতে এসেছিলাম। "যুগান্তর"-এর নামে মামলা হওয়ায় মেদিনীপুরে 'যুগান্তর' পাঠানো বন্ধ হয়ে গেছল। তাই অফিসে খোঁজ নিতে এসেছিলাম। "যুগান্তবে" যাবার দু'তিন দিন পর আমি একদিন খাচ্ছিলাম, এমন সময় দীনেশ আসে। আমাকে অপরিচিত দেখে জিজ্ঞেস করল, কোত্থেকে আসা হচ্ছে। সে আমার নামের সঙ্গে পরিচিত ছিল; কেননা, এর আগে আমার বিরুদ্ধে একটা মামলা দায়ের হয়েছিল। কিছুক্ষণ আলাপের পর দীনেশ বলল, আমি যদি একটা কাজ করি তো আমাকে একটা পুরস্কার দেওয়া হবে। সে আমাকে গুপ্তসমিতি দেখাবে। প্রথমে আমি গররাজি হই, কিন্তু সে আমাকে উৎসাহ দেয়। সে আর কিছু বলে না, আমাকে হাওড়ায় দেখা করতে বলে। প্রতিশ্রুতিমত আমি হাওডায় আসি। এখানে সে আমাকে কিংসফোর্ডকে মারবার কথা খুলে বলে। অনেক বোঝাবুঝির পর আমি রাজি হই। পরদিন আবার বেলা পাঁচটায় হাওড়া স্টেশনেই দেখা করবার কথা দিয়ে আসি। কোথায় রিভলভার পেয়েছি একথা কাউকে বলতে আমায় মানা করে দেয়। এখানে সে আমাকে একটা রিভলভার দেয় এবং বলে দেয় আমি যেন বলি অমূল্যরতন দাস নামে এক ব্যক্তির কাছে সে ওটা পেয়েছে। দীনেশ যে আমাকে বোমা ছুঁড়তে উৎসাহিত করেছে একথা ভাঙতেও দীনেশ আমাকে মানা করে দেয়। তবে যেন একথা বলি যে, আমি 'যুগান্তর' পড়ে ও জনসভার বক্তৃতা শুনে অনুপ্রাণিত হয়েছি। 'এটা সত্যি নয়'। বিবৃতির বাকিটা ঠিক আছে। একথাও সত্যি নয় যে, আমি রিভলবার দিয়ে কিংসফোর্ডকে গুলি করতেও প্রস্তুত ছিলাম। দীনেশ আমাকে একথা বলতে অনুপ্রাণিত করেছিল। আমার আর কিছু বলবার নেই। ঘটনার দিনসহ আমি ধর্মশালায় পাঁচদিন ছিলাম। দীনেশ আমার সঙ্গে ছিল। আমি কিশোরীবাবুকে আদৌ জানিনে, দেখিওনি। আমি দীনেশের কাছে তাঁর নাম শুনেছি। আমার সঙ্গে কোন আলাপ হয়নি। এ স্বেচ্ছায় সত্যকথন। আমি জানি আপনি এক জন ম্যাজিস্ট্রেট।

ম্যাজিস্ট্রেট বন্দীপক্ষের উকিলকে বললেন, তিনি এখনও স্থির করতে পারেন নি কিশোরীবাবুকে এ মামলায় সংশ্লিষ্ট করা হবে কি না।

সোমবার রায় দেওয়া হবে বলে তিনি ঘোষণা করেন।

প্রাক-সোপর্দ তদন্তকালে কিশোরীবাবুর পক্ষে উকিল ছিলেন, ক্ষুদিরামের পক্ষে কোন উকিল ছিলেন না। কিন্তু ক্ষুদিরামেব এই শেষ বিবৃতিতে কোন বিচক্ষণ ব্যক্তির পরামর্শের আঁচ পাওয়া যায়। নিহত সঙ্গীর ওপর দায় দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে স্বীয় দায়িত্ব কিছু লঘু হয়, তখন প্রমাণেব দায়িত্ব পড়ে ফরিয়াদী-পক্ষের। আদালতে-দেওয়া শেষ বিবৃতিই সাক্ষ্য হিসেবে গ্রাহ্য। আগেকাব বিবৃতি অবস্থা বিচারে গ্রাহ্য। মোট কথা, ক্ষুদিরামের এই শেষ বিবৃতি আগেকার বিবৃতির তুলনায় অনেক পরিণত বুদ্ধির পরিচয় বহন করে। প্রথমাবধি এই জাতীয় বিবৃতি দিলে ক্ষুদিরামের অপরাধ সাব্যস্ত করা কঠিন ছিল; সন্দেহের অবকাশ থেকে যেতই। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধি সত্ত্বেও মামলা দাঁড করানো অত সহজ হত না। তবে নিজেকে জড়ানোব কথাও আছে অনেক। ফরিয়াদী-পক্ষে সেই ছিল সুবিধে।

(২০)

ক্ষুদিরাম ও কিশোরীমোহন দায়রা সোপর্দ

২৫ মে মজঃফরপুর থেকে অমৃতবাজার পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা লিখলেন, ম্যাজিস্ট্রেট ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ এবং ৩০২।১১৪ ধারাবলে ক্ষুদিরামকে দায়রা সোপর্দ করলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট কিশোরীবাবুর বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত অভিযোগ ব্যক্ত কবলেন:— আমি বার্থুড, এই ব'লে তোমায় অভিযুক্ত করছি, তুমি ১৯০৮-এর ৩০ এপ্রিল ও ৫ মে নাগাদ মজঃফরপুরে, তুমি জানতে অথবা জানতে বলে বিশ্বাস করবার কারণ আছে যে, দীনেশ চন্দ্র রায় ও ক্ষুদিরাম বসু অথবা এই নামে তাঁদের পরিচয় দিয়েছে এমন দুজন বাঙালি হত্যাপরাধ করেছে; এদের একজনকে অথবা উভয়কেই আড়াল দেবার জন্য তুমি ইন্সপেক্টব মহম্মদ জামির আলি হোসেন ও ডেপুটি এস-পি বাচ্চুলালকে মিথ্যে খবর দিয়েছ, বলেছ, এমন কোন লোক বা লোকেরা তোমার কাছে আসেনি, তুমি এমন কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের কথা কিছু জান না, এমন কোন লোক বা লোকেদের সঙ্গে তোমার কোন রকম কারবারই হয়নি। এই অস্বীকৃতি দ্বারা তুমি ভাঃ দঃ বিধির ২০১ ধারামতে দণ্ডযোগ্য অপরাধ করেছ; এই অপরাধের বিচার দায়রা আদালতের আওতায় পড়ে; তাই এই নির্দেশ দিচ্ছি যে, ঐ আদালতে উক্ত অভিযোগে তোমার বিচার হোক।

কিশোরীবাবু জানালেন, তিনি সাফাই সাক্ষী ডাকবেন কিন্তু এখনই তাঁদের নাম প্রকাশ করতে চান না, দায়রা বিচারের মুখে তিনি তাঁদের ডাকবেন। মামলা দায়রা সোপর্দ হওয়ায় জামিনের আবেদন নামঞ্জুর হ'ল। জামিনের আবেদন দায়রা আদালতে পেশ করতে হবে।

এরপর গোবিন্দবাবু, কিশোরীবাবুর অপরাধ জামিনযোগ্য এই যুক্তিতে দায়রা জজ কিংসফোর্ডের কাছে কিশোরীবাবুর জামিনের আবেদন দাখিল করেন। জজ ৫০০০ টাকার দুটি জিম্মাদারিতে এবং একই পরিমাণ ব্যক্তিগত মুচলেকায় কিশোরীবাবুকে মুক্তির আদেশ দেন। বাবু সুরেন্দ্রনাথ সেন ও দুজন স্থানীয় উকিল জিম্মাদার দাঁড়ান এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু কিশোরীমোহনকে জামিনে মুক্তির আদেশ দেন। আদেশ জারির পর কোর্ট সাব-ইন্সপেক্টরের সঙ্গে মিঃ মান্নুক উপস্থিত হন।

অমৃতবাজার পত্রিকার মন্তব্য: আগাগোড়াই ক্ষুদিরামের পক্ষসমর্থনে কোন উকিল ছিলেন না, এবং একবার শুনানীকালে মিঃ কেনেডির কোচম্যানের জেরার সময় এমন একটা কথা বলে ফেলেছিলেন যে, ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁকে সতর্ক করে দেন, ঐ কথায় ক্ষুদিরাম নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন, পুলিশের বিবৃতি থেকে তাঁর বিবৃতির দু'এক জায়গায় পার্থক্য ঘটেছিল। একমাত্র উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হচ্ছে এই যে, পুলিশ বলেছিল, ওয়েইনি স্টেশনে ধরা পড়লে তিনি পকেট থেকে রিভলভার বের করেননি। তিনি অবশ্য তাঁর চূড়ান্ত জবানবন্দীতে তাঁর স্বীকারোক্তির একটি কথা সংশোধন করে নেন। তিনি নাকি বলেছিলেন, কোন কোন পত্রিকার লেখার ও বক্তার প্রচারকার্য তাঁর মগজে কিংসফোর্ডকে মারবার ভাবনা এনে দেয়। চূড়ান্ত জবানবন্দীতে তিনি বলেছেন, দীনেশই তাঁকে একাজ করতে শিখিয়েছেন। সুতরাং য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকাগুলোর এই যে কথা যে, এসব ভারতীয় সংবাদপত্রের লেখালেখি এবং বিশেষ এক ধরণের সাহিত্য প্রচারের পরিণতি, সেকথার কোন ভিত্তি নেই। ক্ষুদিরামের বিবৃতি থেকে এই উপসংহারই এসে পড়ে যে, পরলোকগত দীনেশই ছিলেন এই অভিযানের মূল গায়েন এবং ক্ষুদিরাম তাঁরই প্রভাবাধীন ছিলেন। কিশোরীবাবু সম্পর্কে ক্ষুদিরাম বলেছেন, তিনি তাঁকে আদৌ চেনেন না, তাঁর সঙ্গে কোনরকমই আলাপ পরিচয় হয়নি। তিনি তাঁর নাম বলেছিলেন এজন্য যে, তিনি শুনেছিলেন ধর্মশালার ভার তাঁর ওপর। ক্ষুদিরাম এও বলেছেন যে, মিঃ কিংসফোর্ডের প্রাণনাশের জন্য কেউ তাঁকে প্ররোচনা দেয়নি বা পাঠায়নি। তিনি স্বয়ং এই ভয়ঙ্কর কাজে এগিয়েছেন।

আরও জিজ্ঞাসাবাদে যদি একথা প্রকাশ পায় যে, দীনেশই তাঁকে মজঃফরপুরে এনেছেন তাতেও বিস্ময়ের কিছু থাকতে পারে না। এদিকে কিশোরীবাবুও বলেছেন, তিনি ক্ষুদিরামকে আদৌ চেনেন না, এবং তাঁর ধর্মশালায় থাকার ব্যাপারের সঙ্গেও তাঁর কোন সংস্রব নেই। পুলিস যে দেখাতে চাইছে তিনি ক্ষুদিরামের মতলব জ্ঞাত ছিলেন—এ নিতান্তই কল্পনা। তিনি যে দায়রা সোপর্দ হবেন, তা একরকম ধরাধার্য ছিল। তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের কাজ উচ্চতর আদালতের জন্য রেখেছেন। তাঁর পক্ষে জামিনের আবেদন করা হলে ম্যাজিস্ট্রেট মন্তব্য করেন, ওটা এখন দায়রা জজের ব্যাপার। সুতরাং আবেদনটা জজ কিংস-ফোর্ডের কাছে করতে হয়। কিংসফোর্ড আবেদন মঞ্জুর করেন ৫০০০ টাকার দুটি জিম্মাদারি ও ১৯,০০০ টাকা ব্যক্তিগত মুচলেকায়। স্থানীয় দু'জন উকিল জিম্মাদার দাঁড়ালে কিশোরীবাবু দায়রা শুনানী সাপেক্ষে জামিনে মুক্তি পান।

ক্ষুদিরামের পক্ষ সমর্থনে কেউ নেই এই দুঃসংবাদ অন্ততঃ একজনকে শেষ পর্যন্ত বিচলিত করেছিল। পত্রিকা তাকে 'বি পি' নামে পরিচিত করলেন :

'বি পি' একজন আইনজীবী। পত্রিকাকে লিখলেন, তিনি দায়রা আদালতে ক্ষুদিরাম বসুর পক্ষসমর্থনের জন্য মজঃফরপুরে যেতে রাজি আছেন। স্থানীয় কোন ভদ্রলোকের যদি এমনতর ভাবনা এসে থাকে তবে তিনি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান। "প্রিণ্টার"-এর প্রযত্নে কোন চিঠি এলে তিনি সানন্দে সাড়া দেবেন। আমরা কিন্তু, হোক বিপথচালিত, এই হতভাগ্য তরুণের পক্ষ-সমর্থনের ব্যাপার নিয়ে এমন লুকোচুরির কোন সঙ্গত কারণ দেখছিনে। সভ্য ইংরেজ সরকারের এ অভিপ্রায় বা অভিলাষ হতে পারে না যে, অপরাধের গুরুত্ব যতই হোক কোন মানুষ আইনগত সাহায্যের অভাবে দুর্ভোগ পোহাবে। আইন ও বিচার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই এত ক্ষমতা রাখে যে, আসামীর পক্ষসমর্থন না হয় এমন হীন উপায় অবলম্বন তার প্রয়োজন করে না। স্বভাবতঃই যদি কোন আইনজীবী বন্দীর পক্ষসমর্থনে দাঁড়ান কোন দোষ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না; কেননা, এই-ই তার কাছে প্রত্যাশিত। আমরা তাই আশা করব, দায়রা বিচারকালে ক্ষুদিরাম যথাসম্ভব উৎকৃষ্ট আইনগত সাহায্য পাবেন এবং ব্রিটিশ বিচার ব্যবস্থার গৌরবময় ঐতিহ্য অনুসারে জজও ক্ষুদিরামের পক্ষসমর্থনের ব্যবস্থা করে দেবেন। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষেরই অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হবে দেখা যেন ক্ষুদিরামের পক্ষসমর্থনে আইনজ্ঞের অভাব না ঘটে; অন্যথায় জজ ও পাব্লিক প্রসিকিউটারকেই বহুলাংশে সে দায়িত্ব পালন করতে হবে। ইংলণ্ডে বন্দীর পক্ষ-

সমর্থনে কৌঁসুলি নিয়োগে বাধ্য—হোক না তার বিরুদ্ধে জঘন্যতম অভিযোগ; এবং সে ব্যয়ও সরকার বহন করেন। আমরা ভেবে পাইনে কেন এই রীতি এখানেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত হবে না।

ঐ একই তারিখে মজঃফরপুরে (২৫ মে) উত্তর বিহাবের দক্ষতম ফৌজদারি উকিল বাবু গোবিন্দ চন্দ্র রায় কিশোরীবাবুব পক্ষসমর্থনে সওয়াল করতে গিয়ে বললেন, আইনে বুনো হাঁসের পেছনে ছোটা বলে কিছু কথা নেই, আমাদের আইনের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। বন্দীকে ১১৮ ধারায় অভিযুক্ত করা হয়েছে কিন্তু এটি প্রমাণ-সাপেক্ষ যে, কাবও হত্যার মতলব আছে বন্দী তা অবগত ছিলেন। ফরিয়াদীপক্ষ এটি প্রমাণে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। ক্ষুদিরাম ও দীনেশকে ঘর ভাড়া দিয়ে বন্দী নিছক কর্তব্যই পালন করেছেন, ঘর ভাড়ার টাকা তিনি পেয়েছেন। যদি তিনি নিজের বাড়িতেও ছেলেদের রাখতেন তাতেও তিনি দায়ী হতেন না—যদি এটা প্রমাণিত না হয় যে, দীনেশ ও তার সঙ্গীর অভিপ্রায় তিনি জানতেন।

দীনেশের নামে মনি অর্ডারের যে রসিদ কুপন পাওয়া গেছে তাও ফরিয়াদী-পক্ষের মামলা আদৌ প্রমাণিত করে না। হেড ক্লার্কের সহজ সংস্কারবশে তিনি সতর্কতার সঙ্গে এতটুকু দলিলপত্রও রক্ষা করে গেছেন। এই টাকা নেওয়ার জন্য পাছে কখনও তাঁকে জবাবদিহি করতে হয় তারই জন্য তিনি কুপনটি রেখে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে গোটা সাক্ষ্যই সাজানো।

কিশোরীবাবুকে বন্দী করবার প্রকৃত কাবণটা হচ্ছে এই:—দু'জন হিন্দু কনস্টেবল ক্ষুদিরামকে ধরতে সমর্থ হয়েছে, তারা এবং আপনি-মোড়ল বাঙালি নন্দলাল টাকায় ও বাহাদুরিতে কারবারের সিংহভাগ লাভ করেছে। সুতরাং, আশ্চর্য কি, ইন্সপেক্টর আখতার আলি সাক্ষ্য বানানোয় তৎপর হয়ে উঠবেন? এবং এই বা আশ্চর্য কি যে, পুলিস অফিসারেরা হাতে হাতে আততায়ীদের ফোটো নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় চেঁচাতে শুরু করবেন অনুগত নাগরিকদের উদ্দেশে —কেউ চেনেন এদের? ফরিয়াদীপক্ষে এ ব্যাপারে মুখ্য সাক্ষী কে?—না, সর্বব্যাপী এক্কাওয়ালা, কারামুক্ত এক দাগী, এল, সাক্ষী দিল, সে দীনেশ ও কিশোরীবাবুকে দেখেছে—হ্যাঁ, একবার।

সম্রাটের কৌঁসুলি কিশোরীবাবুর বাড়িতে-পাওয়া স্বদেশী গান ও পাণ্ডুলিপি নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি করেছেন। সাক্ষ্য হিসেবে এর কি কোন মূল্য আছে? কিশোরীবাবুর হাতের লেখা প্রমাণেরও কোন চেষ্টা হয়নি। বন্দীর বাড়িতে

তো আরও লোকজন আছে। তাঁর ভাইয়ের ছেলেমেয়েদেরও হতে পারে। পরদোষে কাউকে সাজা দিতে আইন রাজি নয়।

সম্রাটের কৌঁসুলির এই সওয়াল মোটেই জোরালো নয় যে, প্রাক্‌সোপর্দ তদন্তকারী ম্যাজিষ্ট্রেট কেবল দেখবেন আপাতঃদৃষ্টিতে অপরাধ প্রতিপন্ন হয়েছে কি না, আপাতঃদৃষ্টি কথাটার বিশেষ কোন আকর্ষণ নেই। আইনমতে ম্যাজিষ্ট্রেটকে বন্দীপক্ষেব সাক্ষ্য থেকেও সুনিশ্চিত হতে হবে আদৌ সোপর্দ করা উচিত কিনা। সোপর্দ করবার মত মামলা মোটে দাঁড়ায়ই নি। বন্দীকে ছেড়ে দেওয়াই উচিত।

কিশোরীমোহন ব্যানার্জি দায়রা সোপর্দ হলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়ে বলা হ'ল। গত ৩০ এপ্রিল বোমা বিস্ফোবণেব জন্য ক্ষুদিরামকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এই বন্দীকে তাঁরই সঙ্গে পূর্বোক্ত ধারামতে দায়রা সোপর্দ করা হল। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, তিনি ইচ্ছে করেই ক্ষুদিরাম বসু ও দীনেশচন্দ্র রায়ের মিঃ ডি এইচ কিংসফোর্ডকে হত্যাব মতলব গোপন করেছেন—তাঁদের সে সুযোগ করে দেবাব ইচ্ছায় এবং এই মতলবে যে, এই ভাবেই তিনি তাঁদের ঐ অপরাধ অনুষ্ঠানে সুবিধে করে দেবেন।

বন্দীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য কি?—না, ঘটনার রাত্রে প্রহরারত দুজন কনস্টেবল দেখতে পায় দুটি তরুণ ক্লাবের কাছে ঘোরাফেরা করছে। কনস্টেবলদের কাছে তরুণ দুটি বলেছে তারা কিশোরীবাবুর ওখানে আছে। সেই রাত্রেই ইন্সপেক্টর মহম্মদ জামিরুল হোসেন বন্দীর বাড়ি যান এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন এরকম কাউকে তিনি চেনেন কিনা; তিনি বলেন চেনেন না। তিনি বলেছেন, কোন ভিন্ দেশী লোক তাঁর বাড়িতে ওঠেনি বা এমন কোন ভিন্‌দেশী সম্বন্ধে তিনি কিছু জানেনও না। ইতিমধ্যে ক্ষুদিরাম বসু ৩ মে ম্যাজিষ্ট্রেট ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিসকে ধর্মশালার সেই ঘরখানি দেখিয়ে দেন যে-ঘরে তিনি ও দীনেশ ছিলেন। ঐ ঘরের দরজা ভেঙে ঢোকা হয় এবং যেসব জিনিস পাওয়া যায় তা তালিকাবদ্ধ করা হয়। যেসব জিনিস পাওয়া যায় তার মধ্যে ছিল একটা ব্যাগ, ব্যাগে কিছু কটন উল, বোমা নিয়ে যাবার জন্য ওটা ব্যবহার করা হয়েছিল। ৫মে ইন্সপেক্টর জামিরুল হোসেন এবং ডি এস-পি আবার বন্দীর বাড়ি আসেন। তাঁরা ক্ষুদিরাম ও দীনেশচন্দ্র রায়ের কথা বললে তিনি বলেন, তিনি তাঁদের কখনও দেখেনও নি। গ্রেপ্তারের পর কিন্তু তিনি ক্ষুদিরামকে দেখেছেন। পুলিস অফিসারের কাছে তার এইসব বিবৃতি প্রাসঙ্গিক, কেননা, কিশোরীর বাড়ি যখন

তল্লাসী হয় তখনও তিনি এই মামলায় বন্দী হন নি। তারপর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তল্লাসীলব্ধ কাগজপত্রসহ তাঁকে থানায় আনা হয়। থানার কাগজপত্র-গুলো বাছাই করা হয়। তাতে পাওয়া গেল, ৯ এপ্রিল তারিখে কিশোরীকে-দেওয়া দীনেশ চন্দ্র রায়ের কুড়ি টাকার একখানি রসিদ ; দীনেশ চন্দ্র রায়ের পক্ষে বন্দীর সই-করা একটা মনিঅর্ডাব কুপন ; দীনেশচন্দ্র রায় ও দুর্গাদাস সেনের ঠিকানা লেখা একটি ছাপা বাংলা গানের দুখানি কাগজ।

সাক্ষীদের মধ্যে রামধারী মিশির, মেহতা ওয়ার্ডস এস্টেটেব অফিস-পিয়ন। বন্দী কিশোবীমোহন ঐ এস্টেটেরই হেড ক্লার্ক। সে বলেছে, মাসখানেক আগে দুটি বাঙালি, বয়স ১৯।২০ হবে, ধর্মশালায় তার কাছে আসে এবং কিশোরীবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চায়। পরে কিশোরীবাবু তাদেব ধর্মশালায় একটি ঘরে নিয়ে যান। যে বাঙালি দুটির কথা সে বলল, তাদের কাউকেই, ফোটোগ্রাফ দেখে দীনেশ বা ক্ষুদিরাম বলে সনাক্ত করতে পাবল না। আর একজন সাক্ষী ইব্রাহিম দপ্তরি। এর সম্পর্কে ম্যাজিস্ট্রেট মন্তব্য করলেন, আমি মনে করি, কোন আদালতই এই সাক্ষীর বিবৃতি গ্রাহ্য কববেন না। এর আগে সে সাজা পেয়েছে। সে বলেছে, সে দীনেশকে কয়েকটি বাবুর সঙ্গে বসে থাকতে দেখেছে। সেই বাবুদের মধ্যে ফরিয়াদী সাক্ষীদের অন্যতম কেশববাবুও ছিলেন। এই কেশববাবু কিন্তু দীনেশ চন্দ্র রায়কে কখনও দেখেছেন বলে বলেন নি। সে কেন কিশোরী-মোহনের বাড়ি গেছল সে সম্পর্কেও সে এক অসম্ভব গল্প ফেঁদেছে। দপ্তরি সুবাদে তার কিছু বকেয়া পাওনা ছিল, তাই সে বন্দীর বাড়ি গেছল। দু বছর আগেব কথা। তাই আদায় করতে যায়। আরও এই অসম্ভব গল্প সে বলে যে, সে স্ট্যাম্প ভেণ্ডারের কাছে ডাকটিকিট কিনতে গেছল। অথচ কমিশন প্রথা বাতিল হবার পর থেকে স্ট্যাম্প ভেণ্ডার তা বিক্রী করে না। আরও এক সাক্ষী এক্কা চালক ঘাসিটা। যেন হঠাৎ পাওয়া সাক্ষী। যদি সত্যিই হত্যাকারীদের অভিসন্ধি তাঁর জানা ছিল তবে এ অসম্ভব যে তাঁকে চার পাঁচবার হত্যাকারীদের সঙ্গে দেখা গেছে।

তাহলে থাকল আর দুজন সাক্ষী—পিয়ন রামধারী ও ভৃত্য খেমান। তারা যা বলেছে বন্দী মোটামুটি তা মেনে নিয়েছেন। কেবল মানেন নি খেমানের একথা যে, ঐ দুই বাঙালি হচ্ছে দীনেশ ও ক্ষুদিরাম। রামধারী তা বলেনি। কিছু দলিলও আছে। এটা পরিষ্কার যে, ক্ষুদিরাম বসু ও তার সঙ্গী ধর্মশালায় ছিলেন এবং ঘটনার অব্যবহিত পূর্বে তিনি ছিলেন সে ধর্মশালার ম্যানেজার।

আমার মনে হয়, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, বন্দী জানতেন যে, (হত্যাকারীরা) সেখানে অবস্থান করেছিলেন এবং বন্দী দীনেশচন্দ্রের হয়ে (মনি অর্ডারের) টাকা নিয়েছিলেন এবং রসিদের ও কুপনের তারিখ থেকে বোঝা যাচ্ছে দীনেশ মজঃফরপুরে ছিলেন কিন্তু বন্দী (কিশোরীমোহন) চান নি যে, তিনি (দীনেশ) পিয়নের দৃষ্টিগোচরে আসেন। বন্দীর বাসস্থানে যে গান পাওয়া গেছে তার অনুবাদ থেকে বুঝতে পারা যায় যে, বন্দী চরমপন্থীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। আমার মতে, বন্দীর বিরুদ্ধে ১১৮ ধারা মোতাবেক অভিযোগ দাঁড় করাবার মতো এসব সাক্ষ্যপ্রমাণ যথেষ্ট নয়। তথাপি সাক্ষ্য থেকে আমার মনে হচ্ছে, ৩০ এপ্রিল ও ৫ মে দু'দিনই, তিনি ইন্সপেক্টর জামিরুল হোসেনের কাছে ও ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিস বাচ্চু নারায়ণের কাছে দীনেশ ও ক্ষুদিরাম সম্পর্কে কিছু জানেন না এমনতর বলেছেন। এ যদি করে থাকেন তবে তিনি নিশ্চিতই মিথ্যাচরণ করেছেন। এই থেকেই অনুমেয় যে, তিনি একজন অথবা দু'জন অপরাধীকেই আড়াল দিতে চেয়েছিলেন। অতএব আমি ভারতীয় দণ্ডবিধির ২০১ ধারামতে বন্দী কিশোরীমোহন ব্যানার্জির বিরুদ্ধে অভিযোগ দাঁড় করলাম এবং যেহেতু বন্দী (সাফাই) সাক্ষীদের নাম প্রকাশ করছেন না এজন্য আমি তাঁকে দায়রা সোপর্দ করলাম।

(২১)

ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে—যেখান থেকে ক্ষুদিরাম দায়রা সোপর্দ হয়েছেন সেখানে ক্ষুদিরামের পক্ষ সমর্থনে কোন আইনজীবী পাওয়া যায়নি। দায়রা আদালতে স্থানীয় এক সহৃদয় উকিল এলেন ক্ষুদিরামের পক্ষ সমর্থন করবেন বলে। ৮ জুন সোমবার। জজ সাধুবাদের সঙ্গে সেই উকিলকে গ্রহণ করলেন।

যে ন'জন এসেসরকে সমন দিয়ে আনা হয়েছিল তাঁদের একজন বাবু নাথুরাম প্রসাদ। দেখা গেল, তিনি ইংরেজী জানেন না। দর্শকদের মধ্য থেকে একজন পরিবর্ত খোঁজ ক'রে ব্যর্থ হতে হ'ল।

সুতরাং শুনানী এগোতে পারল না এবং ঘণ্টাকালের জন্য মুলতুবি রাখা হল —যদি একজন এসেসর পাওয়া যায়। ঘণ্টা দুই পর দু'জন বিহারী ভদ্রলোককে খুঁজে আনা হল ; কিন্তু তাঁরা আসন গ্রহণ করার পর তাঁরাও খারিজ হয়ে গেলেন

এই কারণে যে, তাঁদের ওপর আনুষ্ঠানিক সমন জারি হয়নি। সুতরাং, এবার শুনানী পরদিন (৯ জুন) সকাল সাতটা অবধি মুলতুবি রাখা হ'ল। আদালত আদেশ দিলেন ইতিমধ্যে যেন এই দুই খারিজ ভদ্রলোকের নামে আনুষ্ঠানিক ভাবে সমন জারি হয়, তাঁদের নাম—পুরুষোত্তম প্রসাদ শর্মা ও দুর্গাদাস গুপ্ত।

ক্ষুদিরামের হাবভাবে কোন পবিবর্তন লক্ষণীয় হয়নি।

সংবাদপত্রেব প্রতিনিধিগণ তাঁদের অসুবিধার কথা (জজ) মিঃ কার্ণডাফ (Carnduff)-এর গোচবে আনলে তিনি ডায়াসে তাঁদের স্থান করে দেবার আদেশ দিলেন। তাঁরা ছিলেন মোট তিন জন। রঙপুব থেকে এক টেলিগ্রাম এল মজঃফরপুরের এক উকিলের কাছে। রঙপুরের আরও কয়েকজন উকিল ক্ষুদিরামের পক্ষ সমর্থনের জন্য মজঃফরপুব রওনা হয়ে গেছেন।

সরকারপক্ষীয় কৌঁসুলি (কাউন্সেল ফর দ্য ক্রাউন) মিঃ মানুক (Manuk) জানালেন, কিশোরীমোহনের জামিনের আবেদনে বিরোধিতা করবার কোন নির্দেশ তিনি পাননি।

অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ কার্ণডাফ ৭ জুন পুলিশ প্রহরায় বাঁকিপুর থেকে এসেছেন। তিনি সকাল সাতটার একটু আগে তাঁর বিচারাসনে বসেছিলেন। আদালত কক্ষ ও প্রাঙ্গণে সশস্ত্র পুলিসের সমাবেশ। মিঃ মানুক পাটনার সরকারী অভিযোক্তা (পাব্লিক প্রসিকিউটার) বাবু বিনোদবিহারী মজুমদারকে সঙ্গে নিয়ে এলেন ; সম্রাটের পক্ষে দাঁড়াবেন।

আদালত প্রথম মন্তব্য করলেন, কিশোরীমোহনের বিচার পৃথক হওয়া উচিত। মিঃ মানুক রাজি হলে জজ কিশোরীমোহনকে পরশু দিন পৃথক বিচারকালে উপস্থিত থাকবার জন্য নির্দেশ দিলেন। তাঁকে আগেকার জামিনেই মুক্তি দেওয়া হ'ল। কিশোরীবাবুর পক্ষে হাজির হয়েছিলেন বাবু গোবিন্দ চন্দ্র রায় ও আর সবাই।

তারপর জজ ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে ভাঃ দঃ বিধির ৩০২ ধারার অভিযোগটা পড়ালেন এবং বন্দীকে জিজ্ঞাসা করলেন: "বন্দি, আপনি কি দোষ স্বীকার করছেন ?"

বন্দী ক্ষুদিরাম বললেন, "হ্যাঁ, আমি দোষ স্বীকার করছি।"

সুতরাং, ৩০২।১১৪ ধারার অভিযোগ পাঠ করা অবান্তর হয়ে গেল। জজ বললেন, যদিও বন্দী দোষ স্বীকার করছেন তথাপি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলায় নিয়মিত বিচারের রীতি পালনই সঙ্গত হবে।

আদালত তখন জানতে চাইলেন কেউ ক্ষুদিরামের পক্ষে দাঁড়াচ্ছেন কিনা। স্থানীয় উকিল বাবু কালিদাস বসু বললেন, জজ যদি অনুমোদন করেন তবে তিনি ক্ষুদিরামের পক্ষে দাঁড়াতে চান।

পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা মজঃফরপুর থেকে ৯ জুন জানালেন, পাটনার ব্যারিষ্টার মিঃ মান্নুক, পাটনার পাবলিক প্রসিকিউটার বিনোদ বিহারী মজুমদার 'ক্রাউন' এর পক্ষে এবং স্থানীয় উকিল বাবু কালিদাস বসু, রঙপুরের বাবু কুলকমল সেন ও নগেন্দ্রলাল লাহিড়ী ক্ষুদিরামের পক্ষে দাঁড়ালেন। আশা করা যাচ্ছে রঙপুরের বাবু সতীশ চক্রবর্তী আজ দুপুরের ট্রেনে এসে পড়বেন। অর্থাৎ সওয়ালের সময় তিনি হাজির হ'য়ে যাবেন। এসেসর ছিলেন নাথুনি প্রসাদ ও জানকী প্রসাদ।

মিঃ মান্নুক মামলার উদ্বোধন করলেন এবং সংক্ষেপে ঘটনার ইতিবৃত্ত রাখলেন, নিম্নতর আদালতের পুনরুক্তি। ইংরেজীতে বললেন। এসেসররা একেবারেই ইংরেজী জানেন না। বন্দীপক্ষও কোন আপত্তি করলেন না।

মিঃ মান্নুক বললেন, পারিপার্শ্বিক (পরোক্ষ) সাক্ষ্য খুবই প্রবল এবং ফরিয়াদী-পক্ষ বন্দীর স্বীকারোক্তির আদৌ আশ্রয় না নিয়েই অপরাধ প্রতিপন্নে সমর্থ হবেন।

বাবু বিনোদবিহারী মজুমদার আদালতকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কেবল ৩০২ ধারার অথবা ৩০২।১১৪ ধারায় অভিযোগ বাংলায় বলে দেবেন? জজ বললেন, কেবল ৩০২ ধারা বুঝিয়ে দিলেই হবে। বিনোদবাবুকে জজ বাংলায় মামলার তথ্যগুলোও বুঝিয়ে দিতে বলেন। বিনোদবাবু তাই করলেন।

মিঃ আর্মস্ট্রং ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে যা বলেছিলেন তাই বললেন। আদালত যেমন সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করছিলেন বিনোদবাবু তাই এসেসরদের নিজ ভাষায় (হিন্দি?) বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। 'ছোট হাজরি'র জন্য আদালতের কাজ ১৫ মিনিটের জন্য মুলতুবি রইল। তারপর আবার আদালত বসলে আর্মস্ট্রংয়ের জেরা সুরু হ'ল। তিনি বললেন, হ্যাঁ তিনি জানতেন মিঃ কিংসফোর্ডের বিপদের কথা এবং তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। বিস্ফোরণের পাঁচ মিনিট পর ক্লাব ছেড়ে আসার সময় অথবা রাস্তায় গাড়ি হাঁকিয়ে যাবার সময় তিনি কোন হল্লা শোনেন নি। রাস্তায় লোক চলাচল স্বাভাবিক ছিল। সূচীভেদ্য অন্ধকার, মাটিতে পদচিহ্ন দৃষ্টিগোচর হবার নয়। ফিয়াজুদ্দিন তাঁকে বলেছে, সে একজনকে "চারখানা" কোট আর একজনকে শাদা কুর্তায় দেখেছে। সে এই সিল্ক কুর্তা

সম্বন্ধে কিছু বলে নি। দীনেশের আর কোন নাম আছে কিনা সেই সম্পর্কে তিনি বিশেষ কোন খোঁজ নেন নি। তিনি এ বিষয়ে কিছু শুনেছিলেন কিন্তু এ নিয়ে তদন্ত কবার প্রয়োজন তিনি বোধ করেন নি। জুতোগুলি ইংলিশ ধরণের স্বদেশে প্রস্তুত কিনা বলতে পারবেন না। কোথাকার তাও বলতে পারবেন না। ক্ষুদিবাম যখন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিবৃতি দেন তখন তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ক্ষুদিরাম তাঁকে বলেছিলেন যে, দীনেশ বাঁকিপুরেব লোক। এই বিবৃতি সম্পর্কে বাঁকিপুরের পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট খোঁজ নিয়েছিলেন। কিন্তু এর সপক্ষে কোন তথ্য পান নি। ক্ষুদিরাম যে দুটি রিভলভার কলকাতায় কিনেছেন বলে বলেছিলেন তিনি তাদের নম্বর দুটি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বড় রিভলভার সংক্রান্ত তথ্য যোগাড়ে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন। এটির সর্বশেষ ব্যবহার হয়েছিল সতের বছব আগে। বাণ্ডিলটার কত ওজন ছিল তিনি বোধ হয় বলতে পারবেন না। শবটি যখন মজঃফরপুরে আনা হয় তখন একটা ধুতি ছিল। আর কিছু নয়। ঘটনার পব তিনি ধর্মশালায় দু একজনকে জিগগেস করেছেন তারা দুটি ছেলেকে দেখেছে কিনা। তখন তিনি যে ঘরে ওরা থাকতেন সে-ঘরটা দেখেন নি। তাঁকে বলা হয়েছিল যে, দুটি মানুষকে ধর্মশালার দিকে ছুটে যেতে দেখা গেছে। ধর্মশালার ঘরে একটা কম্বল ছিল।

মজঃফরপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ উডম্যান কালিদাস বাবুর জেরার উত্তরে বলেন, বন্দী প্রথমে যে বিবৃতি দেয় তা দীনেশকে আড়াল দেবার জন্য, পরে যে নিজেকে দোষী বলে তা আত্মগরিমা জাহিরের জন্য।

তিনি বলেন, ক্ষুদিরাম যখন বিবৃতি দেন তখন তিনি যে ম্যাজিষ্ট্রেট ক্ষুদিরামকে তা বলেছিলেন বলে তাঁর মনে পড়ে না। কারণ ক্ষুদিরাম জানতেন। তিনি তাঁকে কাছারিতে নিয়ে যান। বর্ণনার আকারে তিনি ঐ বিবৃতি নথিবদ্ধ করেন। পুলিশ ইন্সপেক্টর বাংলা জানতেন, তিনি মাঝে মাঝে তাঁকে সাহায্য করেছেন যখন বন্দী ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলা বুঝতে পারেন নি।

ক্ষুদিরামের দ্বিতীয় দিনের দায়রা বিচার বসল ১০ জুন। কিশোরীবাবু আদালতে হাজির হলে সেই জামিনই পেলেন। ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৬১ ধারামতে আদালত ক্ষুদিরামকে জিগগেস করলেন : যেসব সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে তা আপনি বুঝেছেন ? ইংরেজী সাক্ষ্য বোঝেন ?

উত্তর : আমি ঠিক বুঝি না।

আদালত তখন আদেশ দিলেন সব সাক্ষ্য হিন্দীতে বুঝিয়ে দিতে হবে।

পেস্কারকে জিগগেস করতে বলা হল ক্ষুদিরাম গতকালের হিন্দী অনুবাদ বুঝেছেন কি না। ক্ষুদিরাম বললেন, বুঝেছি।

৫নং সাক্ষী মিঃ বব উইলসন জেরাব উত্তরে বলেন, আমি যে দ্বিতীয় শব্দটা শুনেছিলাম তা প্রথমটার মত জোরে নয়। আমাব মতে দুটো শব্দ হয়েছিল। দ্বিতীয়টা প্রথমটার প্রতিধ্বনি বলে মনে করিনে। এটা তত জোর নয়। আমি কানে খাটো নই।

ফরিয়াদীপক্ষে পাল্‌টা জিজ্ঞাসা করলেন মিঃ মানুক এবং সাক্ষী জবাব দিলেন, দ্বিতীয় শব্দটা প্রতিকম্পনের চাইতেও স্পষ্টতর ও তীক্ষ্ণতর, হতে পারে রিভলভার বা পিস্তলের শব্দ।

৬নং সাক্ষী, ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিস মিঃ বাচ্চু নারায়ণ, বাবু কালিদাস বসুর জেরার উত্তরে বলেন, কনস্টেবল ইয়াকুব ও ফিয়াজুদ্দিনের কাছে দু'জন নবাগতের বর্ণনা শুনেছি, তহশীলদার খানেব কাছ থেকে নয়। ইয়াকুব রেল স্টেশনের কাছে ৩০ তারিখের মাঝ রাতে খবর আমাকে দিয়েছিল। ফিয়াজুদ্দিন ঘটনাস্থলে আমাকে খবর দেয়। তখন মিঃ উডম্যান তার জবানবন্দী নিচ্ছিলেন। রাত নটা সাড়ে নটা হবে। আমি সেখানে পৌঁছোবার পরে পরেই। আমি তদন্তকালে সর্বক্ষণ থাকিনি। আমি ২রা কলকাতা রওনা হয়ে যাই। আমি একদিন কলকাতা ছিলাম। আমি দীনেশ সম্পর্কে খোঁজ নি।

আদালত: আপনি বুঝি শুনেছিলেন?

হ্যাঁ, তিনি কোথায় থাকতেন শুনেছিলাম, তাঁর আসল নাম প্রফুল্ল চাকী।

আদালত: এও আপনি শুনেছেন?

হ্যাঁ।

বাবু কালিদাস: দীনেশ কলকাতায় কোথায় থাকতেন খোঁজ নিয়েছিলেন?

উঃ মানিকতলায়।

আদালত: যাচাই করেছিলেন?

উঃ হ্যাঁ, যাচাই করেছিলাম। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ও বিপিন চন্দ্র পাল কলকাতায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আমি গীষ্পতি কাব্যতীর্থের কথা জানিনে। আমি ক্ষুদিরামের বাড়ির খবর নিয়েছিলাম। আমি ভাল করেই জেনে নিয়েছি ক্ষুদিরামের বাড়ি মেদিনীপুর। আমি কলকাতায় বন্দীর কোন "মামু"র সঙ্গে দেখা করি নি। আমি অমূল্য রতন সম্পর্কেও কোন খোঁজ নিই নি। আমি বন্দুকের দোকানগুলোয় যাই নি! কলকাতা থেকে ফিরে আট দশ দিন পর

আমি খেমানের জবানবন্দী নি। ঐ দিনই একই সময়ে পিয়নের জবানবন্দীও নি কলকাতা থেকে ফেরার দু'দিন পর জ্ঞানেন্দ্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করি।

আবার মিঃ মান্নুকের জিজ্ঞাসায় তিনি বলেন, আমি অপরাধ ও রেল বিভাগীয় ডি আই জি মিঃ প্লাউডেনকে কাগজপত্র দেখাবার জন্য কলকাতা যাই। আমি তখন চৌকিদার ও পিয়নের কাছ থেকে কিশোরীর খবরাখবর নিচ্ছিলাম।

এরপর এলেন সশস্ত্র প্রহরাধীনে মিঃ কিংসফোর্ড সাক্ষ্য দিতে। নতুন জবানবন্দী হিসেবে তিনি বলেন, তিনি একবার রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে "নবশক্তি"রও বিচার করেন। দেশীয় সংবাদপত্রে তিনি বিরুদ্ধ সমালোচনার লক্ষ্য হয়েছিলেন। বিচারের পর আক্রমণ বেশি করে ব্যক্তিগত হয়ে পড়ে। অভিযোগের ও অন্যান্য কাগজ পড়েই আমি এ কথা বলছি। আমার কলকাতা থেকে বদলির পর তা ক্ষান্ত হয়। আমার নিরাপত্তার জন্য ২০ তারিখ নাগাদ লেখা কলকাতা পুলিস কমিশনার মিঃ হ্যালিডের চিঠি আমি দেখেছি। আমাকে রক্ষা করবার জন্যে পুলিস কি ব্যবস্থা নিয়েছিল তা আমি তখন লক্ষ্য করিনি।

কালিদাস বসুর জেরার উত্তরে বলেন, কলকাতার ছেলেদের (আমার প্রতি) কি মনোভাব ছিল তা আমি জানি নে। দু'বার আমি আদালত থেকে বেরিয়ে আসবার সময় রাস্তায় জনতার হাতে লাঞ্ছিত হয়েছি। কিন্তু জনতার মধ্যে ছেলেদের সংখ্যানুপাত কত তা বলতে পারব না। আমি বাঙলার অন্যান্য জেলায়ও ছিলাম। বরিশালে ছিলাম। সেখানে কেউ আমাকে অসম্মান দেখিয়েছে বলতে পারব না। আমি কখনও মেদিনীপুর বদলি হই নি।

ঘটনার দিন কেনেডির গাড়ি চালিয়েছিল কোচম্যান কালিরাম: তার সাক্ষ্যে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে যা বলেছিল তার কিছু সংশোধন করে বলল, আমি একজনের গায়ে শাদা "কাপড়া" আর একজনের গায়ে কালা "কাপড়া" দেখেছি। দেখলাম, দক্ষিণে গাছের নীচ থেকে দুটো লোক বেরিয়ে এল। তারা ছুটে গাড়িটার দিকে এল। সইস হৈ হৈ করে উঠল। দেখলাম, একটি লোক কি গোল মত জিনিস গাড়ির ভেতরে যেখানে আওরত লোক বসেছিলেন সেই দিকে ছুঁড়ে দিল। আমি একজনের মুখ "ভাকুভি" (সর্বতোভাবে) দেখলাম; সে-ই বোমাটা ছুঁড়েছিল, আর একজনকে আমি ভাল দেখিনি। লোকটি ঠিক ঢেঙ্গাও নয়, বেঁটেও নয়, দুবলা মত, সতের আঠারো বছর উমর হবে। আমি বলতে পারি, ডকে যে আদমী আছে এ সেই।

প্রঃ বলতে পার বন্দীই সেই লোক কিনা?

উঃ খেয়াল আতা কি এইসানি আদমি থা, এহি থা।

জেরার উত্তরে বলল ঃ মিঃ উডম্যান সর্বপ্রথম আমার জবানবন্দী নেন। এর পর জয়েণ্ট সাহেব। আমি এর আগে বলিনি বন্দীই সেই লোক। তবে বলেছি, এইসা আদমি। দ্বিতীয় লোকটি যেন কি একটা গোলমত ছুঁড়েছিল। আগুনের মত কি যেন লাগল আমার পেছনে। গোল জিনিসটা এই এত বড একটা তরমুজের মত। আর একটা ছিল এই এত বড মুঠিভর। আমি প্রথমে একজনের কথা বলেছিলাম; জয়েণ্ট সাহেবকে দ্বিতীয় জনের কথাও বলেছিলাম, কালেক্টরকে বলেছি 'দোসরা রোজ'। আমার নিজের জখমের কথা কোন ম্যাজিস্ট্রেটকেই বলিনি। আমি প্রথমে তা ডি এস পি বাচ্চু নারায়ণকে দেখাই, তিনি তা ডাক্তারবাবুকে দেখান। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি বলে আমি 'কালাকাপড়ার' কথা বলিনি।

দ্বিতীয়বারের জবানবন্দীতে বলে, ভীতি ও বিহ্বলতাব জন্য আমি আমার জখম দেখাইনি। (সাক্ষী একটা অস্পষ্ট কালো দাগ দেখাল)।

৮নং সাক্ষী সঙ্গৎ সহিস জেরার উত্তরে বলল, আমি ম্যাজিস্ট্রেটকে বলেছিলাম, ঘটনার রাত্রে যাকে আমি দেখেছিলাম সে 'দুলা পাতলা'। হাসপাতালে আবার আমার জবানবন্দী নেওয়া হয়। আমি কালেক্টরকে কামিজের কথা বলেছিলাম। আমি বলতে পারব না বন্দী এখন যা পরে আছে তা 'পাঞ্জাবী আস্তিন কোর্তা' কিনা। পাঞ্জাবী আস্তিন কোর্তা কাকে বলে তা আমি জানি। আমি কালেক্টরকে তার কথা বলিনি। আমি একজন 'ঘাসিয়ারার' নাম বলেছিলাম। আমি আর একজনের নাম জানিনে। দুজন ঘাসিয়ারা ছিল। আমাকে রাস্তার মাঝখান থেকে তুলে নেওয়া হয়।

দ্বিতীয়বার জবানবন্দীতে বলে, যে ছুঁড়েছিল তার গায়ে কামিজ ছিল বলে মনে হয়েছিল তখন, সেটা পাঞ্জাবী কামিজ কিনা তা আমি খেয়াল করিনি। সাধারণ কামিজের স্লিভ (হাতা) থাকে, সার্টের কাফ থাকে, পাঞ্জাবী আস্তিনে তা থাকেনা। আর কোন পার্থক্য নেই। ঘটনার রাত্রে কামিজটার কাফ ছিল কিনা খেয়াল করিনি।

এই সময় মিঃ মান্নুক আদালতকে জানান যে, মেজর স্মলউডের কাছ থেকে এইমাত্র চিঠি পাওয়া গেল যে, তিনি আজ পৌনে বারোটায় এসে পৌছোচ্ছেন। জজ বললেন, তিনি পৌছোবামাত্র তাঁর জবানবন্দী নেবেন; কিন্তু তাঁর সাক্ষ্যের প্রয়োজন হবে কি?

মিঃ মান্নুক বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, দরকার হবে।

৯নং সাক্ষী তহশীলদার খান (কনস্টেবল) জেরার উত্তরে বলে, আমি বাঙালিদের পকেট তালাস করিনি। ফিয়াজুদ্দিন থেকে আমি দুই কদম দূরে ছিলাম। সাড়ে আটটা নাগাদ বিস্ফোরণ হয়েছিল। আমরা এক জায়গায় থেমে থাকিনি। কখনও ক্লাব গেটে কখনও ক্লাব প্রাঙ্গণের মাঝামাঝি ঘুরে ফিরেছি। আমরা জজের প্রাঙ্গণে ঢুকেছি এবং ময়দানের কাছাকাছিও গেছি। আমি পূব থেকে র‍্যাকেট কোর্ট হয়ে ক্লাবের গেটে গেছি। বিস্ফোরণের আগে আমি এস পি'র গাড়িটা ক্লাব ছেড়ে যেতে দেখিনি। আমি ক্লাব প্রাঙ্গণ থেকে জজেব গাড়ি বেবোতে দেখিনি। আমি যখন বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনলাম তখন জজের গাড়ি ক্লাব প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে আসেনি। এর জন্য আমি অপেক্ষা করিনি। বিস্ফোরণের পর আমি আর্তনাদ তুলে ছুটতে থাকি। ক্লাব থেকে আর কেউ ছুটে এসেছিল কিনা আমি জানিনে। তাঁকে তাঁর গাড়ি বারান্দার নীচে দেখবার আগে জজ সাহেবকে আমি দেখিনি। বিস্ফোরণের পর গাড়ি থেকে আগুনের শিখা ওঠে। শাদা শিখা। গুলি ছুঁড়লে যেমন হল্কা বেরোয় তেমন। আমি সইসকে রাস্তার ধারে দেখলাম। ফিয়াজুদ্দিন আমাব পাশেই ছিল।

দ্বিতীয়বারের জবানবন্দীতে বলে, আমরা শাদা পোষাকে ছিলাম। মিঃ কেনেডির গাড়ি বেরিয়ে আসবার ৫।১০ মিনিট পর আমরা ক্লাব প্রাঙ্গণেব গেটে পৌছোলাম।

১০ নং সাক্ষী ফিয়াজুদ্দিন জেরার উত্তরে বলে, আমি ও তহশীলদার খান বরাবর একসঙ্গে ছিলাম। ক্লাবের গেট পর্যন্ত যাবার আগে আমরা রাস্তার উত্তরে র‍্যাকেট কোর্টের কাছে ছিলাম। বিস্ফোরণের আগে আমি জজের গাড়ি ক্লাব প্রাঙ্গণ ছেড়ে যেতে দেখিনি। আমি সে রাত্রে জজের গাড়ি মোটেই দেখি নি। আমি এর আগে কেনেডির গাড়ি দেখেছি। বিস্ফোরণের পর ওটা আমি ডাকবাংলোর কাছে দেখি।

আদালতের জিজ্ঞাসার জবাবে বলল, আমি সে রাত্রে গাড়িটা আদৌ দেখিনি।

আদালত : তবে তুমি বললে কেন তহশীলদার খান দেখল ও আমায় বলল ?

সাক্ষী : আমি গাড়িটা ঐ অবস্থায়ই দেখি, পরদিন ওটা একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ অবস্থায় ছিল। আমি গাড়িতে কোন আগুনের শিখা দেখিনি। শিখা জ্বলে ওঠে এবং আগুন ধরে যায়। আমি গোল পোষ্ট পর্যন্ত চলে আসি। তারপর আমি

জজ-কোঠির গেটে আসি। সইস তখন রাস্তার পাশে পড়ে ছিল। 'দেখো ভাই, বাপরে বাপ, দৌড়্তে যাও' বলে চীৎকার করতে করতে আমি ছুটে যাই।

১২ নং সাক্ষী জেরার উত্তরে বলল, দুটি লোক যখন ছুটে যাচ্ছিল তখন আমার মনে কোন সন্দেহ হয়নি।

১১ জুন ক্ষুদিরামের দায়রা বিচারের তৃতীয় দিন। মজঃফরপুর কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হেড ক্লার্ক কেশবলাল চ্যাটার্জি জেরার উত্তরে বললেন, আমি বন্দীকে কালেক্টরের আদালতে ২রা সাড়ে সাতটায় দেখেছিলাম। ভগবতীচরণবাবুর মেয়েব বিয়েব কথা আমার মনে আছে, তারিখটা মনে নেই। এটা গুড্ ফ্রাইডের ছুটিব সময়। আমি সেখানে "ববাত" দেখতে গেছলাম, বরযাত্রীরা ধর্মশালায় উঠেছিল। আমি সেখানে বন্দীকে দেখিনি। আমার বন্ধুর নাম রাজেন্দ্রলাল মিত্র। তিনি ২ তারিখে কাছারিতে ছিলেন কিনা জানিনে। আমি তাঁর সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করেছি, কেননা, তাঁব সঙ্গে এ নিয়ে আমার কি আলাপ হয়েছিল তার কিছুই কালেক্টরকে না বলায় বন্দীর ব্যাপারে আমার স্মরণশক্তি সম্পর্কে সন্দেহ জেগেছে।

আদালতের জিজ্ঞাসাব উত্তবে বললেন, হ্যাঁ আমি সুনিশ্চিত। আমি যে তারিখে বন্দীকে কালেক্টর-আদালতে দেখি সেদিন তাঁর মাথার চুল ছিল আরও লম্বা। তাঁর চেহারায় কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করিনি। আমার প্রবল ধারণা, এই বন্দীই সেই মানুষ।

ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে মহতাব ধর্মশালার ভৃত্য খেমান কাহার নিজেকে চৌকিদার বলে পরিচয় দিয়েছিল। একথা সে দায়রা আদালতে অস্বীকার করল। চেপে ধরলে সে বলে, আমি চৌকিদার। কিশোরীবাবু আদেশ দেন বন্দী ও তাঁর সঙ্গীকে এক সঙ্গে থাকবার একটা ঘর ঠিক করে দিতে। আমি তাই করে দি। ভগবতীচরণের "বরাত" যখন পৌছে গেল আমাকে তখন কিছু-দিনের জন্য ধর্মশালা পরিষ্কার রাখার আদেশ দেওয়া হ'ল। অন্যান্য মুসাফিরকে চলে যেতে বলা হ'ল, কেবল থাকলেন পশ্চিম বারান্দায় এই দু'জন। আট-দশ দিন আমি তাঁদের দেখিনি; কেননা, "বরাত"-এর জন্য দরজা বন্ধ ছিল। আট দশ দিন পর আমি বন্দীকে দেখলাম পশ্চিম বারান্দার অদূরে রান্না করছেন। যেদিন বোমা ফাটে সেই রাত্রেই আটটার সময় আমি দু'জন আউরতের মৃত্যু খবর পাই। ঐ দু'জন যখন ধর্মশালায় ছিলেন আমি তখন মাঝে মাঝে তাঁদের দেখেছি। বন্দীর তালা-দেওয়া ঘর কি ক'রে ভাঙা হ'ল আমি বলতে পারব না।

জেরার উত্তরে বলল, "বরাত" থাকতেই তখন ধর্মশালায় পুলিস এসেছিল। ব্যাগটা নিশ্চয়ই বন্দী ও তাঁর সঙ্গীর কাছে ছিল যখন তাঁরা পশ্চিম বারান্দায় যান। কিন্তু আমি সেটা দেখিনি। কালেক্টর খোলার আগে ঘরে বন্দীর জিনিসপত্র আমি দেখিনি। আমি বারান্দাতেও এসব কিছু দেখিনি। আমি বরাতের সময় একজন চৌকিদার ছিলাম কিন্তু আমি ঝাঁট দিই নি। ঐ সময় দিনরাত্রি গেট বন্ধ থাকত। বরাত-এর লোকেরা সদর গেট দিয়ে যাতায়াত করত, ঐ গেটটা সর্বক্ষণ খোলা থাকত।

ফরিয়াদীপক্ষ থেকে আবার জবানবন্দী নেওয়া হলে সে বলে, সদর ফটকই হচ্ছে উত্তরের গেট। পশ্চিমে যে আর একটি গেট, "বরাত"-এর লোকেদের জিনিসপত্রের নিরাপত্তার জন্য সেটি বন্ধ থাকত। যখন বরাত সেখানে ছিল তখন আমি ধর্মশালার ভেতরে যেতাম। আমি সেখানে থাকতাম। চৌকিদারের ডিউটি দিতে নয়।

ধর্মশালায় চাপবাসী রামধারী বলল, চার বছর আগে কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এ আসবার সময় থেকে আমি এই কাজে আছি। (এব আগে সে বলেছিল ১১ বছর)। যখন ধর্মশালায় আসেন তখন বন্দীদের সঙ্গে কোন তল্পিতল্পা দেখিনি। বন্দী তাঁদেরই একজন কিনা বলতে পারব না। এই রকমই বয়স হবে। মুসাফিরদের সম্পর্কে আমার কিছু করবার ছিল না।

জেবাব উত্তরে বলল, আমার অফিস ধর্মশালায়।

সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর কনস্টেবল ফতে সিং বলল, পিস্তলটা তাঁর কোমর থেকে পড়ে গেছল। তাঁর কোটটা ছিল একটা সার্টে জড়ানো। সার্টটা ধুতিতে গোঁজা ছিল। ওটা মাটিতে পড়ে নি। কোট পকেটে কি পাওয়া গেছল আমার মনে নেই। এই দেশলাই ও মোমবাতি তাঁর সার্টের পকেটে ছিল। আমি ঠিক বলতে পারব না, ঘড়ি ও চেন পাওয়া গেছল কিনা। টাকার খুঁতিটা ধুতিতে গোঁজা ছিল। কতকগুলো কার্তুজ কোট পকেটে ছিল।* ছোট পিস্তলটা তাঁর কোমর থেকে টেনে বের করা হয়েছিল। যতটা আমি দেখতে পেয়েছিলাম, আর একটা তাঁর পাশ থেকে পড়েছিল। যখন তিনি খাচ্ছিলেন তখন আমি কোটটা কোথায় ছিল দেখেছিলাম। লুকোনো ছিল। তখন কোনো পিস্তল ঝুলতে দেখিনি। তিনি যখন জল খাচ্ছিলেন তখন আমি তাঁর কোট দেখতে চেষ্টা করিনি। দেশলাই আর মোমবাতি ছাড়া সার্টের পকেটে কিছু পাওয়া যায়নি।

আবার ফরিয়াদীপক্ষের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলে, তাঁর সঙ্গে কোন ম্যাপ বা বই পাওয়া যায়নি। একটা টাইম টেবিল ছিল। আমি কোন নক্সা লক্ষ্য করিনি।

শিউপ্রসাদ মিশির আর একজন সশস্ত্র বাহিনীর কনস্টেবল। জেরার উত্তরে বলল, ধুতির খুঁটে কিছু ছিল কিনা আমার মনে নেই। ঘড়ি ও চেন কোন এক পকেটে ছিল, সার্টের পকেট না কোটের পকেট বলতে পারব না। কার্তুজগুলো পকেটে ছিল। ছোট কার্তুজগুলো ছিল কুর্তার পকেটে। কোটটা লুকোনো ছিল, খানিকটা দেখা যাচ্ছিল।

ফরিয়াদী পক্ষের আবার জিজ্ঞাসাবাদে বলল, দু রকমের কার্তুজ ছিল। কার্তুজগুলো দেখানো হ'লে বলল, এখন দেখছি তিন রকম। কোন্ কার্তুজ কোন্ জায়গায় পাওয়া গেছল মনে করতে পারছিনে।

রংপুরের উকিল, বাবু সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী আদালতের কাছে এই সময় বন্দীর সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা বলবার অনুমতি চাইলেন, টিফিনের মুলতুবি কালে সেই অনুমতি পাওয়া গেল।

ক্ষুদিরাম ও উকিলের সংলাপ

সশস্ত্র প্রহরী-বেষ্টিত ক্ষুদিরামের সঙ্গে যে আলাপ হ'ল পুলিস তা কান পেতে শুনল, ইন্সপেক্টর ভূপেন ব্যানার্জী সব কথাই টুকে নিলেন।

ক্ষুদিরাম বললেন, আমি মেদিনীপুর শহরের অধিবাসী। বাপ মা নেই, ভাই নেই, কাকা, মামা কেউ নেই। এক দিদি আছেন, তাঁর অনেক ছেলেপুলে, বড়টি আমার সমবয়সী। মেদিনীপুরে, জজের হেডক্লার্ক, বাবু অমৃতলাল রায়ের সঙ্গে দিদির বিয়ে হয়। ওরাই আমার একমাত্র আত্মীয়। অবিনাশচন্দ্র বসুও আমার আত্মীয় কিন্তু আমার সম্পর্কে তাঁর কোন আগ্রহ আছে বলে মনে হয় না।

আমি সেকেণ্ড ক্লাশ পর্যন্ত পড়েছিলাম। আমি দু'তিন বছর আগে পড়া ছেড়ে দিয়েছি। তখন থেকে আমি স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করি, সেই থেকে আমার জামাইবাবু (ভগ্নিপতি) অমৃতলাল রায় আমাকে ত্যাগ করেন। আমার মা নেই, আমার বাবা দশ এগারো বছর আগে মারা গেছেন। আমার সৎমা ছিলেন। তিনি তাঁর ভাই সুরেন্দ্রনাথ ভঞ্জের কাছে থাকতেন। আমি তাঁর ঠিকানা জানিনে, কি করেন তাও জানিনে।

প্রঃ তুমি কি কাউকে দেখতে চাও?

উঃ হ্যাঁ, আমি একবার মেদিনীপুর দেখতে চাই, আমার দিদি ও তার ছেলেপুলেদের।

প্রঃ তোমার মনে কোন কষ্ট আছে ?

উঃ না, কোনরকমই না।

প্রঃ আত্মীয়স্বজনকে কোন কথা জানাতে চাও কি ? অথবা তাদের কেউ এসে তোমায় সাহায্য করুক এমন ইচ্ছে করে কি ?

উঃ না, আমার কোন ইচ্ছাই তাঁদের জানাবার নেই। তাঁরা যদি ইচ্ছে করেন আসতে পারেন।

প্রঃ জেলে তোমার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করা হয় ?

উঃ মোটামুটি ভাল। খাবারটা (ভাতটা ?) বড় মোটা, আমার ঠিক সহ্য হয় না। শরীরটা খারাপ ক'রে দিয়েছে। নচেৎ, আমার সঙ্গে অসৎ ব্যবহার করা হয় না। আমাকে একটা নিঃসঙ্গ সেলে আটকে রাখে, সেখানেই দিন-রাত্রি থাকতে হয়। একবার মাত্র স্নান করার সময় বেরিয়ে আসতে দেওয়া হয়। একা থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। সংবাদপত্র বা অন্য কিছু পড়তে দেওয়া হয় না। এগুলো পেতে খুবই ইচ্ছে করে।

প্রঃ কোন রকম ভয় করে তোমার ?

এ প্রশ্ন শুনে ক্ষুদিরাম একটু হাসলেন, বললেন, ভয় করবে কেন ?

প্রঃ গীতা পড়েছ ?

উঃ হ্যাঁ, পড়েছি।

প্রঃ তুমি জান, আমরা রঙপুর থেকে তোমার পক্ষসমর্থনে এসেছি ? কিন্তু তুমি তো এর আগেই দোষ স্বীকার করেছ।

ক্ষুদিরাম হেসে জবাব দিলেন : কেন করব না ?

উকিলেরা তখন তাঁকে ভগবানের নাম স্মরণ করতে বললেন। ক্ষুদিরাম আশ্চর্য সংযম ও স্থৈর্যের পরিচয় দিলেন প্রত্যেকটি কথা বলবার সময়। মনে হল তিনি একান্তই নিস্পৃহ ; তাঁর মুখে চোখে ভয়ের লেশমাত্র নেই।

সাব-ইন্সপেক্টর চতুর্বেদী শর্মা জেরার উত্তরে বললেন, দীনেশের ফতুয়াটা সম্ভবতঃ পুরানো ছিল। ধুতিটা শাদা ও নতুন। আমি কখনও সমস্তিপুর যাইনি।

সিংভূমের সাব-ইন্সপেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জি জবানবন্দীতে বলল, মজঃফরপুর থেকে সিংভূম রওনা হবার আগেই আমি দীনেশকে ধরতে পারলে পুরস্কার দেবার ঘোষণা শুনেছিলাম। পয়লা তারিখে আমি দীনেশকে হত্যাকাণ্ডের

কথা বলি। তাঁকে বেশ কৌতূহলী মনে হ'ল। আমি স্বদেশী ও ভলান্টিয়ার আন্দোলনের কথা তুললাম। যে পিস্তল দিয়ে দীনেশ আত্মহনন করেন সেটা দেশ ঘরা ছিল। আমি ঘর গুণে দেখিনি। পিস্তলটার ম্যাগাজিনে কয়েকটি তাজা কার্তুজ ছিল।

জেরার উত্তরে বলে, সমস্তিপুরে জুতো ও কাপড়ের দোকান আছে। দীনেশের দেহে কত টাকা পাওয়া গেছল তা আমার স্মরণ নেই। আমি দীনেশের সঙ্গে গোলাগুলি সম্পর্কেও আলাপ করেছি। তিনি জার্মান গোলাগুলির কথা বলেন। দীনেশ নদীর জল খেতে সমরিয়াঘাটে গেছলেন। তিনি স্নান করেন নি।

ক্ষুদিরামের চতুর্থ দিনের দায়রা বিচার (১২ জুন) আরম্ভের আগে হিজ হাইনেস লেঃ গবর্ণর এক বিশেষ হুকুমনামায় কালেক্টর মিঃ উডম্যান ও এস-পি মিঃ আর্মষ্ট্রংকে তাঁদের তৎপরতার সঙ্গে ক্ষুদিরাম ও দীনেশকে ধরে ফেলবার জন্য যে ধন্যবাদ জানান তা পড়া হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি নন্দলাল ব্যানার্জি, কনস্টেবল শিউশঙ্কর ও ফতেসিং এবং মজঃফরপুরের জুনিয়ার কোর্ট ইন্সপেক্টরেরও ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

পোস্টম্যান যোগেশ্বর তেওয়ারী জেরার উত্তরে বলে, বাবু ভগবতীচরণের "বরাত" ধর্মশালায় চারদিন ছিল। আমি এই কদিন সেখানে চিঠি বিলি করেছি। কখনও পশ্চিম গেট দিয়ে কখনও উত্তর গেট দিয়ে ভেতরে ধর্মশালা গেছি। "বরাত"-এর ব্যবস্থা দেখবার জন্য কিছু পুলিসকে দেখেছিলাম। ও জায়গার আশেপাশে অনেক গাড়ি ছিল। কিন্তু বলতে পারব না কারা "বরাত"-এর পর এসেছিল। আমি ধর্মশালায় ৯ এপ্রিল দীনেশ চন্দ্র রায়ের মনি অর্ডার দিয়েছি। দীনেশের নামে ঐ একটাই মনি অর্ডার আমি এনেছিলাম। সেটা "বরাত"-এর আগে না পরে তা মনে করতে পারছিনে। তাঁর নামে কোন চিঠি ডেলিভারি দিয়েছি ব'লে মনে পড়ে না। দিয়ে থাকতেও পারি। আর যদি তা কিশোরী-বাবুর কেয়ারে (প্রযত্নে) এসে থাকে তবে তা অফিসেই গেছে।

"বরাত"-এর জন্য আমি দু'চারজন পুলিসকে পাহারায় থাকতে দেখেছি। আমি ধর্মশালার উঠোনে দেখেছি—কোন ঘরেও নয়, বারান্দায়ও নয়।

মজঃফরপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট রোল্যাণ্ড চন্দ্র বলেন, তিনি জেলে এক-জোড়া জুতো ক্ষুদিরাম বসুর পায়ে মিলিয়ে দেখতে যান; ক্ষুদিরাম যেচে বলেন ও জুতো তাঁর। জেরার উত্তরে বলেন, জুতো জোড়া ল্যাটিমার এণ্ড ক্রীকের তৈরি কিনা বলতে পারব না। আমি ল্যাটিমার এণ্ড ক্রীকের তৈরি বুট ও

জুতো দেখেছি। জুতোর বৈশিষ্ট্য আমি বলতে পারব না। আমি শুধু অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। এই জুতো অতি সুবিদিত। আমি একবার ল্যাটিমার এণ্ড ক্রীকের জুতো দেখেছিলাম। আমার ভাই পরেছিল, তাতে প্রস্তুত-কারকের নাম ছাপা ছিল। এখানকার জুতোয় সেরকম কোন চিহ্ন দেখতে পাচ্ছিনে। (বন্দী সঙ্গে সঙ্গে স্বেচ্ছায় বললেন: "এ আমার।")

কর্ণেল গ্রেঞ্জারের সাক্ষ্য দাখিল ও এসেসরদের তা পড়ে শোনাবার সময় আদালত প্রেস রিপোর্টারদের অনুরোধ করলেন তাঁরা যেন এ প্রকাশ না করেন।

এরপর ক্ষুদিরাম প্রাক্-সোপর্দ তদন্তের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বার্থুডের কাছে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তা এসেসরদের উদ্দেশে পড়ে শোনানো হল। যখন এই বিবৃতিটি দাখিল করা হয় তখন জজ মন্তব্য করেন, বিবৃতিতে প্রশ্নোত্তর বড় দীর্ঘ এবং বন্দীকে যেন জেরায় ফেলা হয়েছিল। "I do not think", জজ মন্তব্য করলেন, "I can take it in". জজ এখানে কার্যবিধির ৩৪২ ধারাটি পড়ে বললেন, "The statement of the accused should not be used to fill up the gap in the evidence of prosecution".

মিঃ মানুক: ম্যাজিষ্ট্রেট লিখেছেন, আমার বাধা দেবার কোন অধিকার ছিল না।

জজ: হ্যাঁ, দেখছি। (ফৌঃ কাঃ বিধির ৩৪২, ২৮৭ ধারা পড়লেন) "Yes, I shall let it in, but the weight to be given to this statement, is a matter of discretion with me".

ফরিয়াদীপক্ষের মামলা শেষ হল। আদালত ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞাসা করলেন: কোন সাক্ষী আছে?

ক্ষুদিরাম জবাব দিলেন: না।

আদালত মানুক ও কালিদাস বসুকে বললেন: আপনারা সওয়ালে কত সময় নেবেন? তাঁরা বললেন, এক ঘণ্টার মত। জজ ও এসেসরগণ তখন বাইরে এসে মিঃ কেনেডির বিধ্বস্ত গাড়িটা দেখলেন।

(২২)

এই পটভূমিকায় বাঙলার বিপ্লব প্রচেষ্টায় তৃতীয় শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর পূর্ব পরিচয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনী বলতে একখানি: ঈশানচন্দ্র মহাপাত্রের 'শহীদ ক্ষুদিরাম'। মহাপাত্র মশাইর আর একখানি ইংরেজী বই:

Boy Revolutionary of India. বাংলা বইখানির প্রকাশকাল স্বাধীনোত্তর ১৯৪৮, ১১ আগষ্ট। ফাঁসীর ঠিক ৪০ বছর পর। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে "বৈপ্লবিক যুগের আদিপর্বের অগ্নিসাধক ও বোমাশিল্পী সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র কানুনগো মহাশয়ের করকমলে"। ভূমিকা লিখেছেন ডঃ কালিদাস নাগ, লিখেছেন, "বহু পরিশ্রমে রচনা করেছেন·· ক্ষুদিরামের নিজ ভগ্নী ও অন্য আত্মীয় বন্ধুদের কাছে গিয়ে কাহিনীগুলি সংগ্রহ করেছেন।" ১৯৪৭, ১১ আগস্ট প্রকাশিত ইংরেজী বইখানি সম্পর্কে লেখক স্বয়ং বলেছেন, "তাড়াতাড়ি লিখিত।" ভুলভ্রান্তির জন্য প্রকাশকের তাগিদকে দায়ী করেছেন। লেখার তারিখ আগষ্ট ১৯৩৭। মেদিনীপুরের উকিল, এম-এ বি-এল। প্রকাশকের বন্ধু। তৃতীয় একখানি বইয়ের নাম "শহীদ-যুগল," তাতে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লর জীবনী আছে। লেখক নোয়াখালার মানুষ, খুব খেটে লিখেছেন।

যে-কোন জীবনী সম্পর্কে বলা যায়, সূর্যাস্তের বর্ণচ্ছটা সংশ্লিষ্ট জীবনের বাল্য-কৈশোর তারুণ্যকে বাড়িয়ে তোলে, প্রখ্যাতির আতস-কাঁচে বাল্য-কৈশোর তারুণ্যের সূত্রগুলো ফুটে ওঠে। ক্ষুদিরামের জীবনের ব্যাপ্তি বিংশ বর্ষও স্পর্শ করেনি, ঈশানবাবুর হিসাবে কিঞ্চিন্ন্যূন ১৯ বছর, জন্ম ১০৮৯, ৩ ডিসেম্বর, ফাঁসী ১৯০৮, ১১ আগষ্ট। পিতা ত্রৈলোক্যনাথ বসু। মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়া, তিন কন্যা তিন পুত্রের মধ্যে ক্ষুদিরাম কনিষ্ঠ। ক্ষুদিরামের আগে দুই পুত্রের, একটি সূতিকাগৃহে, একটি পাঁচ-ছয় বছরে মারা যায়। লক্ষ্মীপ্রিয়া কালীমন্দিরে 'হত্যা' দিয়ে ক্ষুদিরামকে লাভ করেন, দৈববাণী হয়, অল্প বয়সে অমরত্ব লাভ করবেন (পৃঃ ১-৩)। ক্ষুদিরামের সংমা ছিলেন সুশীলাসুন্দরী (পৃঃ ৪)। স্থানীয় সংস্কার—আঁতুড় ঘরে সন্তান বিক্রি করলে সন্তান দীর্ঘজীবন লাভ করে। জ্যেষ্ঠা কন্যা অপরূপার কাছে খুদের বিনিময়ে বিক্রি, তাই থেকে ক্ষুদিরাম। [বানান হওয়া উচিত ছিল খুদিরাম, প্রচলিত বানান ক্ষুদিরাম, আমি তাই রেখেছি]। ক্ষুদিরামকে খুদের বিনিময়ে হয়তো বাল্যে রক্ষা করা গেল কিন্তু মা মারা গেলেন যখন তাঁর বয়স মাত্র ছয় (বঙ্গাব্দ ১৩০২)। চার মাস পর পিতৃবিয়োগ হয়। পিতৃমাতৃহীন কনিষ্ঠ কন্যা ও কনিষ্ঠ পুত্র ক্ষুদিরামের ভার নেন জ্ঞাতিভ্রাতা অবিনাশচন্দ্র বসু। ত্রৈলোক্যনাথের মৃত্যুর পর বসতবাটিও দেনার দায়ে বিক্রি হয়ে গেছল। মহাপাত্র মশাই ক্ষুদিরামের বড়দিদি অপরূপার কথা উদ্ধৃত করে বলেছেন, ক্ষুদিরাম (গিরিশ মুখোপাধ্যায়ের) পাঠশালায় অতি দুর্দান্ত ছাত্র ছিলেন, লেখাপড়ায় বিশেষ অনুরাগ ছিল না। নিত্যকর্মের মধ্যে ছিল গাছে

ওঠা, পুকুরে ডুব দেওয়া, পাখীর বাসায় ঢিল ছোঁড়া ইত্যাদি। পাড়াপড়শীরা এসে নানা অভিযোগ করতেন। কালীমাতার স্বপ্নলব্ধা বলে অপরূপা ভাইকে কিছু বলতেন না। অপরূপার স্বামী অমৃতলাল রায় তমলুকে বদলি হন (পৃঃ ১৫)। আনন্দপুরে অবিনাশবাবুর শ্বশুরগৃহে অবস্থানকালে ক্ষুদিরাম লাঞ্ছিত বোধ করে সে আশ্রয় ত্যাগ করেন ও পিত্রালয়ের নিকট কৃত্তিবাস্ বসুর গৃহে আসেন। কৃত্তিবাসের স্ত্রী ক্ষুদিরামের ধর্মমাতা হন। সেখানে আটদিন বাসের পর তমলুক অমৃতলাল-আলয়ে আসেন। সেখানে হ্যামিল্টন উচ্চবিদ্যালয়ের সপ্তমশ্রেণীতে ভর্তি হন। রাধাবল্লভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব, হাতে উল্কি আর বি বি (পৃঃ ১৮)। [কোন সময়ে বা মামলায় এই আর বি বি (বা রাধাবল্লভ বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রসঙ্গটি ওঠে নি, এ এক বিস্ময়।]

ক্ষুদিরাম মার্বেল খেলায় ওস্তাদ ছিলেন। একদিন মার্বেল খেলার সময় এক ফেরিওয়ালার সঙ্গে খাবার নিয়ে ক্ষুদিরামের এক সঙ্গীর কথা কাটাকাটি হলে ফেরিওয়ালা গালমন্দ দেয়, ক্ষুদিরাম লাথি মেরে ফেরিওয়ালার ঝুড়ি ফেলে দেয়। ফেরিওয়ালা হেডমাস্টারের কাছে নালিশ করলে হেডমাস্টার ক্ষুদিরামকে ডেকে পাঠান। ক্ষুদিরাম হেডমাস্টারকে বলেন, ফেরিওলা অশালীন কথা বলেছে। হেডমাস্টার ক্ষুদিরামের সৎসাহস লক্ষ্য করে সতর্ক করে ছেড়ে দেন (Boy Revolutionary of India, Mahapatra. p. 10)।

ঈশানবাবু এমনি অনেক শোনা কথা তাঁর বাংলা ইংরেজী বইয়ে দিয়েছেন। একবার তমলুকে কলেরা মহামারী দেখা দেয়। এক রাত্রে চার পাঁচটি কলেরা রোগীকে পোড়াতে হয়, বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করে তাঁর কি সাহস আছে গভীর রাতে শ্মশানের অমুক গাছের অমুক পাতা ছিঁড়ে আনার? ক্ষুদিরাম সে সাহস প্রতিপন্ন করেন। মন্মথনাথ বসু নামে এক ব্যক্তি বলেছেন, ক্ষুদিরাম উঁচু গাছ থেকে লাফিয়ে পড়েছেন (ইংরেজী বইয়ে অবশ্য আহত হবার কথা আছে)। জীবন্ত সাপ ধরে খেলা করে ছেড়ে দেবার গল্পও কেউ কেউ করেছেন।

ঈশানবাবু লিখেছেন, অমৃতবাবু মেদিনীপুর বদলি হয়ে এলে ক্ষুদিরাম সেখানকার কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন (১৯০৪)। অতি প্রখ্যাত রাজনারায়ণ বসু (অরবিন্দ বারীন্দ্রের দাদামশাই) সে স্কুলের প্রধান শিক্ষক। রাজনারায়ণের অন্যতম ভ্রাতা অভয়চরণ বসুর পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ। এঁদের মধ্যে গুপ্তসমিতির কল্পনা জাগে (পৃঃ ২৭)। কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হবার পর থেকে ক্ষুদিরামের মানসিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ, স্বামী

বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠ করেন। সংবাদপত্র পড়েন। বন্ধুবান্ধব মহলে এ নিয়ে আলোচনা করেন। প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত থাকেন। (ইতিমধ্যে স্যার হার্বার্ট রিজলির বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব প্রকাশিত হয়েছে। ১৯০৫ সালের ৫ অক্টোবর মেদিনীপুর শহরে বেলী হলে প্রতিবাদ সভা এবং বঙ্গভঙ্গ রদ না হওয়া পর্যন্ত বিদেশী পণ্য ও আমোদ-আহ্লাদ বর্জনের শপথ নেওয়া হয়)। ক্ষুদিরাম এইসব উদ্যোগ আয়োজনে থাকেন, চাঁদা তোলেন, সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের আপ্যায়ন করেন। স্কুলের লেখাপড়াব প্রতি আগ্রহ হ্রাস পায়। বিলাতী চিনি, লবণ ও কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করেন (পৃঃ ৪০-৪৩)। "এই আন্দোলনই ক্ষুদিরামের জীবনের মোড ফিরাইয়া দিল। ১৯০৫ সালের শেষ ভাগ হইতে প্রায়ই স্কুলে অনুপস্থিত, ১৯০৬ সাল হইতে একেবারেই অনুপস্থিত থাকিতে লাগিলেন।" এসব কারণে ক্ষুদিরাম সত্যেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সর্বত্রই ক্ষুদিরামের ডাক, বিলাতী বস্ত্রে অগ্নিসংযোগ, বিলাতী চিনি, লবণেব গাড়ি লুট বা মালবোঝাই নৌকা নিমজ্জনে স্বেচ্ছাসেবকদলে তাঁর জোড়া নেই। খাওয়া দাওয়া অনিয়মিত, মাঝে মাঝে বাড়িতে অনুপস্থিত। বালিশ, বিছানার নীচে, জামার পকেটে স্বদেশী কথার কাটিং। সেবাকাযে, বন্যাত্রাণে দারুণ অনুরাগ (পৃঃ ৪৫)। ভগ্নীপতি ও দিদির উপদেশ পরিহারের জন্য গৃহত্যাগ। পত্র—(১) "সংসারী নয়, তাঁহার জীবন কোন মহত্তর কার্যে ব্যয়িত হইবে। (২) ভগ্নীপতি সরকারি চাকুরে, তাঁহাকে বিপন্ন করা সমীচীন নয় (পৃঃ ৪৬)।" মাসাধিক পরে গৃহ প্রত্যাবর্তন।

মহাপাত্র মশাই অমৃতবাবু সম্পর্কে ভুল ধারণা ভেঙে দিতে লিখেছেন: "অমায়িক প্রকৃতির মানুষ, রূঢ় কর্কশভাষায় অভ্যস্ত নন। ক্ষুদিরামের প্রতি স্নেহ ও মধুর ব্যবহার। ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলাজজ (ক্ষুদিরামকে) তাড়িয়ে দিতে অন্যথায় কর্মচ্যুত করবার ভয় দেখিয়েছিলেন। কিন্তু অমৃতবাবু তাড়ান নি। জবানবন্দীতে বিপরীত কথা বলার কাবণ যেন অমৃতবাবু / দিদির উপর কোন অত্যাচার না হয় (পৃঃ ৫৪)।

১৯০৫ সালের শেষভাগে ক্ষুদিরামের সঙ্গে হেমচন্দ্র কানুনগোর প্রথম পরিচয় হয়, হঠাৎ কানুনগোর বাইক আটকে সাহেব মারবেন বলে রিভলভার চান। কানুনগো বাহ্যিক বিরক্তি প্রকাশ করেন (পৃঃ ৫৫)। মেদিনীপুরের পুরাতন জেলে কৃষি প্রদর্শনী হয় ১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ। সেখানে মেদিনীপুরের গুপ্ত সমিতির পক্ষ থেকে ইস্তাহার বিলির ভার পড়ে ক্ষুদিরামের

উপর। মেদিনীপুর বোমার মামলা ও সরকারি বিবরণীতে এটি 'বন্দেমাতরম্' পুস্তিকা বলা হয়েছে। আলিপুরে বোমা মামলার এডভোকেট বি কে বসুও তাই বলেছেন। কিন্তু হেমচন্দ্র বলেছেন ওটা "সোনার বাংলা" (পৃঃ ৫৬)। পুস্তিকাখানির ইংরেজী অনুবাদ বেরোয় "পায়োনিয়ারে।" অত্যাচারী পুলিস ও শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীর মনে দারুণ আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। ওরই বাংলা অনুবাদ সত্যেন্দ্রনাথ হাজারখানেক ছাপান, বিতরণের ভার পড়ে ক্ষুদিরামের উপর। ভাষা ও ভাব বিদ্রোহিতায় পূর্ণ (পৃঃ ৫৭)। প্রস্তাবিত সভার দিন ক্ষুদিরাম নিশ্চিন্ত মনে "সোনার বাংলা" বিলি করিতেছিলেন। কলেজিয়েট স্কুলের ব্যায়াম শিক্ষক ক্ষুদিরামকে এই রাজদ্রোহমূলক পুস্তিকা বিতরণে নিষেধ করেন (পৃঃ ৫৮)। ক্ষুদিরাম কর্ণপাত না করায় তিনি পুলিসকে ধরার জন্য বলেন। কনস্টেবল রামলাল উপাধ্যায় ওগুলো ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করলে ক্ষুদিরাম তার নাকে-মুখে ঘুসি মারেন। সত্যেন্দ্রনাথের হস্তক্ষেপে আপাতত মুক্ত হন, পরে সন্ধান চলে (পৃঃ ৫৯)। সত্যেনের কাছে ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েস্টনের কৈফিয়ৎ তলব (পৃঃ ৬০)। আলিগঞ্জের তাঁতশালায় পুলিস ইন্সপেক্টার নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ক্ষুদিরামকে গ্রেপ্তার করেন। ক্ষুদিরাম স্বেচ্ছায় ধরা দেন। "বহুপ্রকার প্রলোভন, শাস্তি ও নির্যাতনের ভয় দেখাইয়াও পুলিস তাহার নিকট হইতে কোন তথ্য সংগ্রহ করিতে পারে নাই। একই উত্তর—আমি কিছুই জানি না" (পৃঃ ৬১)।

১৯০৬, এপ্রিল, ক্ষুদিরাম অভিযুক্ত ও দায়রা সোপর্দ হন। তরুণ বয়সের অজুহাতে, প্রকৃতপক্ষে সাক্ষীপ্রমাণাভাবে, তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। সরকারপক্ষ সত্যেন্দ্রনাথকেও সাক্ষী মেনেছিলেন। কিন্তু তাঁর সাক্ষ্য ক্ষুদিরামের অনুকূলে যায়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উক্তি করার জন্য তাঁর চাকরী যায় (পৃঃ ৬১-৬২)। দায়রা জজ ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যে-তাঁকে পুস্তিকা বিতরণের ভার দিয়েছিল সে আদালতে আছে কিনা। ক্ষুদিরাম বলেছিলেন, নেই (পৃঃ ৬২)।

ঈশান মহাপাত্র লিখেছেন, মুক্তিলাভের পর ক্ষুদিরামকে বহু পুষ্পমাল্যে ভূষিত করে কে বি দত্তের ঘোড়ার গাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়, মিছিলে স্বদেশী সঙ্গীত হয়, 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দেওয়া হয়। সে সময় অরবিন্দ মেদিনীপুরে ছিলেন। ক্ষুদিরামের মিছিল তাঁর সমীপবর্তী হলে তিনি ক্ষুদিরামকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করেন।

মহাপাত্র মশাইর মতে ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে মামলা বাঙলাদেশের বিপ্লবী-দলের বিরুদ্ধে প্রথম মামলা। মুক্তিলাভের পর ক্ষুদিরামের বীরত্বকাহিনী ছড়িয়ে

পড়ল। নানা জায়গায় নিমন্ত্রণলাভ। গুপ্ত সমিতির সভ্য সংখ্যাও বৃদ্ধি পেল (পৃঃ ৬৪)। (সাক্ষী) রামচরণের উত্তমমধ্যম লাভ হল (পৃঃ ৬৫)। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন 'বন্দেমাতরম্', 'সন্ধ্যা'র এজেন্ট, ক্ষুদিরাম অন্যতম বিতরণকারী। কদাচিৎ ভগ্নীগৃহে আসিতেন। ক্ষুদিরাম স্কন্ধে দেশী কাপড় লইয়া বিক্রি করিতেন। 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গান গেয়ে সভা পরিচালনা, স্বাস্থ্য-চর্চা ও লাঠি-খেলা শেখানো হ'ত (পৃঃ ৬৭)। মহাপাত্র মশাই ক্ষুদিরামের "প্রচণ্ড বেগে লাঠি ঘোরানোর দক্ষতা" উল্লেখ করেন।

ঈশানবাবু ক্ষুদিরামের ভগ্নীপতি অমৃতবাবুর সপক্ষে ৫৩-৫৪ পৃষ্ঠায় যে-কথা বলেছেন তার সঙ্গে ৬৯ পৃষ্ঠার কথাগুলোর সামঞ্জস্য নেই। কথাগুলো এই: ভগ্নীগৃহে ক্বচিৎ আসেন, অমৃতবাবুকে এড়িয়ে চলেন। "পুলিস তাহার উপর কড়া নজর রাখিল। অমৃতবাবুও ক্ষুদিরাম-সঙ্গ পরিহার করেন, পুলিস কর্মচারী, ম্যাজিস্ট্রেটের তাড়নায় অমৃতবাবু অস্থির। ভগ্নীর শ্বশুরবাড়ি হাটগাছিয়ায় ডাক লুট, অমৃতবাবুর কাছে ক্ষুদিরামের স্বীকারোক্তি, পত্র লিখে গৃহত্যাগ, রণপায়ে মেদিনীপুর শহর আগমন। ডাক লুট ব্যাপারে মঙ্গলা দলইর আট মাস সশ্রম কারাদণ্ড। অতঃপর ভগ্নীগৃহ একেবারে বন্ধ, তাঁতশালা নয়তো ছাত্রভাণ্ডার অথবা সত্যেন্দ্র-গৃহে (৭০-৭১ পৃঃ)।

মহাপাত্র মশাই মেদিনীপুর রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে ক্ষুদিরামের ভূমিকা উল্লেখ করেছেন। এখানে সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নরমপন্থীদের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ-ক্ষুদিরাম প্রমুখের বিরোধ ঘটে। এঁরা চেয়েছিলেন স্বরাজ এবং তা আবেদন-নিবেদনের পথে নয়। স্বেচ্ছাসেবকগণের হাতে লাঠি ও বুকে বন্দেমাতরম্ ব্যাজ নিয়েও বিরোধ। শেষ পর্যন্ত নরমপন্থী ও গরমপন্থীদের দুটি পৃথক সম্মেলন হয়। অতিথি আপ্যায়নের ভার ছিল ক্ষুদিরামের উপর (পৃঃ ৭৩-৭৪)।

ক্ষুদিরামের বিশিষ্ট সহকর্মীদের মধ্যে যোগজীবন ও সত্যেন্দ্রনাথ অস্ত্র আইনে অভিযুক্ত, যোগজীবন মুক্ত, সত্যেন্দ্রনাথ দু'মাস কারাদণ্ডিত (পৃঃ ৭৬)। পরে মানিকতলা বোমা মামলায় রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে আলিপুর জেলে হত্যার দায়ে কানাইলাল দত্তের সঙ্গে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।

মহাপাত্র মশাই ক্ষুদিরামের প্রচারকার্যের বিবরণও দিয়েছেন—কাঁথি তমলুক, ওড়িশা। সঙ্গী ক্ষীরোদনাথ ভুঞা। পরিব্রাজকের বেশে, দেশী মোটা ধুতি, গায়ে মোটা জামা, মাথায় পাগড়ী, নগ্নপদ, হাতে চিকণ বাঁশের লাঠি, পৃষ্ঠে শয্যার বোঝা, কিছু বই, গীতা, ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডি, স্বদেশী সঙ্গীত। পদব্রজে

ঘামনা গ্রাম। লাঠি-ছোরা খেলা শিক্ষাদান। দিনের বেলা প্রচারকার্য, সন্ধ্যায় ব্যায়ামচর্চা, রাত্রে গুপ্ত পরামর্শ।

লেখক দিগম্বর নন্দের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ নন্দের বয়ানে (১৯৪৭, ২৯ সেপ্টেম্বর) লিখেছেন: ক্ষুদিরাম বাবুর একখানি ডায়েরি থাকিত ইহা জানি তবে তাহা এখানে রাখিয়া যান নাই। খেলোয়াড়দের মধ্যে যাঁহাকে যাঁহাকে ক্ষুদিরাম পছন্দ করিতেন তাঁহাদের লইয়া গিয়া বাঁকুড়া জেলার ছেঁদা পাথর মৌজার জঙ্গলে বন্দুক শিক্ষা দিতেন (পৃঃ ৭৮-৮৩)। ঈশানবাবু লিখেছেন: ছেঁদাপাথর জঙ্গল যখন দিগম্বর বাবুদের সম্পত্তি ছিল তখন দিগম্বর বাবুর অনুমতি লইয়া পাহাড় ঘেরা জঙ্গলের মধ্যে একটি গুপ্ত অস্ত্রাগার স্থাপিত হইয়াছিল এবং তথায় বন্দুক, রিভলভার প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইত। সেখানে পুলিসের, সর্বসাধারণের গতি-বিধির সুবিধা ছিল না।" লেখক "ক্ষুদিরামের অন্যতম বিপ্লবী সহকর্মী—কাঁথি আদালতের অন্যতম উকিল শরৎচন্দ্র পট্টনায়কের" বয়ানে লিখেছেন (১৯৪৭, ১ আগষ্ট): "ছেঁদাপাথর নামক স্থানে নন্দবাবুদের কাছারির সম্মুখে একটি কূপের মধ্যে রিভলভার তলোয়ারাদি লুকাইয়া মাটি চাপা দেওয়া হইয়াছিল। ক্ষুদিরাম তথায় গিয়া বন্দুকাদি পরিচালনার নেতৃত্ব করিতেন। বিদ্রোহ আন্দোলনের সময় আমি [মানে পট্টনায়ক] তথায় গিয়া ঐ কূপের মাটি তুলিবার মনস্থ করিয়াছিলাম, কিন্তু সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই।

"বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় সত্যেন্দ্রনাথ বসু মেদিনীপুরের নেতা ছিলেন। আমি ক্ষুদিরাম ও যোগজীবনের সহিত একত্রে ব্যায়ামচর্চা করিয়াছি। লাঠি তলোয়ার, কুস্তিতে ক্ষুদিরাম শ্রেষ্ঠ ছিল। মধ্যে মধ্যে বন্দুক ও রিভলভার ইত্যাদির ব্যবহার গোপনে শহরের পশ্চিমে গোপ অঞ্চলে শিক্ষা করা হইত এবং ক্ষুদিরাম প্রায়ই সঙ্গে থাকিত। ক্ষুদিরাম সত্যেন্দ্রনাথ বসুর আদেশ অনুসারে কাজ করিত" (পৃঃ ৮৪-৮৬)। ঈশানবাবু ক্ষুদিরামের "হৃদয় গ্রাহী বক্তৃতা" দেবার দক্ষতার সংবাদ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন: রায়েন্দাবাজারে এক বৃহৎ স্বদেশী-সভায় ক্ষুদিরাম ঐ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। এখানে তিনি মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় সমিতির জন্য প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন (পৃঃ ৮৭)। লেখক ক্ষুদিরামের আরও বহু কৃতিত্বের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন (পৃঃ ৯০-৯২, ৯৪-৯৫)।

ক্ষুদিরামের গৌরবময় জীবন-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ঈশানচন্দ্র মহাপাত্র দক্ষতার সঙ্গে যে এক বিপ্লবীর জীবনালেখ্য এঁকেছেন তা নিঃসন্দেহে ইংরেজী এই প্রবচনটি স্মরণ করিয়ে দেয় যে, উষাকালেই সারাটা দিনের প্রকৃতি প্রতিফলিত

হয় (Morning shows the day)—যদিও কালবৈশাখীর দেশে এই প্রবচনটি সর্বতোভাবে প্রযোজ্য নয়। গ্রীষ্মপিপাসু শীতের দেশ ইংলণ্ডে এ প্রযোজ্য হতে পারে। বয়সকালে কে কেমন হবে তা বলা শক্ত হলেও যে-কোন সফল জীবনের মূলে তার সন্ধান করা হয়, নিপুণ অনুসন্ধিৎসুর দৃষ্টিতে তা ধরাও পড়ে।

দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, ধরা পড়ার সময় ক্ষুদিরাম ঐ সব নৈপুণ্যের পরিচয় দেবার কোন অবকাশ পান নি। নিয়মিত ব্যায়ামে সুগঠিত দেহ, কুস্তির কৌশল, রিভলভার-চালনার দক্ষতা প্রকাশের সুযোগ পেলেন না। দুটি রিভলভার ও অতিরিক্ত কার্তুজ থাকতেও বড়ই অসহায়ের মতো বেড়াজালে পড়ে গেলেন।

(২৩)

মজঃফরপুর, জুন ১৩ (অমৃতবাজার পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা):— এসেসরদের জন্য মিঃ মানুক হিন্দীতে সওয়াল করলেন এবং ইংরেজীতে একটি রূপরেখা দিলেন। তিনি অভিযোগ-সংশ্লিষ্ট ধারাটি ব্যাখ্যা করলেন এবং বললেন, অপরাধীরা কিংসফোর্ডকে মারতে গিয়ে অন্য কাউকে মেরে ফেলেছে এতে অপরাধ কিছুমাত্র লঘু হয় না। বন্দীর অপরাধ প্রমাণে পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য অতি প্রবল। কৌঁসুলি মিঃ মানুকের মতে দুটি বোমা ছিল। একটি বড় একটি ছোট, জড়াবার তুলোর ওপর যে খাদ আছে তা থেকেই এটি অনুমেয়। কৌঁসুলির মতে দীনেশের এক হাতে একটি ছোট বোমা আর একটি রিভলভার ছিল, রিভলভারটি পাওয়া গেছে কিন্তু বোমাটি নেই। তাই থেকেই বোঝা যায়, ওটি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল এবং দ্বিতীয় বিস্ফোরণ শব্দটি তারই, রিভলভারের নয়।

মিঃ মানুকের পর জজ ক্ষুদিরামের উদ্দেশে বলেন, "তোমারা সাফাই আভি বাবু কালিদাসকি মারফৎ হোগা।

বাবু কালিদাস বসু এসেসরদের এই বিষয়টির উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, বন্দী অপরাধ স্বীকার করা সত্ত্বেও জজ বন্দীর আনুষ্ঠানিক বিচারকার্য চালিয়েছেন। এই থেকে এইটিই অনুমান করতে হয় যে, এসেসরগণ যেন সাক্ষ্যসাবুদ তুলমুল যাচাই করতে পারেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সোপর্দকারী ম্যাজিস্ট্রেট এবং দায়রা জজের কছে বন্দীর অপরাধ স্বীকারের মধ্যে সন্দেহের অবকাশ আছে। বন্দীর বিবৃতিতে দেখা যায়, দীনেশ বাধাস্বরূপ মনে করায় সিল্কের কুর্তাটি বন্দীর হাতে দেন। বন্দী এও বলেছেন যে, তাঁর কাছে যে দুটি রিভলভার ছিল তা বেশ

ভারি। সুতরাং, এইটিই অনুমেয় যে, দীনেশ বোমা ছুঁড়েছে। দ্বিতীয়ত, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও সোপর্দকারী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বন্দীর বিবৃতি দুটির মধ্যে এই কয়টি বিষয়ে পার্থক্য লক্ষণীয়ঃ (ক) কে বন্দীকে এই কাজে প্ররোচিত করেছে (খ) কোথায় তিনি রিভলভার দুটি ও কার্তুজগুলো পেয়েছেন (গ) দীনেশের ঠিকানা। কালিদাসবাবুর মতে, দীনেশকে আড়াল দেবার অভিপ্রায়ে বন্দী অসত্য স্বীকারোক্তি করেছেন, দুটি বিবৃতি তুলনা করে পড়লেই একথা পরিষ্কার হয়ে যাবে। এরপর কালিদাসবাবু যেসব বিষয়ে ঐ বিবৃতি দুটি এবং ফরিয়াদী সাক্ষাসাবুদের মধ্যে বৈসাদৃশ্য বা বৈপরীত্য ঘটেছে সেদিকে এসেসরগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন : (১) ঘটনাকালে বন্দীর গায়ে ছিল ডোরাকাটা কোট, (২) বোমা একটাই ছিল, (৩) যখন তাঁরা (টহলদার) কনস্টেবলদের জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়ে যান তখন বোমাটা বন্দীর বাঁ হাতে ছিল।

টেলরের (Taylor) উদ্ধৃতি দিয়ে, কালিদাসবাবু বলেন, নানা উদ্দেশ্যে অসত্য স্বীকারোক্তি করা যেতে পারে, তিনি দীনেশ ও ক্ষুদিরামের উদ্দেশ্যের তুলনা করে বলেন, কিংসফোর্ডকে হত্যার অভিপ্রায় ক্ষুদিরাম অপেক্ষা প্রফুল্লরই প্রবলতর ছিল। দীনেশ বোমা নিক্ষেপের ব্যাপারে অধিকতর দক্ষ ছিলেন। পক্ষান্তরে, ক্ষুদিরামের দেহভারে ছিল দুটি রিভলভার ও সিল্কের কুর্তা ছাড়াও আরও অনেক ভারি বস্তু। দীনেশের ছিল কিন্তু পুরোনো একটি শাদা ভেস্ট ও একটি ব্রাউনিং পিস্তল। সুতরাং, এটা অসম্ভব যে, ক্ষুদিরাম বোমা ছুঁড়েছেন, দীনেশ নন।

ফরিয়াদী সাক্ষ্যসাবুদের সমালোচনা করে তিনি বলেন, ওঁরা তো কেবল পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য উপস্থিত করেছেন, তাতে অপরাধ নির্ণীত হয় না, প্রত্যক্ষ-ভাবে বন্দীর দোষ ওঁরা প্রতিপন্ন করতে পারেন নি। ঘটনার রাত্রে সাড়ে সাতটা থেকে ঘটনাকালের মধ্যে বন্দী কোথায় ছিলেন তা একেবারেই দেখাতে পারেন নি। ক্ষুদিরামের বিবৃতি অনুসারেও তিনি ডোরাকাটা কোট পরে ছিলেন। উকিল কালিদাস বসুর ধারণা, ক্ষুদিরাম ঘটনার আগে পর্যন্ত দীনেশের সঙ্গে থাকলেও সঙ্কটমুহূর্তে সন্ত্রস্ত হয়ে পিছিয়ে যান। সুতরাং, তিনি সন্দেহের অবকাশ পেতে পারেন। দণ্ড সম্পর্কে বলতে গিয়ে কালিদাসবাবু বন্দীর তারুণ্যের দিকে জজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বলেন, অপরের দ্বারা বিপথ-চালিত। উকিল বসু এই সম্পর্কে দুটি রুলিংয়ের উল্লেখ করেন।

কালিদাসবাবুর বলা শেষ হলে জজ এসেসরদের উদ্দেশে এই বলে মামলার

এক সংক্ষিপ্তসার রাখেন : এই মামলায় আপনাদের যে উদ্দেশ্যে আহ্বান করা হয়েছে, সে সম্পর্কে কয়েকটি ব্যক্তিগত মন্তব্য করতে চাই। আপনাদের আর জুরীর পার্থক্য এই যে, আপনারা শপথবদ্ধ নন। আপনারা কেবল পরামর্শ দিতে পারেন, জজ হিসেবে আমি তা গ্রহণ করতেও পারি, নাও পারি। যদিও এই পার্থক্য বর্তমান এবং জুরীর চাইতে আপনাদেব দায়িত্বও কম, তথাপি সুনাগরিক ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের মতো আপনাদেব পবিত্র কর্তব্য হবে আমাব কর্তব্য পালনে সাক্ষ্যসাবুদ সম্পর্কে সৎ, অকপট ও নিবপেক্ষ অভিমত প্রকাশ করে আমাকে সাহায্য করা। সাক্ষ্যসাবুদ আপনাদেব সামনেই আছে, কেবল তাব উপরই নির্ভব করে বন্দী দোষী অথবা নির্দোষ স্থির কববেন। আপনাদেব অভিমতের যথাযথ মূল্য থাকবেই এবং আমি আপনাদের এই আশ্বাস দিতে পারি যে, তা নিশ্চয়ই তাচ্ছিল্য করা হবে না, পক্ষান্তরে, তা সশ্রদ্ধ বিবেচনাধীন হবে।

এরপর জজ এসেসবদেব এ ক্ষেত্রে আইনেব বিধানগুলোব তাৎপয বুঝিয়ে দেন। যদি কোন লোক হত্যাব উদ্দেশ্যেই কোন কিছু করে বসে তবে তা হত্যাপরাধ হবে। সেখানে এটা কোন অজুহাতই হবে না যে, সে নিহত ব্যক্তির বদলে আর কাউকে হত্যা কবতে চেয়েছিল। যেন সে নিহত ব্যক্তিকেই মাবতে চেয়েছিল এ দায় থেকে যায়। যেখানে একই উদ্দেশ্য সাধনে দুই ব্যক্তি কোন দুষ্কর্ম কবে সেখানে প্রত্যেকেরই দাযভাগ সমান হবে—যেন কেবল সে-ই ওটা করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরুন, ক ও খ একই সঙ্গে একই ধরণের বন্দুক নিয়ে গ-কে হত্যার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল, তারা যদি দুজনেই এক সঙ্গে বন্দুক চালিয়ে থাকে এবং যদি গ মারা যায়, কিন্তু যদি গ-র দেহে একটি মাত্র গুলি পাওয়া যায় তবে সাধারণ বুদ্ধিমতো আইনে (ভাঃ দঃ বিধির ৩৪১ ধারায়) এই ব্যবস্থা আছে যে, কে আসলে হন্তারক তা স্থির করা অসম্ভব হলেও, দু'জনই হত্যার জন্য দায়ী হবে। অর্থাৎ ঘটনাক্রমের মধ্যে অপরাধমূলক উদ্দেশ্যটাই মূল কথা। প্রমাণিত তথ্য থেকেই তা আহরণ করতে হবে। আপনাদের সম্মুখে প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে, বন্দী যদি নিজেই বোমাটি ফেলে থাকে যার ফলে (আদালত প্রাঙ্গণে দেখানো) গাড়িটা বিধ্বস্ত হয়েছে, সইস আহত হয়েছে এবং দুটি মহিলার মৃত্যু ঘটেছে—তবে বন্দীর কি এই মৃত্যু ঘটানো ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে ? বন্দীর নিজস্ব স্বীকারোক্তি বাদ দিলে তাঁর বিরুদ্ধে ঘটনা পরম্পরাগত সাক্ষ্য কিন্তু সুনিশ্চিত, প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের মতোই উৎকৃষ্ট, উৎকৃষ্টতর যদি নাও হয় এবং এ ক্ষেত্রে আইন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য দাবিও করে না।

উভয় এসেসরই ক্ষুদিরাম হত্যাপরাধ করেছেন বলে অভিমত প্রকাশ করেন। এসেসর দু'জনের নাম—বাবু নাথুনীপ্রসাদ ও জানকীপ্রসাদ।

(২৪)

জজ তখন এই মর্মে তাঁর রায় দেন : ৩০ এপ্রিল রাত্রি সাড়ে আটটা নাগাদ মিসেস ও মিস কেনেডি অন্ধকারে গাড়ি করে মজঃফরপুর স্টেশন ক্লাব থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। গাড়িটা যখন জজের বাড়ি ছাড়িয়ে গেছে তখন ঐ গাড়ির ভেতর একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়, বিস্ফোরণ হয়, গাড়িটা ভেঙে যায়, ফুটবোর্ডে দাঁড়ানো সইসকে আঘাতে পঙ্গু করে, দুই মন্দভাগ্য মহিলা এমন ভয়াবহরকমে আহত হন যে, মিস কেনেডি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মারা যান এবং মিসেস কেনেডি ২ মে সকাল পযন্ত বেঁচে ছিলেন। ফরিয়াদে বলা হয়েছে, বোমার লক্ষ্য ছিলেন মজঃফরপুরের জেলা দায়রা জজ মিঃ কিংসফোর্ড ; কিছুকাল আগে তিনি কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট পদ থেকে এখানে বদলি হয়ে আসেন। সেখানে থাকতে তিনি দেশীয় সংবাদপত্রগুলোর বিরাগভাজন হন। স্থানীয় পুলিস খবর পেয়ে মিঃ কিংসফোর্ডের সুরক্ষার ব্যবস্থা করেন, ঘটনার রাত্রে দু'জন কনস্টেবল সাদা পোষাকে স্টেশন ক্লাব ও কিংসফোর্ডের বাসস্থানের মধ্যবর্তী স্থানে ডিউটিতে ছিল এবং পাহারা দিচ্ছিল। এই কনস্টেবলরা দু'টি বাঙালি তরুণকে ওখানে ঘোরাফেরা করতে দেখে, তাদের মোকাবিলা করার প্রয়োজনও বোধ করে, ওদের তফাৎ যেতে বলে। কনস্টেবলরা বলে, বর্তমান বন্দীই ঐ দুজনের মধ্যে ছোট। অল্পক্ষণ পরেই এক বিস্ফোরণ হয়। ম্যাজিস্ট্রেট অবিলম্বে ঘটনাস্থলে এসে পৌছোলে কনস্টেবলরা খবর দেয় এবং ম্যাজিস্ট্রেট তাদের মুখে ঐ তরুণ দুটির চেহারার বর্ণনা শোনেন। তৎপরতার সঙ্গে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ফলে, বন্দী ২৫ মাইল দূরবর্তী রেলস্টেশনের কাছে ওয়েইনিতে ধরা পড়ে। আরও একটি বাঙালি মর্মান্তিক ঘটনার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মোকামে রেল স্টেশনে ধরা পড়ে ; সে সেখানেই আত্মহত্যা করে।

বন্দীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে হত্যার; বিকল্পে হত্যানুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার এবং হত্যাকার্যে সহায়তা করার। সাক্ষ্যসাবুদের সারাংশ এসেসরদের বলেছি এবং তা আমার স্মারকলিপিতে গ্রথিত করেছি। স্মারকলিপিটি এই রায়েরই অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে গণ্য করলে তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। আমার

অনুরোধ, তাই করা হোক। তাহ'লে রইল বাকি আমার সিদ্ধান্ত ও তার সপক্ষে যুক্তি লিপিবদ্ধ করা। আমার মতে ঘটনাপরম্পরার পরিপার্শ্বগত সাক্ষ্যসাবুদ প্রভৃত এবং আমার মতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারার দিকে লক্ষ্য রেখে এটি সংশয়াতীতরূপে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, বন্দী মিস ও মিসেস কেনেডির ইচ্ছাকৃত হত্যার জন্য দায়ী। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের তৎপরতার কল্যাণে এবং স্বয়ং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের তাৎক্ষণিক ও ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে আগাগোড়া যেরকম যত্ন ও দক্ষতার সঙ্গে পুলিসী তদন্ত চালিত হয়েছে তা সর্বতোভাবে অনিন্দনীয় ও তাতে লেশমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। অতএব, একমাত্র ঘটনাপরম্পরাগত পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যেই বন্দীকে হত্যাপরাধে দোষী সাব্যস্ত করতে আমার কোন দ্বিধা নেই এবং উভয় এসেসরের সঙ্গে একমত হয়ে আমি তাই করলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি মনে করি, একথা বলা সঙ্গত যে, মিঃ উডম্যানের কাছে বন্দীর স্বীকারোক্তি এবং (দায়রায়) অভিযুক্ত হবার পরও বন্দীর অপরাধ স্বীকার আন্তরিক ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, এ বিষয়েও সংশয়ের কোন কারণ দেখিনে। আমি একথাও বলতে পারি যে, আমার মতে কোচম্যান সত্য কথাই বলেছে এবং বোমা-নিক্ষেপকারী বলে বন্দীকে সনাক্ত করতে সমর্থ হয়েছে। তার সাক্ষ্য আরও ভাল করার প্রতি তার যে ঝোঁক দেখা গেছে সেটা খুব সজ্ঞান নয়, এবং তার মতো সাক্ষীর এই আচরণ দুর্বোধ্যও নয়। দণ্ড দেবার ব্যাপারে উকিল কালিদাস বসু আমার উদ্দেশে যে করুণা প্রদর্শনের আবেদন জানিয়েছেন তা আমি যথাযথ ভেবেছি; তিনি আমার প্রস্তাবমতো বন্দীর পক্ষে দাঁড়িয়েছেন এবং আদালতের সাধুবাদ তাঁর প্রাপ্য। কিন্তু লঘুদণ্ডের কোন যুক্তিই আমি পাচ্ছিনে and I need not, I think, prolong the prisoner's agony and suspense, if indeed he feels, I would fain hope him capable of feeling either by one word more. The sentence of the Court is that the prisoner Khudiram Bose be hanged by the neck. আদালতের দণ্ড—ক্ষুদিরামের ফাঁসিতে মৃত্যু।

এই জজই তাঁর স্মারকলিপিতে লিখেছেন: **সোপর্দকারী ম্যাজিস্ট্রেট যেভাবে বন্দীর জবানবন্দী নিয়েছেন তা অনেকটা চার্চের পাপীকে পুঙ্খানুপুঙ্খ জিজ্ঞাসাবাদের মতো। বহু প্রশ্ন করেছেন—৫৫টি প্রশ্ন —কোন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর ক্ষেত্রেই যা কেবল করা যেত। এই মামলা পরিচালনা আগাগোড়া যেরকম প্রশংসালাভ করেছে**

সেক্ষেত্রে আমি সখেদে এই প্রতিকূল মন্তব্য করতে বাধ্য হচ্ছি। আমার উপর যদি জুরীদের বোঝাবার ভার থাকত তবে আমি তাঁদের বলতাম এইরকম জবানবন্দী বাদ দিয়ে যদি তাঁরা বন্দীকে দোষী সাব্যস্ত করতে অপারগ হন তবে তাঁরা বন্দীকে মুক্তি দেবার কথা বলবেন।

তাহলে বিবেচ্য প্রশ্ন দাড়াচ্ছে এই যে, এটা কি প্রতিপন্ন হয়েছে যে, বন্দীই বোমাটা ছুঁড়েছেন এবং সেই বোমা ছোঁড়ার ফলেই মিসেস ও মিস কেনেডির মৃত্যু হয়েছে ? দ্বিতীয়ত, যদি তা না হয়, যদি এটা প্রমাণিত হয় যে, তিনি নিজে বোমাটা ছোঁড়েন নি, তাঁর সঙ্গী ছুঁড়েছেন তবে ভাঃ দঃ বিধির ৩৪ ধারামতে বন্দী কি ঐ কৃতকর্মের জন্য দায়ী ? তৃতীয়ত, এটা কি পরিষ্কার যে, মৃত্যু ঘটানোর উদ্দেশ্য ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যে বোমাটা ছোঁড়া হয়ে থাকতে পারে ? এই দুটি প্রশ্নের জবাব যদি ইতিবাচক হয় তবে বন্দী প্রথম-বর্ণিত অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হবেন। যদি তা না হয় তবে বিকল্প দায় বিবেচনা করতে হবে এবং নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে হবে। চতুর্থত, এটি কি পরিষ্কার নয় যে, বন্দী যদি নিজে বোমা না ছুঁড়ে থাকেন তাঁর সঙ্গী যখন বোমা ছুঁড়েছিলেন তিনি তখন সেখানে সঙ্গে ছিলেন এবং তিনি হয় (ক) সঙ্গীকে বোমা ছুঁড়তে প্ররোচিত করেছেন নতুবা (খ) কখন বোমাটা ছোঁড়া হবে তা নিয়ে সঙ্গীর সাথে শলা করেছেন নতুবা (গ) উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে সঙ্গীর প্রস্তুতিতে বা অবৈধ দুষ্কার্যে সহায়তা করেছেন। (গ) প্রশ্ন সম্পর্কে একথা মনে রাখতে হবে, কোন ব্যক্তি যদি জানে যে, কোন দুষ্কৃতি হতে যাচ্ছে তবে সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষকে খবর পৌছে দিয়ে সে হত্যাকাণ্ড নিবারণ করতে আইনত বাধ্য। এই বিকল্পটি যদি আদৌ বিবেচ্য হয় এবং চতুর্থ ও পঞ্চম প্রশ্নের জবাব যদি ইতিবাচক হয় তবে বন্দী বিকল্প অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হবে।

বস্তুত ক্ষুদিরামের এই বিকল্প অভিযোগেই মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। নিজে বোমা ছোঁড়ার জন্য নয়, একই উদ্দেশ্যে বোমা ছুঁড়তে সঙ্গীকে সহায়তা করা বা প্ররোচনা দেবার জন্যে (ভাঃ দঃ বিধির ৩৪ ধারা)।

দণ্ডদানের পর জজ বন্দীকে বলেন, তিনি যদি হাইকোর্টে আপীল করতে চান তবে তিনি তা সাতদিনের মধ্যে জেল সুপারিন্টেণ্ডেন্টের মারফৎ করবেন। তিনি বিনামূল্যে এক কপি রায় পাবেন।

বন্দী বললেন, এখানে উপস্থিত সকলের সামনে আমি কিছু বলতে চাই।

জজ : এখন আর সে সময় নেই। আমি শুনতে চাইনে।

বন্দী : যদি সুযোগ দেওয়া হয় তবে কিভাবে বোমা তৈরি হয়েছে তা বলতাম।

জজ বন্দীকে জেলে অপসারণের আদেশ দেন।

সংবাদদাতা প্রসঙ্গত আরও জানিয়েছেন, এক সপ্তাহ ধরে মামলার শুনানী অসাধারণ স্থৈর্যের সঙ্গে শুনে আজ তাঁকে ক্লান্ত ও পাণ্ডুর মনে হচ্ছিল। দিনের পর দিন মামলা শুনেছেন নির্ভীক ও উদাসীনচিত্তে। অন্যান্য দিন তাঁকে মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়তে দেখা গেছে। কিন্তু আজ তিনি মাঝে মাঝে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে শুনছিলেন, মাঝে মাঝে যেন একেবারেই নির্লিপ্ত হয়ে যাচ্ছিলেন। জজ যখন এসেসরদের ব্যাপারটা বেশ ভালভাবে বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন তখন একাধিকবার তাঁকে মৃদু মৃদু হাসতে দেখা গেছে। জজ যখন রিভলভার দুটি উদ্ধারের বর্ণনা দিচ্ছিলেন তখন যেন বেশ কৌতুক বোধ করছিলেন। জজ ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁকে যে দণ্ড দেওয়া হয়েছে তা তিনি বুঝতে পেরেছেন কিনা। ক্ষুদিরাম মাথা নেড়ে জানালেন বুঝেছেন, বলে মৃদু হাসলেন। তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং তিনি নিরুদ্বিগ্নচিত্তে দণ্ড মেনে নিলেন।

ক্ষুদিরামের উদ্দেশে দণ্ডাদেশের পর জজ কিশোরীমোহন ব্যানার্জির বিরুদ্ধে আনীত মামলা গ্রহণ করেন। অভিযোগ ছিল, তিনি অপরাধীদের আড়াল দেবার জন্য হত্যানুষ্ঠান সম্পর্কে মিথ্যে সংবাদ দিয়েছেন, এটি ভাঃ দঃ বিধির ২০১ ধারা অন্তর্গত। মিঃ মান্নুক সরকারপক্ষে এবং গোবিন্দ চন্দ্র রায় মশাই অভিযুক্তের পক্ষে দাঁড়ান। মিঃ মান্নুক আদালতকে উদ্দেশ ক'রে বলেন, তিনি এই মর্মে নির্দেশ পেয়েছেন যে, তিনি যেন মামলাটি প্রত্যাহারের অনুমতি প্রার্থনা করেন। আদালত এই অনুরোধ রক্ষায় কোন অন্তরায় না দেখায় আনুষ্ঠানিকভাবে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৪ ধারা মতে কিশোরীমোহন ব্যানার্জিকে ছেড়ে দেন।

ইংলিশম্যান রিপোর্টারের কেরামতি : কিশোরীমোহনের মামলাটি উঠতেই ভকিল বাবু গোবিন্দ চন্দ্র রায় আদালতকে সম্বোধন করে বলেন, মামলাটা নেবার আগে "ইংলিশম্যান" প্রকাশিত একটি অনুচ্ছেদের প্রতি মাননীয় বিচারকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এটি "ইংলিশম্যান" প্রতিনিধির টেলিগ্রাম; তাতে আমার মক্কেল সম্পর্কে এমন ভয়ানক কটাক্ষ আছে যা সুবিচারের অন্তরায় হতে পারে। আমার প্রার্থনা, বিচারক এর নিন্দা করবেন।

জজ বললেন, যখন কোন মামলা বিচারাধীন তখন এরকম লেখা অত্যন্ত অসঙ্গত, বলে তিনি একটি হুকুমনামা লিপিবদ্ধ করেন। জজ তারপর ভকিলকে বলেন, তিনি (ভকিল) কি তাঁকে (জজকে) আরও কিছু করতে বলেন ?

ভকিলঃ আপনার এরকম কঠোর মন্তব্য প্রকাশের পর আর কিছু অনাবশ্যক। জজ সংবাদপত্র-প্রতিনিধিদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, "ইংলিশ-ম্যানের" প্রতিনিধি কে ?

স্থানীয় টেলিগ্রাফ অফিসের মিঃ কার্টিস জবাব দিলেন, আমি "ইংলিশম্যানের" প্রতিনিধি। আমি সরকারি চাকুরে এবং এই প্রথম আমি প্রতিবেদকের কাজ করেছি। আমি এ বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিমত ও অনুভূতি প্রকাশ করেছি।

বিচারকার্যে হাত দেবার আগে জজ নিম্নোক্ত হুকুমনামা লিপিবদ্ধ করেন: "ইংলিশম্যানে" প্রকাশিত একটি বিষয়ের প্রতি বাবু গোবিন্দ চন্দ্র রায় আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ওতে এমন কিছু মন্তব্য আছে যা তিনি তাঁর মক্কেলের প্রতি ক্ষতিকারক বলে মনে করেছেন। এটি ক্ষুদিরাম বসুর মামলা সংক্রান্ত; ৯ তারিখের "ইংলিশম্যানে" প্রকাশিত হয়েছে। আদালত স্বয়ং লেখাটি দেখেছেন এবং বলতে দ্বিধা নেই যে, এটি অন্যায় ও অসঙ্গত বলে নিন্দনীয় এবং এটি আদৌ প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল না। ধরে নিচ্ছি ও আশা করছি, এটির প্রকাশ অবিবেচনাপ্রসূত এবং এর জন্য আর কোন ব্যবস্থা নেওয়া অপ্রয়োজন।

(২৫)

পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা লাহেরিয়াসরাই থেকে ১৪ জুন জানালেন, জেলে-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে ক্ষুদিরাম নাকি দায়রা জজের দণ্ডের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীলের ইচ্ছা জানিয়েছেন। আজ সকালে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দায়রা জজের রায় পেয়েছেন। মজঃফরপুর ছেড়ে আসবার সময় এ খবর পেলাম। মিঃ কার্ণডফ পুলিস প্রহরায় আজ বাঁকিপুর গেলেন।

অমৃতবাজার পত্রিকা ক্ষুদিরামের প্রাণদণ্ড নিয়ে নানা কথার মধ্যে লিখলেন: "আমাদের সবিনয় অভিমত, আইনের বিধানে যে বিকল্প (যাবজ্জীবন দীপান্তর) দণ্ড আছে তা দিলেই আইনের মর্যাদা রক্ষিত হত।…আমাদের স্বীকার করতে

বাধা নেই আমরা বরাবর মৃত্যুদণ্ডের বিরোধী।" ২০ জুন একই মর্মে আর একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখলেন: জনচিত্তের বীরপূজার অনেকখানি উষ্ণতাই হ্রাস পেয়ে যেত যদি কর্তৃপক্ষ কোন জনপ্রিয় নায়কের ক্ষেত্রে অকারণ অকৃপা প্রকাশ না করতেন।...বিচারকালে ক্ষুদিরাম যে সহিষ্ণু আচরণ দেখিয়েছেন, অকুতোভয় নির্লিপ্ততার পরিচয় দিয়েছেন, যখন জজ এসেসরদের অভিযোগের তাৎপর্য বুঝিয়ে দিচ্ছেন তখনও তাঁর স্মিত মুখ, তাঁর তারুণ্য, উচ্চভাবাপন্ন অভিব্যক্তি—সব-কিছু সাধারণের চিত্তে একটা স্নেহের আসন সৃষ্টি করেছিল। এমন একটি স্নেহভাজনের ফাঁসীর দৃশ্য বহু ভারতীয়ের হৃদয় স্পর্শ করতে বাধ্য। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকার একটু কৃপা প্রদর্শন করলেই এটুকু এড়ানো যেত। বিশেষ ক'রে যাঁরা মৃত্যুদণ্ডের বিরোধী তাঁদের কাছে এটি একটি মহৎ দৃষ্টান্ত হয়ে থাকত।

অমৃতবাজার পত্রিকা ৭ জুলাই মজঃফরপুর বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কে লিখেছেন, হাইকোর্টে আজ ক্ষুদিরামের আপীলের শুনানীর দিন। বাবু নরেন্দ্রকুমার বসু ক্ষুদিরাম বসুর পক্ষে আবেদন করলেন, আজ যেন মামলাটা না ওঠে। তিনি বললেন, তাঁকে নথিপত্রগুলো দেখতে হবে।

বিচারপতি ব্রেট: নথিপত্রগুলো কিছুকাল ধরেই তো এখানে আছে।

ভকিল: আমি সবে শুক্রবার মামলার বইটি পেয়েছি, আমি নথিপত্রগুলো দেখতে চাই। আমার অনুরোধ আজ যেন বিচারপতিগণ মামলাটা না তোলেন।

বিচারপতি ব্রেট: বেশ, তবে আগামীকাল তুলব।

অপরাহ্ণ চারটেয় বাবু নরেন্দ্রকুমার বসু বিচারপতিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, মামলার নিদর্শনগুলো হাইকোর্টে নেই।

বিচারপতি ব্রেট: নিদর্শনগুলোর কি প্রয়োজন? সে তো অপরাধ স্বীকারই করেছে।

ভকিল: বিচার আরম্ভের আগে সে দোষ স্বীকার করেছে কিন্তু কার্যত সে তা প্রত্যাহার করে নিয়েছে।

বিচারপতি ব্রেট: না তো। কি নিদর্শন এবং কেন চান?

ভকিল: আমি বিশেষ ক'রে টিনের কানেস্তারাটি চাই। আমি দেখাবো যে, এইসব জিনিস তার পক্ষে বহন করা অসম্ভব। বিচারপতি মহোদয়গণ এখনও তো সাক্ষ্য শোনেন নি, কোন অভিমত পোষণ করতে পারেন না। নিম্নতর আদালতে, বলতে গেলে, তার পক্ষ-সমর্থনই কিছু হয়নি। এখানে আমার মক্কেলের জন্য যথাসাধ্য করতে আমি বাধ্য।

বিচারপতি ব্রেট : আমরা কোন অভিমত পোষণ করছিনে।

বিচারপতি রিভস্ : আপনি কি ঘটনাক্রমে যেতে পারেন ?

ভকিল : জজ যদি অপরাধ স্বীকার গ্রহণ করতেন এবং তাতেই দোষ সাব্যস্ত করতেন আমি ঘটনায় যেতে পারতাম না। কিন্তু এক্ষেত্রে অপরাধ-স্বীকৃতিতে তো আর দণ্ড হয়নি।

বিচারপতি ব্রেট : নিদর্শনগুলো পাঠানো হয়নি কেন ?

ভকিল : এসিস্ট্যাণ্ট রেজিস্ট্রার আমাকে বলেছেন, সচরাচর নিদর্শনগুলো চেয়ে পাঠাতে হয়।

বিচারপতি ব্রেট : আপনার কি কি নিদর্শন চাই ?

ভকিল : আমি সব নিদর্শনই চাই, বিশেষ করে টিন ও ব্যাগ।

বিচারপতি ব্রেট : গাড়িটা চাই নে ?

ভকিল : ওটা তো নিদর্শন (exhibit) নয়।

বিচারপতি ব্রেট : রিভলভার ও কার্তুজ কেন চাই ?

ভকিল : এসব জিনিস বহন করা সম্ভব কি না দেখা।

বিচারপতি ব্রেট : আপনার মক্কেলের জন্য আপনি এগুলো চাইতে পাবেন।

ভকিল, হ্যাঁ, মিলর্ড। আমি যদি জানতাম জিনিসগুলো এখানে নেই তবে আমি সকালেই সেজন্য আবেদন করতে পারতাম। নিদর্শনগুলো (exhibits) নথিপত্রের (records) অঙ্গ।

তখন বিচারপতিদ্বয় এই আদেশনামা লিপিবদ্ধ করেন : সম্রাট বনাম ক্ষুদিরামের মামলা সংক্রান্ত কিছু নিদর্শনের জন্য আবেদন করায় বুধবারের আগেই যেন একজন বিশেষ বাহক মারফৎ সব নিদর্শন এই আদালতে পাঠানো হয়।

৮ জুলাই (১৯০৮) বিচারপতি ব্রেট ও বিচারপতি রিভস্ আবার ক্ষুদিরামের আপীল শুনতে লাগলেন। ক্ষুদিরামের পক্ষে বাবু নরেন্দ্রকুমার বসু বললেন, এই মামলায়, বন্দী পক্ষ-সমর্থনে বিশেষ রকমের নানা বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। যে নির্মম ও অমানবিক প্রকৃতির অপরাধ ঘটেছে তাতে বন্দীর পক্ষসমর্থন কঠিন হয়ে পড়েছে, কারণ, সাধারণ লোক এই অবস্থায় বিচারের কথা ভুলে যেতে চায়। তার উপর আবার বন্দী বলেছে, সে অপরাধী, কিন্তু এই অপরাধ-স্বীকৃতি গৃহীত হয়নি।

বিচারপতি ব্রেট : অপরাধ-স্বীকৃতি নথিভুক্ত আছে।

ভকিল (বসু) : কিন্তু গৃহীত হয়নি। জজ অপরাধ-স্বীকৃতি নথিভুক্ত করতে

আইনত বাধ্য ছিলেন। যদি তিনি অপরাধ-স্বীকৃতি গ্রহণই করতেন তবে তক্ষুণি দণ্ড দিতেন। যদিও বন্দী অপরাধ স্বীকার করেছে তবু বিচারপতিরূপে বিচারকার্যের যে-কোন স্তরে সেই অপরাধ-স্বীকৃতি প্রত্যাহার করতে দেবার এক্তিয়ারও আপনাদের আছে। আপনারা ভালরকমই জ্ঞাত আছেন যে, ইংলণ্ডে ফৌজদারি মামলায় বন্দীকে সর্বদাই অপরাধ-স্বীকৃতি প্রত্যাহারে পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। ইংলণ্ডে এটাও স্থির হয়ে গেছে যে, দণ্ড দেবার আগে যে কোন সময়ে বন্দীর অপরাধ-স্বীকৃতি প্রত্যাহৃত হতে পারে। ল' জার্নাল ১৭, ম্যাজিস্ট্রেটস কেসেস, পৃঃ ১৪৫ থেকে একটি মামলা উল্লেখ করে ভকিল বললেন, তাঁর নিবেদন এই যে, দায়রা জজ তাঁকে যে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন, তা হাইকোর্টের সমর্থন-সাপেক্ষ। এখানে সমর্থিত না হওয়া পর্যন্ত দণ্ড সম্পূর্ণ নয়। ততদিন পর্যন্ত বিচারপতিগণ বন্দীকে অপরাধ-স্বীকৃতি প্রত্যাহার করতে দিতে পারেন। এক্ষেত্রে দায়রা জজ অপরাধ-স্বীকৃতি নথিবদ্ধ করেছেন কিন্তু তারপর সাক্ষ্যসাবুদ নিয়েছেন এইটি দেখতে যে, এই অপরাধ-স্বীকৃতি থেকে স্বতন্ত্র এমন কোন প্রমাণ আছে কিনা যা থেকে বন্দীর অপরাধ প্রতিপন্ন করা যায়। দায়রা জজ তাঁর রায়ে বলেছেন যে, অপরাধ স্বীকার ও ম্যাজিস্ট্রেট-লিখিত বন্দীর স্বীকারোক্তি ছাড়াও পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যসাবুদ বন্দীকে দণ্ডদানের পক্ষে যথেষ্ট। দায়রা জজ অতি সংক্ষিপ্ত এক রায় লিখেছেন এবং এসেসরদের জন্য বন্দীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্যসাবুদের যে সারাংশ করে-ছিলেন তারই সারাংশ স্মারকলিপিরূপে ঐ রায়ের সঙ্গে গ্রথিত করেছেন। এরূপ একটি সারাংশ গ্রথিত করা যে দায়রা জজের পক্ষে আবশ্যিক ছিল না একথা বিচারপতিগণও বলেছেন।

রায়ে যে ঘটনাবলীর কথা বলা হয়েছে, তা এখানে উদ্ধৃত হয়।

ক্ষুদিরাম বসুর আপীল-আবেদনের মর্মকথা এই :

১ নং যুক্তি : আমি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যে বিবৃতি দিয়েছি তা দীনেশ-চন্দ্রকে রক্ষা করবার জন্য ; তিনিই আমাকে এরকম বলতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

২ নং যুক্তি : আমি বলেছি যে, আমি বোমা ছুঁড়েছি, কিন্তু বস্তুত, কে বোমাটা ছুঁড়তে পারে তা বিবেচনার বিষয়। দুটি ভারি পিস্তল, একটা ডোরাকাটা কুর্তা, একটি ডোরাকাটা কাল কোট, একটি সিল্ক কুর্তা এবং বিবৃতিতে উল্লিখিত অতগুলো কার্তুজ—এত জিনিস আমার দেহে থাকতে আমি কি করে বোমা ছুঁড়তে পারি? কিন্তু দীনেশের দেহে ছিল মাত্র একটি বেনিয়ান বা ফ্রক ও একটি চাদর।

৩ নং যুক্তি ঃ দীনেশচন্দ্র আমার চাইতে বলিষ্ঠতর এবং বয়সে বড। আমি আগেই বলেছি, কি করে পিস্তল ছুঁড়তে হয় আমি জানিনে, আমি কখনও গুলি ছুঁড়িনি। তা ছাড়া কি করে আমি এমন একটি ভয়ঙ্কর বোমা ছুঁড়তে পারি ? আমি আবও বলেছি, কিভাবে বোমা প্রস্তুত করতে হয়, দীনেশ জানত। সে আমাকে কিভাবে এ তৈরি করতে হয় তার কিছুই বলেন নি।

৪নং যুক্তি ঃ ফরিয়াদীপক্ষে বলা হয়েছে যে, বোমা ছিল দুটি। প্রথমে আমি বলেছিলাম যে, বোমাটা ঐ টিনে ছিল, কিন্তু অমন দুটি ভয়ানক বোমা ওর মধ্যে বাখা অসম্ভব। বিবৃতি দেবার সময় আমাকে বোমাব আকার জিজ্ঞাসা করায় আমি বলেছিলাম বোমাটা কত বড। আমি যে আকার দেখিয়েছিলাম তা ঐ টিন ভবে যায়। তাহলে কি করে সেখানে আব একটা বোমা রাখা যাবে ?

৫ নং যুক্তি ঃ যে-ব্যাগের মধ্যে বোমা ছিল তাব তুলোর উপর দু'টি চাপ-চিহ্ন। ধর্মশালাব যে-ঘরে আমরা থাকতাম যখন আমাকে সে-ঘরটা দেখাবার জন্য নিয়ে গেছল তখন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ম্যাজিস্ট্রেট উপস্থিত ছিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ব্যাগে দুটো দাগ কিসের ? আমি বলেছি, একটা টিন, একটা বোমা, দুটো জিনিস পৃথকভাবে আনা হয়েছিল, এজন্যই দুটো দাগ। আমাকে এ বিষয়ে আর কিছু বলাও হয়নি, কিছু জিজ্ঞাসাও কবা হয়নি।

৬ নং যুক্তি ঃ দায়রা আদালতে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি আমি আগে যে বিবৃতি দিয়েছি তা সত্য কিনা অথবা আমার কিছু বলার আছে কিনা ইত্যাদি।

৭ নং যুক্তি ঃ দীনেশচন্দ্র আত্মহত্যা করেছে একমাত্র এই কারণে যে সে একান্তই অপরাধী, কারণ সে নিজেই বোমাটা ছুঁড়েছিল। তার নিজের উপর কোন আস্থা ছিল না। সে এই ভয়ে আত্মহত্যা করেছে যে, যদি আমি বন্দী হই অথবা ইতিমধ্যে হয়ে থাকি আমি সব ফাঁস করে দেব এবং তার সমূহ সর্বনাশ হয়ে যাবে। এই কারণে সে আত্মহত্যা করেছে।

সাক্ষ্যপ্রমাণ এবং বন্দীর বিবৃতি পডবার পর ভকিল বন্দীর পক্ষে ঐ সম্পর্কে মন্তব্য শুরু করলেন। তিনি বললেন, বন্দী যে দুটি বিবৃতি দিয়েছেন তার মধ্যে সোপর্দকারী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিবৃতিটি নিম্নোক্ত যুক্তিতে গ্রহণযোগ্য নয় ঃ (১) ম্যাজিস্ট্রেট বন্দীকে বলেন নি যে, বন্দী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিবৃতি দিচ্ছেন। (২) বিবৃতিটি বর্ণনার আকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কোন প্রশ্ন ও কোন উত্তর লেখা হয়নি। ম্যাজিস্ট্রেট ২৬৪ ধারার বিধান মান্য করেন নি। (৩) বিবৃতি

ইংরেজীতে লিপিবদ্ধ হয়েছে, বাংলায় নয়। উডম্যানের সাক্ষ্যে এটি পরিষ্কার যে, বাংলায় বিবৃতি টুকে নেওয়া অসম্ভব ছিল না। ম্যাজিস্ট্রেট যতক্ষণ বিবৃতি লিপিবদ্ধ করছিলেন ততক্ষণ কোর্ট ইন্সপেক্টর ব্যানার্জি উপস্থিত ছিলেন। বন্দীর স্বীকারোক্তি যেদিন লিপিবদ্ধ হয় সেদিন বন্দী তা সই করেন নি।

ভকিল বলেন, অবশ্য ৫৩৩ ধারাবলে এইসব ত্রুটি স্খালন করা যেতে পারে, কিন্তু বারে বারে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, যেখানে বিধানগুলো আদৌ মানা হয়নি সেখানে ৫৩৩ ধারাবলে ত্রুটি স্খালন করা যায় না। ভকিল প্রসঙ্গত ফুল বেঞ্চের একটি ও মাদ্রাজের একটি সিদ্ধান্তের (আই এল আর ১৫, ক্যালকাটা ৫৯২ / ১৭ ক্যালকাটা ৩৬৩ এবং ৯ মাদ্রাজ ২২৪) উল্লেখ করেন। মাদ্রাজের মামলায় বলা হয়েছে, যে ক্ষেত্রে বিবৃতি বন্দীর মাতৃভাষায় লিপিবদ্ধ হয়নি সে ক্ষেত্রে ৫৩৩ ধারাবলে ত্রুটি দূর করা যায় না।

বিচারপতি ব্রেট মন্তব্য করেন : এমন তো হতে পারে যে, বাংলায় বিবৃতি টুকে নেওয়া সম্ভবপর ছিল না।

প্রত্যুত্তরে ভকিল বলেন, মোটেই তা নয়। সেখানে বাংলা-জানা পুলিস অফিসার ছিলেন, তিনি ম্যাজিস্ট্রেটকে বিবৃতি লিপিবদ্ধের কাজে সাহায্য করতে পারতেন।

বিচারপতি রিভস : তিনি সারাক্ষণ সেখানে ছিলেন না।

ভকিল : মিঃ উডম্যান বলেছেন যে, বাঙালি পুলিস অফিসার এবং তিনি সাক্ষ্যগ্রহণে সাহায্য করেছেন।

বিচারপতি ব্রেট : নথিপত্রে কোথাও নেই যে, ইন্সপেক্টর ব্যানার্জি সারাক্ষণ উপস্থিত ছিলেন।

ভকিল : বিচারকার্যের যে-কোন পর্যায়ে ইন্সপেক্টরের জবানবন্দী নেবার প্রভূত ক্ষমতা আপনাদের আছে। ইন্সপেক্টর এখানেই আছেন। ভকিল আরও বলেন, বিবৃতি বাংলায় পড়ে শোনানো হয়, ইংরেজীতে লেখা হয়।

বিচারপতি ব্রেট : আপনার ধারণা, যদিও নথিপত্রে এমন কথা কোথাও নেই যে, যে-সময় বিবৃতি লিপিবদ্ধ হয় সে-সময় বাঙালি অফিসার উপস্থিত ছিলেন এবং যেহেতু বিবৃতি বাংলায় লিপিবদ্ধ হয়নি এজন্য এটি ত্রুটিপূর্ণ ?

ভকিল : হ্যাঁ।

এরপর ভকিল যে-কথাটির উপর জোর দেন তা হচ্ছে, বিবৃতি লিপিবদ্ধ করার সময় মিঃ উডম্যান বন্দীকে বলতে ভুলে গেছলেন যে, তিনি একজন

ম্যাজিস্ট্রেট, আইন মোতাবেক একথা তাঁর বলা উচিত ছিল। তা'ছাড়া, প্রথম যে প্রশ্নটি তাঁর করা উচিত ছিল তা হ'ল এই : বিবৃতি স্বেচ্ছায় দিচ্ছেন কি না।

বিচারপতি রিভস : প্রশ্নটি তিনি করেছেন বিবৃতি লিপিবদ্ধ কবার পর। বিচারপতি মন্তব্য করেন, সংশ্লিষ্ট ধারায় কথাগুলো আছে "এ করা হয়েছে" (It is made), "এ করা হবে" (it would be made) নয়। দশটি মামলার মধ্যে নয়টিতে ম্যাজিস্ট্রেট বন্দীকে জিজ্ঞাসা কবেন, সে কোন বিবৃতি দিতে চায় কিনা এবং বিবৃতি দেবাব পর জিজ্ঞাসা করেন, সে বিবৃতি স্বেচ্ছায় দিল কি না।

ভকিল বলেন, মাদ্রাজের মামলার বিচারপতিগণ এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, অপবাধ-স্বীকৃতি স্বেচ্ছায় হচ্ছে, এ বিষয়ে সুনিশ্চিত হয়েই কেবল ম্যাজিস্ট্রেট তা লিপিবদ্ধ করতে পারেন।

বিচারপতি রিভস : মিঃ উডম্যান তখন জানতেন যে, বন্দী স্বীকারোক্তি করতে যাচ্ছেন।

ভকিল : সংশ্লিষ্ট ধারায় আছে "যখনই কোন আসামী (accused) ইত্যাদি"—

বিচারপতি রিভস : সে তখনও আসামী হয়নি।

ভকিল : যে কাগজে স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ হয় তার শিরোনামা ছিল "আসামীর (বন্দীর) জবানবন্দী" ("Examination of the accused")।

বিচারপতি ব্রেট : তাকে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এই আপত্তি নিম্ন আদালতে তোলা উচিত ছিল, আজকে বিচাবের এই পর্যায়ে এ আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

ভকিল : নিম্ন আদালতে কার্যত তার পক্ষসমর্থনই হয়নি। বর্ণনার ধরণে বিবৃতি লিখনে যে ত্রুটি বর্তমান তা স্খালন করে নেওয়া কর্তব্য ; অন্যান্য ত্রুটি দূর করা যাবে না। মুখ্য ত্রুটি হচ্ছে বন্দীর স্বাক্ষর বিবৃতিদানের দিন নেওয়া হয়নি। এটি আইন মোতাবেক হয়নি এবং এ ত্রুটি দূর করা যায় না।

বিচারপতি রিভস : স্বাক্ষরের উদ্দেশ্য বিবৃতির সত্যতা দেখানো। এক্ষেত্রে বন্দী বরাবর তার বিবৃতি যথার্থ লেখা হয়েছে বলে স্বীকার করে এসেছে।

বিচারপতি ব্রেট : ইন্সপেক্টর কি করে বিবৃতি লিপিবদ্ধ করেছেন ? সংশ্লিষ্ট ধারায় সুস্পষ্ট বলা আছে, স্বীকারোক্তি কোন পুলিস অফিসার লিপিবদ্ধ করবেন না।

ভকিল বলেন, সংশ্লিষ্ট ধারামতে পুলিস অফিসার হিসেবে কোন পুলিস

অফিসারের স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করা নিষেধ; কিন্তু কোন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে কেরানীর মতো স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করায় নিষেধ নেই।

বিচারপতি রিভস: কোন্ ধারায় আছে সাক্ষ্য সেদিনই (স্বীকারোক্তির দিন) নিতে হবে? আমরা আপনার আপত্তি নোট করছি।

ভকিল এর পর বললেন, জজ সাক্ষ্য-নির্ভর কোন সিদ্ধান্ত আসেন নি।

বিচারপতি রিভস: তিনি সব সাক্ষ্যই সন্নিবেশ করেছেন। তিনি পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যই বিশ্বাস করেছেন।

ভকিল: এরকম একটি মামলায় প্রতিটি সাক্ষ্যের অংশে তাঁর সিদ্ধান্ত দেওয়া উচিত ছিল, সর্বার শেষে নয়। জজ যেখানে অপরাধ স্বীকৃতি গ্রহণ করেন নি সেখানে আইন মোতাবেক তাঁর বিচার করা কর্তব্য ছিল। তিনি ৩৪২ ধারামতে বন্দীর জবানবন্দী নেন নি।

বিচারপতি ব্রেট: হ্যাঁ আমরা নোট করে নিলাম, ৩৪২ ধারামতে বন্দীর জবানবন্দী নেওয়া হয়নি।

তারপর ভকিল বলেন, পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যসাবুদ অন্যনিরপেক্ষভাবে অপরাধ সাব্যস্ত করতে পারে না। স্বীকারোক্তি (confession) ও অপরাধ-স্বীকৃতি (admission of guilt) বাদ দিলে পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য যথেষ্ট নয়। এই পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যই বা কি ধরণের? দুটি বালককে জজবাড়ির কাছে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে। একজনের গায়ে একটি শাদা সার্ট, আর একজনের গায়ে একটা আঁট কোট। যে কনস্টেবলকে ওখানে মোতায়েন করা হয়েছিল সে বলেছে, যে-লোকটি বোমা ছুঁড়েছে তার গায়ে ছিল আঁট কোট, কিন্তু সাক্ষ্যে পাওয়া যাচ্ছে, যে বোমা ছুঁড়েছে তার গায়ে ছিল সার্ট। বিচারপতিগণ যদি কনস্টেবলের বন্দীকে সনাক্তকরণ বাদ দেন তবে পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য বন্দীর বিরুদ্ধে যায় না। বন্দী অত্যন্ত কাপুরুষোচিত অপরাধ করেছে এবং পুলিস অফিসারদের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। কনস্টেবল দুটি বাঙালি ছেলেকে ঘটনার এক ঘণ্টা আগে জজবাড়ির কাছে দেখেছে এবং পরদিনই এক বাঙালি তরুণ ধৃত হয়। এটি মোটেই আশ্চর্য নয় কনস্টেবল তাকেই এই অমানুষিক অপরাধের নায়ক বলে সনাক্ত করবে। তারা একটা বর্ণনা দিয়েছিল এ কথা সত্যি, কিন্তু অমন বর্ণনা বহু বালকের ক্ষেত্রেই খাটে। তারপর, বন্দীর জুতো জোড়া ওখানে পাওয়া গেছে বলেই সে বোমা ছুঁড়েছে এ প্রমাণিত হয় না। সে ময়দানে আনাগোনা করত এ সাক্ষ্যে পাওয়া যায়। অতএব তাঁর

বক্তব্য এই যে, যদি তাকে সেখানে দেখাও গিয়ে থাকে, জুতো পাওয়া গিয়ে থাকে, সে খালি পায়ে ধৃত হয়ে থাকে তথাপি তার অপরাধ প্রমাণিত হয় না। আসল কথা হচ্ছে, যে-বোমা ফেলেছিল বন্দী তার সঙ্গী ছিল এবং শেষ মুহূর্তে সে ঘাবড়ে যায় ও পলায়নের পথ ধরে। ভকিল বলেন, এটি শারীরিক বিচারেও অসম্ভব যে, বন্দীর মতো একটি দুর্বল ছেলে অন্ধকার অজানা দেশে দুটি রিভলভার, ৩২টি কার্তুজ ও একটি বোঝা নিয়ে ২৫ মাইল হেঁটে গেছে।

স্বীকারোক্তি ও অপরাধ-স্বীকৃতি সম্পর্কে ভকিল বলেন, বিচারপতিগণ অবগত আছেন, এমন বহু মামলা আছে যেখানে নিরীহ মানুষেরা স্বীকারোক্তি করেছে। ফরিয়াদীপক্ষের বক্তব্য এই যে, এই বালকটি ইচ্ছে করে এই ভয়াবহ অপরাধ সংঘটনের সামর্থ্য রাখে।

ভকিল বলেন, বন্দীর স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য নয়, যদি নিতান্ত গ্রহণ করাও হয়, এর উপর নির্ভর করা যায় না। এই অল্পবয়স্ক বালকটিকে মারাত্মক এক অপরাধে গ্রেপ্তার করে পুলিস অফিসার-পরিবেষ্টিত ডি-এস-পি ও ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে যখন হাজির করা হল, তখন এটা খুবই স্বাভাবিক যে, সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল এবং পরিণতির কথা না ভেবেই কিছু কথা বলে ফেলেছে। বিবৃতিটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, কমসেকম ন'টি মিথ্যা উক্তি তাতে স্থান পেয়েছে।— ঘটনার পাঁচ-ছয়দিন আগে সে সেখানে (মজঃফরপুরে) গেছে, একথা সত্যি নয়। একথা মিথ্যে যে, সে হাওড়াতে দীনেশের সঙ্গে মিলেছে এবং বোমাটি গ্ল্যাড-স্টোন ব্যাগ করে আনা হয়েছে। এটা সত্য নয় যে, তার একটা ডোরাকাটা কোট ও হাতে একটা বোমা ছিল। মিঃ উইলসন ছাড়া আর কেউ দুটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনেনি, বন্দীর হাতে কনস্টেবলও কিছু দেখেনি। একথা মিথ্যে যে, সে বাজারে কার্তুজগুলো কিনেছে এবং সে কলকাতায় মামাবাড়ি থাকত। এমন বিবৃতি গ্রহণযোগ্য নয়।

ভকিল তারপর 'কুইন্স বেঞ্চের' অংশবিশেষ পড়ে মন্তব্য করেন যে, পারি-পার্শ্বিক সাক্ষ্য অপরাধ-স্বীকৃতি দিয়ে সমর্থনীয় নয়। প্রসঙ্গত তিনি কুইন বনাম টমসন (কুইন্স বেঞ্চ ২, পৃঃ ১২) উল্লেখ করে বলেন যে, স্বীকারোক্তি ইতিবাচক-রূপে সত্য প্রতিপন্ন করতে হবে। উল্লিখিত মামলায় দেখানো হয়েছে যে, কোন ক্ষেত্রে স্বীকারোক্তি সত্য নয়।* ভকিল নিবেদন করেন, (ক্ষুদিরামের) স্বীকারোক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাহৃত হোক।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত নারায়ণগড়ে লাটের ট্রেন বোমায় উড়িয়ে দেবার চেষ্টা। "দক্ষ

বিচারপতি ব্রেট মন্তব্য করেন, তাঁরা নথিপত্র দেখে মামলার উপসংহারে আসবেন ; দেখবেন স্বীকারোক্তি ছাড়াও যথেষ্ট সাক্ষ্য আছে কিনা।

এরপর ভকিল বলেন, বোমা নিক্ষেপের সময় সে আদৌ ছিল এমন কোন প্রমাণ নেই। ঘটনার এক ঘণ্টা আগে তাকে দেখা গেছে। এ থেকে এই উপসংহার হয় না যে, সে অপরাধ অনুষ্ঠানের সময়েও উপস্থিত ছিল।

বিচারপতি ব্রেট মন্তব্য করেন, অপরাধ সংঘটনকালে উপস্থিত থাকার কথা সে তো হাইকোর্টে অস্বীকার করেনি যে, কে বোমা নিক্ষেপ করেছে তা বিবেচনা করতে হবে ?

তদুত্তরে ভকিল নিবেদন করেন, বস্তুত সে স্বীকারোক্তি অস্বীকার করেছে। বিচারপতিগণ তার আপীলের আবেদন সত্ত্বেও যে-কোন সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করতে পারেন।

জুলাই ১০, শুক্রবার: ভকিল বাবু নরেন্দ্রকুমার বসু বিচারপতিগণকে বললেন, সেদিন (বুধবার) তিনি বলতে ভুলে গেছলেন দুটি ব্রিটিশ মামলার কথা। সেখানে আছে, অপরাধ-স্বীকৃতি সত্ত্বেও বন্দী বেকসুর মুক্তি পেয়েছে (কিংস বেঞ্চ ১৯০২, পৃঃ ৩৩৮ ও ৩৩৯)। অবশ্য, ঐ দুটি মামলা ও বর্তমান মামলাটির মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। ওগুলো ছিল ষড়যন্ত্র মামলা এবং এক ষড়যন্ত্রকারী অপরাধ স্বীকার করেছিল। অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীরা অপরাধ স্বীকার করেনি এবং তাদের যথারীতি বিচারের পর তারা ছাড়া পায়। যে ষড়যন্ত্রকারী নিজে অপরাধী বলে স্বীকার করেছিল 'কোর্ট অব ক্রাউন রিজার্ভ' এই যুক্তিতে তাকে ছেড়ে দেন যে, যেহেতু জুরী সকল ষড়যন্ত্রকারীকেই মুক্তি দিয়েছেন সেই হেতু যে অপরাধ স্বীকার করেছে তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকে না— অভিযোগ সকলের বিরুদ্ধে ছিল একই।

ভকিল (১৯০২ কিংস বেঞ্চ, পৃঃ ৩৩৯) মামলাটি পড়তে যাচ্ছিলেন, বিচারপতি ব্রেট বললেন, অনাবশ্যক। কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী ঐ রায় থেকে আপনি যে-কথাটা তুলতে চাইছেন তা ৩৪৭ পৃষ্ঠায় আছে। সেখানে এই কথাটা তোলা

গোয়েন্দা" আবিষ্কার করে এক কুলি গ্যাং। রাজসাক্ষীও পাওয়া যায়। ধৃতদের দণ্ড হয়। দণ্ড হাইকোর্টেও সমর্থিত হয়। বন্দীরা দণ্ডভোগ করতে থাকে। অকস্মাৎ বারীন্দ্রের স্বীকারোক্তি —ও কাজটা তাঁদেরই, কুলিদের নয়। গোয়েন্দার কারসাজিতে রাজসাক্ষীর আবির্ভাবও হয়, দায়রা এবং হাইকোর্টের বিচারকগণ? তাঁরাও মেনে নেন, ফলে চরম অবিচার ঘটল নিরীহ নিরপরাধ কুলিদের দুর্ভাগা জীবনে।

হয়েছে যে, আপীলকারীকে অপরাধ-স্বীকৃতি প্রত্যাহারে অনুমতি দিতে আদালত পারেন কিনা, আদালত এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, পারেন রায়ের আগে, পরে নয়। ঐ মামলার ঘটনাবলীও এ মামলা থেকে সর্বতোভাবে পৃথক।

ভকিল: বিচারপতি রিভস গতকাল জানতে চেয়েছিলেন, স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করার এমন কোন মামলা আছে কিনা যেখানে স্বীকারোক্তি অগ্রাহ্য হয়েছে। আমি তেমন একটি মাত্র মামলা খুঁজে পেয়েছি এবং ৮ ক্যালকাটা উইকলি নোটস, পৃঃ ২২এ আছে। তা হচ্ছে, বিচারপতি রামপিনি ও বিচারপতি হ্যাণ্ডলেব সিদ্ধান্ত। হত্যার মামলা। বিচারপতিগণ ২ ক্যালকাটা উইকলি নোটস, ৭০২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মামলার সিদ্ধান্তবলে ম্যাজিস্ট্রেটের লিপিবদ্ধ বন্দীর কোন কোন বিবৃতি অগ্রাহ্য করেন।

বাবু নরেন্দ্রকুমার বসু স্বীকারোক্তিতে তাঁর আপত্তিগুলো উল্লেখ করে বলেন, আমার আপত্তি যে, (১) আমি যেসব যুক্তি দেখিয়েছি সেসব যুক্তিতে স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য নয়, (২) স্বীকারোক্তি যেখানে গ্রহণযোগ্য নয় সেখানে দোষ সাব্যস্ত করার মতো যথেষ্ট সাক্ষ্য নেই; (৩) যদি বিচারপতিগণ স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্যও মনে করেন, নিম্ন আদালতে জজ ৩৪২ ধারা মতে বন্দীর বিবৃতি না নেওয়ায় এবং যথার্থ বিবৃতি না নেওয়ায় বিচারকার্যে চ্যুতি ঘটেছে; (৪) যাই কেন হোক না, মামলাটির পুনর্বিচার হওয়া উচিত।

ভকিল অতঃপর দণ্ড লাঘবের প্রশ্নটি তোলেন। বিচারপতিগণ যদি বন্দীকে হত্যাপরাধে দোষী সাব্যস্ত করেন, সেক্ষেত্রে আমার কেবল এই বক্তব্য, আমি কখনও কোনপ্রকারে অপরাধের প্রকৃতিকে সামান্য করে দেখাতে চাই নি। কিন্তু আমি সশ্রদ্ধ এই অনুরোধ জানাতে চাই যে, বিচারপতিগণ যেন মৃত্যুদণ্ড সমর্থনের আগে বন্দীর অল্প বয়স ও বিচারকালে তার আচরণের কথা স্মরণে রাখেন। এই বালকটি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও দায়রা সোপর্দকারী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যে বিবৃতি দিয়েছে তাতে এটি পরিষ্কার যে, সে অন্য কোন অজ্ঞাত ব্যক্তির হাতে ক্রীড়নক-মাত্র। সে যে যথেষ্ট দৃঢ় মনোবলের অথবা দৃঢ় চরিত্রের বালক নয় তা তার বিবৃতিতে এবং বিচারকালে তার আচরণেই প্রকাশ পেয়েছে। আমি ইতিপূর্বে বলেওছি, আমি অপরাধের গুরুত্ব কোনরকমে লঘু করে দেখাতে চাইনে। কিন্তু বিচারপতিগণ লক্ষ্য করে থাকবেন যে, যদি তাকে দোষী সাব্যস্ত করতে হয় তবে তা একমাত্র তারই নিজস্ব বিবৃতির উপর নির্ভর করে করতে হবে। যে-বিবৃতির উপর নির্ভর করে তাকে দোষী সাব্যস্ত করতে হচ্ছে তা এমন এক বন্দীর বিবৃতি

যার অনুভবশক্তি স্পষ্টতই—মাননীয় জজের মতেই—যথেষ্ট পরিণত নয়। কাজটা তার নিছক অপরাধপ্রবণ ভ্রান্তির পাগলামি। অতএব বিচারপতিগণ, আমার আত্যন্তিক প্রত্যাশা, মৃত্যুদণ্ড সমর্থন করার আগে সমগ্র পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা বিবেচনা করে দেখবেন। বিচারপতিগণের কাছে এই প্রশ্নটিই রাখতে চেষ্টা করেছি যে, উল্লিখিত পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিতে বিবেকসম্মতভাবে মৃত্যুদণ্ড ছাড়া কি কোন বিকল্পই নেই ?

বিচারপতি তখন ক্রাউনপক্ষের (সোজাসুজি, সরকারপক্ষের) ডেপুটি লিগাল রিমেমব্রেন্সার মিঃ অর (Mr. Orr)-কে সম্বোধন করে বলেন, আপনার যদি কিছু বলার না থাকে তবে আপনাকে আমরা ডাকতে চাইনে। মিঃ অর বলেন, ৩৪২ ধারামতে দায়রা আদালতে বন্দীর জবানবন্দী নেওয়া হয়নি বলে যে আপত্তি উঠেছে সেই সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই। প্রথা এই যে, দায়রা আদালতে সোপর্দ করার আগে ম্যাজিস্ট্রেট বন্দীর জবানবন্দী নেবেন এবং ঐ জবানবন্দী ১৮৯৮ আইনের ২৮৮ ধারামতে পেশ করতে হবে। ১৮৯৯ আইনে এর পদ্ধতি পুরোপুরি বিন্যস্ত আছে। আমার বক্তব্য, দায়রা জজ নির্ভুল ও সঠিকভাবে সে পদ্ধতি প্রযোগ করেছেন। ২৮৬ ধারায় বলা আছে, পূর্বে যথারীতি লিপিবদ্ধ জবানবন্দী, অর্থাৎ বন্দীর জবানবন্দী, এবং ৩৪২ ধারামতে সোপর্দকারী ম্যাজিস্ট্রেটের গৃহীত জবানবন্দী অভিযোক্তা (প্রসিকিউটার) পেশ করবেন এবং সাক্ষ্য-হিসেবে পঠিত হবে। তা করা হয়েছে। তারপর ২৮৯ ধারায় বলা আছে, বন্দীর জবানবন্দী নেওয়া শেষ হলে বন্দীকে জিজ্ঞাসা করা হবে—সে সাক্ষ্য দাখিল করতে চায় কিনা। যে ক্ষেত্রে ৩৪২ ধারামতে ম্যাজিস্ট্রেট জবানবন্দী নিয়েছেন সেক্ষেত্রে আবার দায়রা আদালতে জবানবন্দী নেওয়া প্রথা নয়।

বিচারপতি রিভস : ২৮৯ ধারামতে বন্দীর জবানবন্দী নেওয়া-না-নেওয়া আদালতের ইচ্ছাধীন।

মিঃ অর : ঠিক তাই। এরপর আমি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তি দায়রা আদালতে গ্রহণ-যোগ্যতার আপত্তি সম্পর্কে বলব। ১৬৪ ও ৩৮৪ ধারা দুটির বিধানগুলো মানা হয়নি মেনে নিলেও স্বীকারোক্তির গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে আপত্তি যুক্তিযুক্ত নয়। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের পঞ্চম আইনের ৫৩৩ ধারাবলে সে ত্রুটি স্খালনযোগ্য। কিন্তু উকিলবাবু যে যুক্তিগুলো দিয়েছেন সেগুলো যথার্থ নয়। তিনি বলেছেন, স্বীকারোক্তি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নয়, কারণ, স্বীকারোক্তির শুরুতেই সে কথা লেখা নেই।' কিন্তু স্বীকারোক্তির শেষে ৭৯ পৃষ্ঠায় বন্দীকে প্রশ্ন

করা হয়, "তুমি সবটা বিবৃতিই কি স্বেচ্ছায় বললে ?" উত্তর হয়েছিল, "আমি যা কিছু বলেছি তা সত্য, তার সবটাই স্বেচ্ছায় বলেছি।"

মিঃ অর বলেন, দণ্ডের প্রশ্নে ক্রাউনের সৌজন্য ও প্রথা এই যে, ওটি সর্বতোভাবে আদালতের এক্তিয়ারে ছেড়ে দেওয়া। সুতরাং, আমি দণ্ডের সপক্ষে বা বিপক্ষে কিছুই বলব না, সর্বতোভাবে ওটি আপনাদের ব্যাপার।

বাবু নরেন্দ্রকুমার বসুঃ বন্দীর জবানবন্দী সম্বন্ধে মিঃ অর যা বললেন সে বিষয়ে আমি একটু বলতে পারি ?

বিচারপতি ব্রেটঃ হ্যাঁ।

বাবু নরেন্দ্রকুমারঃ ২৩৯ ধারার প্রথম অনুচ্ছেদটি এইঃ "ফরিয়াদীপক্ষের সাক্ষীগণের জবানবন্দী এবং আসামীদের কারও জবানবন্দী শেষ হলে আসামীকে জিজ্ঞাসা করা হবে সে কোন সাক্ষ্য পেশ করতে চায় কিনা।" পক্ষান্তরে মিঃ অর বলেছেন যে, ওটা বিচারকের ইচ্ছাধীন। আমার নিবেদন এই যে, ৩৪২ ধারা অবশ্য পালনীয়। সাক্ষ্যসাবুদে যদি এমন কোন পরিস্থিতি দেখা যায় যা বাহ্যত বন্দীর বিপক্ষে যাচ্ছে তবে জজ অবশ্য বন্দীর জবানবন্দী নেবেন। আমি সেদিন বলেছিলাম অনিয়ম যদি কেবল বন্দীর জবানবন্দী প্রশ্ন ও উত্তরে না নেওয়ায় ঘটে তবে সে ত্রুটি ৫৩৩ ধারাবলে স্খালন করা যেতে পারে, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রেও যদি এমনিতর ঘটে থাকে তবে ৫৩৩ তা স্খালন করতে পারে না। বন্দীর মাতৃভাষায় বিবৃতি না নেবার যে ত্রুটি এবং জবানবন্দীর দিন বন্দীর স্বাক্ষর না নিয়ে পরদিন নেবার যে ত্রুটি তা ঐ ধারায় কাটে না।

বিচারপতি ব্রেটঃ আমরা আমাদের রায়ের কথা ভাবব এবং সোমবারের মধ্যেই তা দেব।

অমৃতবাজার পত্রিকার ১৪ জুলাই মঙ্গলবার "ক্ষুদিরামের আপীল খারিজঃ মৃত্যুদণ্ড বহাল" এই শিরোনামায় বিচারপতিদ্বয়ের রায়টি বেরোয়। বিচারপতি ব্রেট রায়টি পড়েন। ১৯০৮ এর ৩০ এপ্রিল বিস্ফোরণে মিসেস কেনেডি ও মিস কেনেডির মৃত্যু ঘটানোর দায়ে ভারতীয় ৩০২ ধারামতে অভিযুক্ত হয়ে অথবা বিকল্পে দীনেশচন্দ্র রায় কিংবা কোন অজ্ঞাত ব্যক্তিকে এই কাজে প্ররোচিত ও সহায়তা করার দায়ে বিচারের জন্য ক্ষুদিরাম বসুকে মজঃফরপুরের দায়রা জজের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। ক্ষুদিরাম হত্যাপরাধ স্বীকার করেন। দায়রা জজ এই অপরাধ-স্বীকৃতি লিপিবদ্ধ করেন কিন্তু সাক্ষ্যসাবুদ দেখে শুনে বিচার করা স্থির করেন। তিনি ক্ষুদিরামের পক্ষ সমর্থনের জন্য এক উকিলকে অনুরোধ

করেন। দুই এসেসরের সাহায্যে বিচারকার্য সম্পন্ন হয়। দুই এসেসরই একমত হয়ে আপীলকারী (ক্ষুদিরাম)কে হত্যাপরাধে দোষী সাব্যস্ত করেন। দায়রা জজ তাঁদের অভিমতসহ ক্ষুদিরামকে অভিযোগমতো দোষী সাব্যস্ত ও ভাঃ দঃ বিধির ধারামতে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। সেই দণ্ড সমর্থনের জন্য ৩৭৪ কার্যবিধিমতে এই আদালতে (হাইকোর্টে) এসেছে এবং সেই সঙ্গে এসেছে ক্ষুদিরামের পক্ষ থেকে একটি আপীলও।

ফরিয়াদীপক্ষের মামলাটি ছিল এইঃ ১৯০৮ এর ৩০ এপ্রিলে রাত্রি সাড়ে আটটায় মিসেস ও মিস কেনেডি একটি এক-ঘোড়ার গাড়ি হাঁকিয়ে মজঃফরপুরের স্টেশন ক্লাব থেকে বাড়ি-মুখো রওনা হন। **জেলা জজ মিঃ কিংসফোর্ড তখন যে ধরণের গাড়ি ব্যবহার করতেন এই গাড়িটাও সে-ধরণের ছিল।** বাড়ি যাবার জন্য মহিলাদের ক্লাব-চত্বর ছাড়িয়ে রাস্তায় ডান দিকে বা পশ্চিম দিকে ঘুরতে হয় ও কিংসফোর্ডের গৃহ-প্রাঙ্গণের সম্মুখ দিয়ে যেতে হয়। ঘোর অন্ধকার রাত্রি। গাড়িটা যখন কিংসফোর্ড গৃহপ্রাঙ্গণের পূবগেটের কাছে পৌঁছোলো দুটি লোক বিপরীত দিক অর্থাৎ রাস্তার দক্ষিণ দিক থেকে ছুটে এল, ঐখানে তারা গাছের নীচে লুকিয়ে ছিল, **একজন একটি বোমা ছুঁড়ল অথবা দু'জনই দুটি বোমা ছুঁড়ল।** নিদারুণ বিস্ফোরণ ঘটে, এমন যে, ঘোড়াটা গাড়িশুদ্ধ ছুট দেয়। একটু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর কিংসফোর্ডের বাড়ি অবধি পিছিয়ে আনা হয়। তখন দেখা যায়, গাড়ির কাঠামোটা বিধ্বস্ত হয়েছে এবং মহিলারা ভীষণ আহত হয়েছেন। সহিস গাড়ির পেছনে ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে ছিল তাকে অচেতন ও আহতাবস্থায় পূব গেটের কাছ থেকে ধরে তুলতে হয়। **ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আহত মিস কেনেডি মারা যান, মিসেস কেনেডি পরদিন অবধি (২ মে) বেঁচে থাকেন,** তারপর ঐ আঘাতের কারণেই মারা যান। সহিস বিচারকালেও আরোগ্যলাভ করেনি। যে মেডিকাল অফিসার মহিলাদের মৃত্যুর আগে ও পরে এবং সহিসকে পরীক্ষা করেন তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন। সন্দেহের অবকাশ নেই যে, যে-আঘাতে দু'জন মহিলার মৃত্যু ঘটেছে এবং সহিস আহত হয়েছে তার কারণ বোমা-বিস্ফোরণ। এ বিষয়ে কোন সযৌক্তিক সংশয়ের অবকাশ নেই যে, **যে বা যারা একটি বা দুটি বোমা ছুঁড়েছিল** তাদের অভিপ্রায়ই ছিল গাড়ির আরোহীদের মৃত্যু ঘটানো। তার বা তাদের মহিলা দুটির অথবা অন্য কারও মৃত্যু ঘটানো উদ্দেশ্য ছিল কিনা সেই বিচার ভাঃ দঃ বিধির ৩০১ ধারামতে

অপরাধের ইতর বিশেষ ঘটায় না। এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই যে, যে-লোকটি বা যে লোক দু'টি বোমা বা বোমা দু'টি নিক্ষেপ করেছে সে বা তাবা হত্যাপরাধ করেছে। এই ঘটনাগুলো নিয়ে কিন্তু আপীলে কোন বিসংবাদ নেই।

আমাদের যে প্রশ্নগুলোর মীমাংসা করতে হবে তা হচ্ছে: আপীলকারী (ক্ষুদিরাম) ই সেই লোক কিনা যে বোমা ছুঁড়েছে অথবা একাধিক হয়ে থাকলে যারা বোমা ছুঁড়েছে তাদের একজন কিনা, অথবা যদি ধরে নেওয়া যায় যে, তার (ক্ষুদিরামের) সঙ্গীই বোমা ছুঁডেছে তা'হলে সে (ক্ষুদিরাম) সম-অপরাধী কিনা এই যুক্তিতে যে, তারা একই উদ্দেশ্যসাধনে (ভাঃ দঃ বিধির ৩৪ ধারা) ঐ কাজ করেছে। ফরিয়াদীপক্ষের বক্তব্য এই যে, আপীলকারী ও তার সঙ্গী, দু'জনই, বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জেলা জজকে হত্যার একই উদ্দেশ্যে অকুস্থলে উপস্থিত ছিল এবং যদি তাই হয় ও একজনই যদি বোমা ছুঁড়ে থাকে তবু দু'জনই হত্যাপরাধে সমভাবে দায়ী। (ফস্টার ক্রিম. ল., ৩৫০)

সাক্ষ্যসাবুদ ছাড়া রয়েছে বন্দীর স্বীকারোক্তি—জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এবং সোপর্দকারী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। জজ এসেসরদেব উদ্দেশে মামলার যে সারাংশ দেন তাতে সাক্ষ্য-সাবুদ নিয়ে আলোচনা আছে এবং জজ চেয়েছেন এই সারাংশ যেন তার রায়ের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে গণ্য করা হয়। রায়ে তিনি বলেছেন, পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য-প্রভৃত এবং হত্যাপরাধ সম্পূর্ণ সাব্যস্ত হয়েছে। তিনি একথাও বলেছেন যে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তাঁর স্বীকারোক্তি ও অভিযোগের উত্তরে তাঁর অপরাধ-স্বীকৃতি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত।

দায়রা জজ অবশ্য তাঁর সারাংশে সোপর্দকারী ম্যাজিস্ট্রেটের জবানবন্দী নেবার রীতির নিন্দা করেছেন কিন্তু উল্লেখ করেন নি তান কতটুকু সে জবানবন্দী গ্রহণ করেছেন, কতটুকু নেন নি। কোন কোন প্রশ্ন যতই আপত্তিকর হোক না কেন, আমাদের মতে এটা পরিষ্কার যে, সেজন্য সমগ্র জবানবন্দীই অগ্রাহ্য করবার নয়। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, জজ যে পদ্ধতি প্রয়োগ করে সারাংশ রায়ে সংযুক্ত করেছেন তাতে বোঝা মুস্কিল যে তিনি কতটুকু গ্রহণ বা বর্জন করেছেন। দায়রা জজের সামনে বিচারকালে এটাও পরিষ্কার যে, আপীলকারী ফরিয়াদের সততায় প্রশ্ন তোলেন নি এবং হত্যাকালে তিনি যে ঘটনাস্থলে ছিলেন তাও অস্বীকার করেন নি।

তাঁর আপীল-আবেদনেও তাঁর অপরাধের অস্বীকৃতি অথবা এ ব্যাপারে তিনি যে জড়িত ছিলেন তার অস্বীকৃতি নেই। ১ নং যুক্তিতে তিনি বলেছেন, জেলা

ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তিনি যে বিবৃতি দিয়েছেন তা দীনেশ চন্দ্র রায়কে বাঁচাবার জন্য, কেননা, তিনি সেই রকমই তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। অবশিষ্ট যুক্তি-গুলোতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, দুটি পিস্তল ও অন্যান্য জিনিসে তিনি ভারগ্রস্ত ছিলেন, কিভাবে পিস্তল ও বোমা ছুঁড়তে হয় তিনি জানেন না, এমতাবস্থায় আদালতই স্থির করবেন তিনি অথবা দীনেশ চন্দ্র বোমা নিক্ষেপ করেছেন এবং শেষ যুক্তিতে তিনি বলেছেন দীনেশ চন্দ্র যে আত্মহনন করেছেন তার একমাত্র কারণ তিনি বোমা-নিক্ষেপের অপরাধ করেছেন।

এই যুক্তিগুলো আমরা পরে বিবেচনা করব, প্রথমে আমাদের আপীলকারীর আইনজীবী যেসব যুক্তি অবলম্বন করে সওয়াল করেছেন এবং যেসব যুক্তিজাল এ যাবৎ অপর আদালতে অনুসৃত হয়েছে তা থেকে সর্বতোভাবে পৃথক, আপীল-কারীর নিজেরই আপীলের যুক্তিগুলোর সঙ্গে সর্বৈব সামঞ্জস্যহীন, তা বিচার করতে হবে। আমরা এই বলতে পারি, ঐ যুক্তিগুলো প্রায় সর্বাংশে কায়িক বা টেকনিকাল, ফরিয়াদ আক্রমণের কোন চেষ্টাই হয় নি। প্রথম আক্রমণ-লক্ষ্য দায়রা জজের রায়। বলা হয়েছে, জজ আইনত এসেসরের উদ্দেশে-কৃত সারাংশ রায়ের অঙ্গীভূত করতে পারেন না। অতএব রায় অসম্পূর্ণ, রায়ে সাক্ষ্যের কোন আলোচনা বা বিবৃতি নেই। এই যুক্তিতে দোষ সাব্যস্ত করা যায় না, এ খারিজ করে পুনর্বিচারের আদেশ দেওয়া উচিত। বলেছি, আমাদের মতে, আপত্তি-গুলো নিছক কায়িক, এতে কোন সারবস্তু নেই। জজ যদি তাঁর সারাংশের একটা নকল করে থাকেন এবং রায়ে অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন সেক্ষেত্রে বিতর্কের অবকাশ নেই যে, সারাংশ গ্রথিত করায় আইনগত কোন বাধা নেই। এরূপ সারাংশ রায়ের স্বাভাবিক অংশ বলে গণ্য হবে। এতে যদিও ঘটনাক্রম ও সাক্ষ্যাদি এসেসরদের সহায়তার জন্য নিরপেক্ষভাবে বিধৃত হয়েছে, ঐ ঘটনাক্রম ও সাক্ষ্যাদি প্রকৃতপক্ষে মামলা নিষ্পত্তির উপায়, এগুলোর উপরই মামলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্ভরশীল এবং জজের সিদ্ধান্ত তদনুসারী। সারাংশে যে ঘটনাক্রম ও সাক্ষ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে জজের সিদ্ধান্তের ভিত্তিও তাই। অবশ্য তাঁর পদ্ধতিটি অসুবিধাজনক এবং আমাদের অনুমোদনলভ্য নয়। কিন্তু আমরা একথা বলতে পারিনে যে, এ অবৈধ অথবা রায় এমন দূষিত যে, তা গ্রহণের অযোগ্য হয়ে গেছে। তথাপি আপত্তি যখন তোলা হয়েছে তখন যেহেতু এটি ঘটনাভিত্তিক আপীল সেই হেতু আমাদের রায়ে সাক্ষ্যও সন্নিবেশ করা সঙ্গত মনে করি।

দ্বিতীয় আক্রমণ-লক্ষ্য হল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের লিপিবদ্ধ বন্দীর স্বীকারোক্তি।

কার্যবিধির ১৬৪ ধারামতে লিপিবদ্ধ এই স্বীকারোক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে, স্বীকারোক্তি যেভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে তা নিম্নোক্ত কারণে গ্রহণযোগ্য নয় : (১) ম্যাজিস্ট্রেট বন্দীকে একথা বলেননি যে, তিনি এক ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিবৃতি দিচ্ছেন, (২) কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধানগুলো এইভাবে অমান্য করা হয়েছে : (ক) বন্দীকে যেসব প্রশ্ন করা হয়েছে এবং বন্দী যেসব জবাব দিয়েছে তা লিপিবদ্ধ হয়নি, (খ) জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সাক্ষ্যে যদিও এটি পরিষ্কার যে, বন্দীর মাতৃভাষা বাংলায় স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করা সম্ভব ছিল তথাপি স্বীকারোক্তি ইংরেজীতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, (গ) যেদিন স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ হয় সেদিন অথবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে বন্দীর স্বাক্ষর নেওয়া হয়নি, পরদিন জনৈক সহকারী ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে স্বাক্ষর নেওয়া হয়েছে, (ঘ) স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করার আগে ম্যাজিস্ট্রেট সুনিশ্চিত হয়ে নেননি যে, স্বীকারোক্তি স্বতঃপ্রণোদিত।

এই আপত্তি সম্পর্কে আমরা লক্ষ্য করেছি, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর সাক্ষ্যে স্বীকার করেছেন, তিনি যে ম্যাজিস্ট্রেট একথা তিনি বন্দীকে বলেছেন কিনা তা তাঁর মনে নেই, তবে একথাও বলেন যে, তিনি তা করেননি এই মনে করে যে, বন্দী নিশ্চয়ই জ্ঞাত ছিলেন যে, তিনি একজন ম্যাজিস্ট্রেট, কারণ, তাঁর স্বীকারোক্তি নেবার জন্য তিনি বন্দীকে আদালতে নিয়ে আসেন। আমাদেরও অভিমত এই যে, যে-পরিস্থিতিতে বিবৃতি লিপিবদ্ধ হয়েছে বন্দী নিশ্চয়ই বেশ বুঝতে পেরেছেন যে, যে-অফিসার তাঁর স্বীকারোক্তি লিখেছেন তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। যে-ট্রেনে বন্দীকে ওয়েইনী স্টেশন থেকে আনা হয় ম্যাজিস্ট্রেট সে-ট্রেন দেখেন এবং তাঁরই আদেশে বন্দীকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়। বন্দী অশিক্ষিত নিরক্ষর নন, তিনি জ্ঞাত ছিলেন, জেলা (পুলিস) সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যখন ট্রেনে তাঁর সঙ্গে ছিলেন তখন ঐভাবে যিনি (তাঁকে নিয়ে যাওয়ার) আদেশ করতে পারেন তিনি নিশ্চয়ই কর্তাব্যক্তি ম্যাজিস্ট্রেট। বস্তুত, সোপর্দকারী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বন্দী তাঁর জবানবন্দীতে স্বীকার করেছেন যে, যিনি তাঁর বিবৃতি নিয়েছেন তিনি ম্যাজিস্ট্রেটই হবেন।

চারদফায় লেখা পরবর্তী আপত্তি সম্পর্কে বিচারপতিগণ বলেন, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্বীকার করেছেন, তিনি বন্দীকে প্রশ্ন করেছেন কিন্তু বন্দীর জবাবগুলো বর্ণনার আকারে লিখেছেন। ঐভাবে সমগ্র বিবৃতি লেখবার পর বন্দীর কাছে বাংলায় পড়ে শোনানো হয়, এবং একটিমাত্র বাক্য ছাড়া বন্দী বলেন,

'ঠিক আছে'। যে বাক্যটি বেঠিক বলা হয় সেটি কেটে দেওয়া হয়। আমরা অভিনিবেশসহকারে স্বীকারোক্তিটি পড়েছি এবং যতটা বুঝেছি তাতে বলা যায়, প্রশ্নগুলো নিতান্তই আনুষ্ঠানিক। বন্দীর কাছ থেকে খবর পাওয়ার জন্য তিনি এমন কোন প্রশ্ন করেন নি যা তিনি জানতেন, তিনি তো ঘটনার কথা আগে ভাগে জানতেন না। আমাদের পক্ষে বোঝা কঠিন যে, এক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক প্রশ্নোত্তরগুলো না লিপিবদ্ধ করে বন্দীর স্বার্থ কিভাবে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে।

সম্রাজ্ঞী বনাম ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্তী (২ সি ডবলিউ এন, পৃঃ ১০২) এবং সম্রাট বনাম রজনীকান্ত (৮ সি ডবলিউ এন, পৃঃ ২২) মামলা দুটি উল্লেখ করা হয়েছে, আমাদের মতে, এ দুটি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বর্তমান মামলা সম্পর্কে আমরা এ বিষয়ে সুনিশ্চিত যে, প্রশ্ন ও উত্তর আকারে বিবৃতিটি লিপিবদ্ধ না করায় আত্মপক্ষ সমর্থনে বন্দীর কোন হানি হয়নি। আমাদের বক্তব্যের সপক্ষ নজীর হিসাবে আমরা ফেকু মহতো বনাম সম্রাজ্ঞী (আই-এল আর ১৪, ক্যাল ৩৩৯) মামলাটি উল্লেখ করব। বন্দীপক্ষের আইনজীবীর আপত্তিগুলো শেষ পর্যন্ত খণ্ডন বা অগ্রাহ্য করে বিচারপতিদ্বয় বলেন, আমাদের মতে, এ বিষয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের সাক্ষ্যই যথেষ্ট যে, যে সময়ে বন্দীর স্বীকারোক্তি নেওয়া হয় সে সময় তা বাংলায় লিপিবদ্ধ করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং, কার্যবিধির ৩৬২ ধারা-মতে ইংরেজীতে স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করা সঙ্গতই হয়েছে এবং দায়রা জজের কাছে তা সাক্ষ্য হিসাবে গ্রাহ্য হয়েছে। একথা সত্য যে, যেদিন স্বীকারোক্তি নেওয়া হয়েছে সেদিন তা স্বাক্ষরিত হয় নি, পরদিন হয়েছে। স্বাক্ষর নেওয়া হয় বিবৃতি বা স্বীকারোক্তির স্বীকৃতি হিসাবে। স্বীকারোক্তি নেবার পর স্বাক্ষর না নেওয়া উচিত হয়নি, কিন্তু এক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট নিজেই যেখানে শপথ নিয়ে স্বীকারোক্তির যাথার্থ্যের কথা বলছেন তখন আর আপত্তির কারণ থাকে না। আমাদের অভিমত, এক্ষেত্রে এমন কোন অনিয়ম বা অসঙ্গতি ঘটেনি যা ঐ স্বীকারোক্তি সাক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হবার পথে অন্তরায় বলা চলে। তা ছাড়া, আমাদের বলতে হচ্ছে, সোপর্দকারী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বন্দী যে জবানবন্দী দিয়েছেন তা পড়ে শোনানো হয় এবং বন্দী বলেছেন, ওতে তাঁর কথাই যথাযথ আছে, তবে কোন কোন জায়গায় দীনেশ তাঁকে যা শিখিয়েছিলেন তাও আছে।

বিচারপতিগণ বলেন, কার্যবিধির ১৬৪ ও ৩৬৪ ধারা দুটির সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য বন্দীর যথার্থ বিবৃতি লিপিবদ্ধ করা। যে স্বীকারোক্তি নিয়ে কথা উঠেছে সে সম্পর্কে বন্দী একাধিকবার বলেছেন যে, ঠিকই আছে। আপত্তি যা-কিছু নিতান্তই

আনুষ্ঠানিক এবং মামলার আসল বিষয়কে তা স্পর্শ করেনি। আর একটা আপত্তি ছিল যে, ম্যাজিস্ট্রেট স্বীকারোক্তি নেওয়া শুরু করার আগে জেনে নেন নি, স্বীকারোক্তি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কি না। ম্যাজিস্ট্রেট স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করার পর এ সম্পর্কে প্রশ্ন করেন ও সুনিশ্চিত হয়েই 'স্বীকারোক্তি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত' একথা লেখেন। মামলার কোন পর্যায়ে অথবা আপীলের বিষয়সূচীতে একথার উল্লেখ নেই যে, স্বাকারোক্তি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নয়। আমরা দায়রা জজের সঙ্গে এ-বিষয়ে একমত যে, স্বীকারোক্তি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। আপীলকারীব আইনজীবী এই মর্মে আভাষ দিয়েছেন যে, বন্দী নিশ্চয়ই পুলিসের ভয়ে স্বীকারোক্তি করেছেন। বন্দী নিজে কখনও বলেন নি যে, তাই হয়েছে, তিনি কখনও, কি সোপর্দকারী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কি দায়রা জজের কাছে, তিনি যা বলেছেন তা প্রত্যাহারের চেষ্টা করেন নি। পক্ষান্তরে, সোপর্দকাবী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তাঁব স্বীকারোক্তির কোন্ কোন্ অংশ দীনেশের পরামর্শানুসারে বলেছেন তাই উল্লেখ করেছেন, হত্যাপরাধে মূল কথার সঙ্গে সেসব কথার কোন সম্পর্ক নেই।

বন্দীর পক্ষে আইনজীবী তাঁর শেষ কথায় বলেছেন যে, যদি স্বীকারোক্তি গৃহীতও হয় তবু তার উপর নির্ভর করা সমীচান নয়, কেননা, পরবর্তীকালে বন্দী বলেছেন, তাঁর কিছু কিছু উক্তি দীনেশ-প্ররোচিত এবং অসত্য, ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু বাচ্চুনারায়ণ লালের সাক্ষ্যে প্রকাশ, দীনেশচন্দ্র রায়ের প্রকৃত নাম প্রফুল্ল চাকী। বিচারপতিগণ বলেন, আমরা মনে করিনে, একথা যুক্তিযুক্ত এবং একথায়ও কোন যৌক্তিকতা দেখিনে যে, যেহেতু বন্দা পরে কোন একসময়ে বলেছেন, তাঁর স্বীকারোক্তির কোন কোন কথা অসত্য সেই হেতু তাঁর সমগ্র স্বীকারোক্তিই গ্রহণের অযোগ্য। একথাও সঙ্গত নয় যে, যে-স্বীকারোক্তি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য তা নিয়ে অভিযুক্ত খুশিমত এই তর্ক তুলতে পারে যে, স্বীকারোক্তিতে কতকাংশ অসত্য বলে সর্বাংশই গ্রহণের অযোগ্য। বস্তুত, একথা সমর্থনের পক্ষে কোন তথ্য নেই যে, প্রথম স্বীকারোক্তি থেকে দ্বিতীয় স্বীকারোক্তি অধিকতর নির্ভরযোগ্য। তদুপরি, যে অংশ অসত্য বলা হচ্ছে তার সঙ্গে প্রকৃত অপরাধের কোন সম্বন্ধ নেই। স্বীকারোক্তিতে আছে হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত আনুপূর্বিক ঘটনার বিবরণ এবং তার পরও অপরাধী বা অপরাধীরা কি করেছে। এসব ঘটনা সাক্ষ্য সাবুদে সমর্থিত; এমন আভাষও কেউ দেন নি যে, দীনেশ ছাড়া আর কেউ স্বীকারোক্তির কথা শিখিয়ে দিয়েছে।

বন্দী স্বয়ং সোপর্দকারী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তি সত্য বলে বলেছেন এবং বিচারের কোন স্তরে তা প্রত্যাহার করেন নি। আপীল-আবেদনে আভাষ-মাত্র দেওয়া হয়েছে, সুস্পষ্ট বলা হয়নি যে, দীনেশচন্দ্র রায়ই সেই লোক যাঁর বোমানিক্ষেপের ফলে মহিলা দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সমস্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাদের উপসংহার যে, বন্দীপক্ষেব আইনজীবী যেসব আপত্তি তুলেছেন তা টেঁকে না, স্বীকারোক্তি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, এটি সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য এবং এ সত্য।

দায়রা জজের পক্ষ থেকে বন্দীব জবানবন্দী গ্রহণ সম্পর্কে যে আপত্তি তোলা হয়েছে, তার উত্তরে আমাদের বক্তব্য, জবানবন্দী গ্রহণের উদ্দেশ্য সমগ্র পরি-স্থিতিতে বন্দীর কি বলাব আছে সেইটি জেনে নেওয়া। এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে; আর, এক্ষেত্রে তো অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ স্বীকারই করেছেন। আমাদের মতে, এক্ষত্রে দায়রা জজ আরও জবানবন্দী না নিয়ে কোন অন্যায় বা অবৈধ কাজ কবেন নি, এর ফলে বিচারকার্য দূষিতও হয়নি। বন্দীকে জিজ্ঞাসা কবা হয়েছিল তিনি কোন সাক্ষ্য দিতে চান কি না, তিনি বলেছেন, 'না'।

আমাদের এখন বিচার্য, সোপর্দকারী ম্যাজিস্ট্রেট ৩৪২ কার্যবিধিমতে বন্দীর যে জবানবন্দী নিয়েছেন তা গ্রহণযোগ্য কিনা। দায়রা জজ যে মন্তব্য করেছেন তা কিছু মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। প্রশ্নের সংখ্যা ৫৫ বটে কিন্তু বেশির ভাগ প্রশ্নই সাক্ষীদের কথিত ঘটনা সংক্রান্ত যেখানে অভিযুক্ত ব্যক্তির কোন বক্তব্য থাকতেও পারে। এসব প্রশ্ন আপত্তিকর নয় বা এগুলো বন্দীর প্রতিকূল নয়। প্রারম্ভিক প্রশ্নগুলো যা করণীয় ছিল তাই এবং কতখানি দীনেশের শেখানো সেটি জানবার জন্যই করা। ৬ নং এবং ১০ থেকে ১৯ অবধি প্রশ্নগুলো কবা উচিত হয়নি এবং তাব জবাবগুলো সাক্ষ্য হিসাবে বর্জনীয়। ৪৯ থেকে ৫১ নং প্রশ্নোত্তরও সম্ভবত বাদ দেওয়া উচিত। আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, উল্লিখিত প্রশ্নোত্তরগুলো বাদে অবশিষ্ট জবানবন্দী গ্রহণযোগ্য। বন্দীপক্ষের আইনজীবী এই তর্কও তুলেছেন যে, দায়রা জজ যেক্ষেত্রে বন্দীর অপরাধ-স্বীকৃতি গ্রহণ করেন নি সেক্ষেত্রে তিনি তার উপর নির্ভর করে দোষ সাব্যস্তের সিদ্ধান্তেও আসতে পারেন না। আমাদের মনে হয় না দায়রা জজ তা করেছেন। তিনি বলেছেন, অভিযুক্ত করবার পর বন্দীর অপরাধ-স্বীকৃতি যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই, তথাপি তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন, সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করেই তিনি অপরাধ

সাব্যস্ত করেছেন। এটি হলে অবশ্যই ভাল হত, যখন তিনি বিচার করাই স্থির করলেন, তখন তিনি যদি ইংলণ্ডের প্রথানুসারে বন্দীকে "নির্দোষ" বলার নির্দেশ দিতেন। বিচার করা স্থির করে অপরাধ-স্বীকৃতি নথিভুক্ত করা অর্থহীন। অপরাধ-স্বীকৃতি গ্রহণ করে থাকলে ফরিয়াদীপক্ষ ও বন্দীর মধ্যে কোন মামলাই থাকে না। আমরা এই আপীলে তাই ধরে নিয়েছি যে, অপরাধ-স্বীকৃতি গৃহীত হয়নি এবং তদনুসারে কাজ হয়নি। আমরা ঘটনাক্রম ও আইনের পরিপ্রেক্ষিতে বন্দীর আপীলের অধিকার মেনে নিয়েছি।

বন্দীর আইনজীবীর বিতর্কের দিকে দৃষ্টি রেখেই আমরা এই অভিমত প্রকাশ করছি, বন্দীর বিরুদ্ধে এবং অভিযোগের সপক্ষে পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য প্রভৃত, যে-অভিযোগ বন্দীর বিরুদ্ধে আনা হয়েছে তার সঙ্গে ঐসব সাক্ষ্য যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ। বন্দীপক্ষের আইনজীবীর অন্যান্য তর্ক বা আপত্তিও দায়রা জজের সঙ্গে সহমত ব্যক্ত করে বিচারপতিগণ খারিজ করে দেন। প্রসঙ্গত তাঁরা বলেন, মজঃফরপুরে ঐকালে বন্দীর অবস্থিতিরও অন্য কোন উপলক্ষ বা কারণ পাওয়া যায় না। বিচারপতি-গণ পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যের সঙ্গে "বর্জনীয়" প্রশ্নোত্তরগুলো বাদে স্বীকারোক্তিও তাঁদের সিদ্ধান্তের সপক্ষে গ্রহণ করেছেন। আপীলের আবেদনে যা বলা হয়েছে, এত বোঝা (দুটি পিস্তল, অতগুলো কার্তুজ, দুটি কোট ইত্যাদি) নিয়ে হত্যা সম্ভব নয়, তদুত্তরে বিচারপতিগণ মন্তব্য করেছেন, আসলে (পিস্তল নয়) রিভলভার দুটির মধ্যে মাত্র একটি ভারি, কার্তুজগুলো কয়েক আউন্স মাত্র এবং কোট দুটি হত্যানুষ্ঠান কালে তাঁর ও তাঁর সঙ্গীর গায়ে পরা ছিল। এগুলো নিয়ে হত্যাকার্য খুব একটা কঠিন বা অস্বস্তিকর হওয়ার কথা নয়। হত্যাকাণ্ডের পর ঠিক কি হয়েছিল তা তো জানা যাচ্ছে না, হতে পারে যে, একজন আর একজনকে কিছু জিনিস হস্তান্তরিত করেছেন। দীনেশের সিল্ক কোটটি ক্ষুদিরামের কাছে থাকায় এরকম অনুমান করা যায়। সুতরাং, আমরা এই উপসংহার গ্রহণ করতে পারছি নে যে, দীনেশই বোমাটা ছুঁড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলতে চাই যে, যদি এমনও হয়ে থাকে (অর্থাৎ দীনেশই বোমাটা ছুঁড়েছে) তবু বন্দীর (ক্ষুদিরামের) অপরাধ সমপরিমাণ। যদি বন্দী (ক্ষুদিরাম) ও দীনেশ বোম মেরে হত্যার অভিপ্রায়ে ঐ রাত্রে অপেক্ষা করে থাকে, যদি একই উদ্দেশ্য-সাধনে বন্দী বোমা নিক্ষেপক দীনেশের সুবিধের জন্য পাশে জিনিসগুলো নিয়ে দাঁড়িয়েও থেকে থাকেন এবং হত্যাকাণ্ডের পর দীনেশের পলায়নে সহায়তা করে থাকেন বন্দী সমান অপরাধী হবেন। বিচারপতিগণ ক্ষুদিরামের অপরাধ নির্ণয়ে জজের-

সঙ্গে সহমত প্রকাশ করেন। তাঁরা দণ্ডলাঘব করারও কোন যুক্তি দেখেন না। তাঁদের মতে বন্দী ১৯ বছরে নিতান্ত তরুণ নন, এদেশের হিসাবমতো পরিণত যুবক। ঘটনাস্থলে অধিকতর বয়স্ক কারও প্ররোচনায় এই অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় নি। বন্দী ও তাঁর সঙ্গী মজঃফরপুরে **কুড়ি দিন** অবস্থান করে অপরাধ অনুষ্ঠানের সুযোগ খুঁজছিলেন এবং যখন তাঁরা বুঝলেন সে সুযোগ এসে গেছে অমনি তাঁরা ধরা পড়া সম্পর্কে সতর্কতা ও নিরাপত্তার উপায় অবলম্বন করে স্বেচ্ছায় দৃঢ়চিত্তে অপরাধ ঘটিয়েছেন। বন্দীকে তেমন যুবক ধরে নেওয়া অসম্ভব যিনি কি ভয়াবহ দুষ্কার্য করতে যাচ্ছেন তা সম্যক জানতেন না। তাঁর স্বীকারোক্তিতেও এমন কিছু প্রকাশ পায় নি যাতে মনে হতে পারে যে, তাঁর অনুভূতি অপরিণত এবং তাঁর কাজটা কোন অপরাধপ্রবণ ভ্রান্তি মাত্র। এই অপরাধ অনুষ্ঠানের কারণ তিনি বলেছেন এবং সঙ্গীর সঙ্গে মিলে কিভাবে তার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন তা ব্যাখ্যা করেছেন। আমাদের সম্মুখে যে তথ্যাদি উপস্থাপিত করা হয়েছে তা থেকে বন্দীপক্ষের আইনজীবীর সঙ্গে এ বিষয়ে একমত হতে পারছিনে যে, তিনি অপরাপরের ক্রীড়নক মাত্র। তাঁর বিরুদ্ধে যে চরম শাস্তি উচ্চারিত হয়েছে আইনত তা লঘু করার কোনও যৌক্তিকতাই আমরা দেখছি নে, সুতরাং আমরা মৃত্যুদণ্ড সমর্থন ও আপীল খারিজ করলাম।

২৩ জুলাই 'অমৃতবাজার পত্রিকার' মজঃফরপুর সংবাদদাতা খবর দিচ্ছেন, জেলে ক্ষুদিরামের সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁর মাসী না পিসী কে যেন পাগলের মতো সর্বত্র মাথা কুটে বেড়াচ্ছেন; স্থানীয় উকিলদের সঙ্গেও দেখা করেছেন কিন্তু সর্বত্রই ব্যর্থ হয়েছেন।

২৬ জুলাই ঐ সংবাদদাতাই খবর দিয়েছেন লেঃ গবর্ণর ক্ষুদিরামের—'মার্সি পিটিসান' (করুণার আবেদন) অগ্রাহ্য করেছেন।

২৭ জুলাই তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' নিম্নোক্ত 'মার্সি-পিটিসানটি' বেরোয়:

To His Honour the Lieutenant-Governor of Bengal

The humble petition of Khudiram Bose, prisoner, Muzafferpur jail.

Most respectfully sheweth—

1. That Your Honour's petitioner has been convicted of murder by the Additional Sessions Judge of Muzafferpur and sentenced to death.

2. That Your Honour's petitioner preferred appeal to the Hon'ble High Court but the same has been dismissed and sentence of death confirmed.

3. That soon after the arrest of Your Honour's petitioner he made a confession before the District Magistrate, Muzafferpur in which he took the responsibility of the offence on himself.

4. That Your Honour's petitioner did this in order to screen Dinesh Chandra who was the real perpetrator of the bomb outrage at Muzafferpur, and who had not been arrested up to that time.

5. That this point was urged by Your Honour's petitioner's pleader before the Court of Sessions, as will appear from the newspaper reports of the proceedings published in the Statesman dated the 14th June 1908, of the 16th June 1908 and was also set forth in the petition of appeal presented to the High Court.

6. That Your Honour's petitioner denied in the petition of appeal that he had thrown the bomb, and Your Honour's petitioner's pleader also advanced arguments in support of this plea before the Court of Sessions as it would appear from newspaper reports referred to above.

7. That in as much as all the points urged by the petitioner's pleader before the Court of Sessions were not discussed in the judgment and as Your Honour's petitioner's petition of appeal was in Bengali, the Hon'ble High Court came to the conclusion that Your Honour's petitioner had not denied that he was the thrower of the bomb. Your Honour's petitioner humbly submits that this was a misconception.

8. That from the judgment of the Hon'ble High Court it would appear that though Your Honour's petitioner was adjuged to be the thrower of the bomb, yet his criminality in case he did not throw the bomb has also been discussed. Your Honour's petitioner respectfully submits that from the judgment of the Hon'ble High Court it seems to entertain a

doubt as to whether Your Honour's petitioner actually threw the bomb.

9. That accepting the findings of the learned Sessions Judge and the Hon'ble High Court, there are in the judgments expressions which convey some doubt as to whether Your petitioner actually threw the bomb and in such a case according to the precedent of Queen vs Babu Lall Jha reported in IWR Criminal Rulings p. 48, the sentence of death passed on Your Honour's petitioner may without violence of any principle of law be commuted if Your Honour is pleased to take a lenient view of the petitioner's case.

10. That Your Honour's petitioner's father and mother died long ago and as an orphan Your Honour's petitioner received very little education having read only upto 2nd Class of the Entrance School at Midnapur.

11. That though not actually insane Your Honour's petitioner was known to be somewhat wrong in the head by his teachers and school-fellows.

12. That Your Honour's petitioner is sincerely sorry for the death of Mrs and Miss Kennedy.

13. That Your Honour's petitioner never had any personal grudge or ill-feeling against Mr. D. H. Kingsford.

14. That Your Honour's petitioner met Dineshchandra at the "Jugantar" office in Calcutta, that he exercised considerable influence over Your Honour's petitioner come to Muzafferpur. Your Honour's petitioner begs most humbly to submit that he would never have come to this predicament, if he had not met Dineshchandra, whose real name Your Honour's petitioner subsequently learnt during the trial to be Prafullachandra Chaki.

15. That Your Honour's petitioner never belonged to any secret society and knows nothing about bomb, the revolvers and cartridges found on Your Honour's petitioner which were given to him by Prafullachandra Chaki.

16. That Your Honour's petitioner is only 19 years old and as yet inexperienced in the ways of the world, and can

not think of dying so young, and if, according to the laws of the country, any other punishment as can expiate the offence of which the petitioner has been found guilty Your Honour's petitioner is willing to undergo the same.

Your Honour's petitioner accordingly press for a commutation of the sentence of death passed against him by the Additional Sessions Judge of Muzafferpur and confirmed by the High Court and for this act of mercy Your Honour's petitioner shall, as in duty-bound, ever pray.

Sd/- KHUDIRAM BOSE

বলা বাহুল্য, মুসাবিদা উকিলের, বক্তব্যও সর্বাংশে উকিলের, ক্ষুদিরাম নিজে কতটা এর তাৎপর্য বুঝেছেন, বলা মুস্কিল। দরখাস্তখানি ক্ষুদিরাম বোস স্বাক্ষরিত। জেলের প্রথানুসারেও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষে এই জাতীয় আবেদনে জেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উদ্যোগ নিয়ে থাকেন। এ ক্ষেত্রে আবেদনের বয়ান সর্বতোভাবে উকিলের, উদ্যোগীও সম্ভবত তিনি। 'সম্ভবত' এই জন্য বলা যে, ঠিক কি অবস্থায় কিভাবে এই আবেদন স্বাক্ষরিত হয়েছে সে সম্পর্কে সংবাদের অভাব। আবেদনটি অগ্রাহ্য হয়।

পরবর্তী সংবাদ, বুধবার আগষ্ট ৫, ১৯০৮। লোকাল গবর্মেণ্ট (প্রাদেশিক সরকার) ভাইসরয়ের (বড়লাটের) উদ্দেশে লিখিত ক্ষুদিরাম বোসের আবেদন ইম্পিরিয়াল গবর্মেণ্টের (ভারতে কেন্দ্রীয় ব্রিটিশ সরকারের) ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই আবেদন সম্পর্কে শীগগিরই হুকুম প্রত্যাশিত।

তার পরবর্তী সংবাদ, আগষ্ট ১০, 'অমৃতবাজার পত্রিকা', পৃঃ ৫, 'রাজার কাছে ক্ষুদিরামের আপীল/আবেদনপত্র আটক/মজঃফরপুর, আগস্ট ৯ (নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত):

সম্রাটের উদ্দেশে ক্ষুদিরামের দরখাস্ত গবর্মেণ্ট আটকে দিয়েছেন; কারণ, জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কারাধ্যক্ষ)-নির্ধারিত ১১ তারিখের মধ্যে জবাব পাবার অবকাশ নেই। রাজার কাছে আবেদন-সংক্রান্ত কারাবিধি কি ত্রুটিপূর্ণ না সঠিক? এই বিভ্রান্তিকর নীতির সমাধান দরকার।

শেষ সংবাদ, 'অমৃতবাজার পত্রিকা', বুধবার আগস্ট ১২, ১৯০৮, পৃঃ ৫ :

ক্ষুদিরামের অন্তিম/প্রফুল্লচিত্তে স্মিতহাস্যে মৃত্যুবরণ/অনাড়ম্বর অন্ত্যেষ্টি
(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত) মজঃফরপুর, আগষ্ট-১১ :

আজ সকাল ছ টায় ক্ষুদিরামের ফাঁসী হয়ে গেল। তিনি ফাঁসীমঞ্চের দিকে দৃঢ়পদে ও প্রফুল্লচিত্তে হেঁটে গেলেন, মাথার উপর যখন টুপি টেনে দেওয়া হল একটু হাসলেনও।

ক্ষুদিরামের অভিপ্রায়মতো তাঁর উকিল বাবু কালিদাস বসু দেহটি চাইলেন এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অন্ত্যেস্টির অনুমতি দিলেন, বিনা আড়ম্বরে তা অনুষ্ঠিত হ'ল। কিছু শোকার্ত ব্যক্তি ছিলেন, তাঁরা ঘাট পর্যন্ত দেহের অনুগমন করলেন। রাস্তায় সারিবদ্ধ পুলিস ও দর্শক, জনতাকে কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হয়নি।

গণ্ডক নদতীরে অন্ত্যেস্টি হ ল নিঃশব্দে।

Khudiram s End . Died cheerful and smiling .
A Quiet Funeral

Khudiram's execution took place at 6 A M this morning. He walked to the gallows firmly and cheerfully and even smiled when the cap was drawn over the head.

According to Khudiram's wishes, Babu Kalidas Bose, his pleader, applied for his body and the District Magistrate permitted the funeral which was performed without any demonstration. There were a few mourners who accompanied the body to the Ghat. The Road was lined by the police and spectators and the crowd were kept off.

There was a quiet funeral on the bank of the river Gandak.

লেখকের এযাবৎ প্রকাশিত গ্রন্থ (১৯২৯ থেকে)

বিপ্লব পথে ভারত *
ফাঁসীর আশীর্বাদ *
বলশেভিকী সঙ্কল্প *
আচরণবাদ
লেডী রম্ *
স্বদেশীগ্রন্থের চার অধ্যায়
বাংলার নয়, সভ্যতার সঙ্কট
অনিরুদ্ধ
বালির প্রাসাদ *
হে অতীত কথা কও *
শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক ভাবনা
রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র
বাঙলার বিপ্লব সাধনা
কে প্রথম শহীদ ?